# রবি-প্রদক্ষিণ

# রবি-প্রদক্ষিণ

সম্পাদক

**চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য**

সহকারী সম্পাদক

**অনিল সেনগুপ্ত**
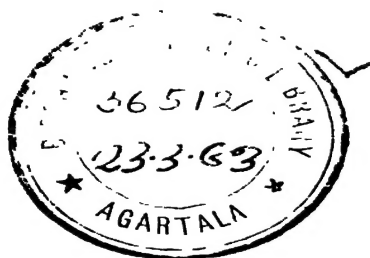
**বসুধারা প্রকাশনী**

৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

প্রকাশক : শ্রীজয়ন্ত বসু, বি.এ.,
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী : শ্রীঅজিত গুপ্ত

প্রচ্ছদ-মুদ্রক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানি,
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীত্রিদিবেশ বসু,
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা ৬

মূল্য টা. ৭·৫০

## ॥ প্রাক্-কথন ॥

রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশদ আলোচনার পক্ষে এই গ্রন্থের কলেবর এবং পরিসর পর্যাপ্ত নয়। বিরাট অতলস্পর্শ সেই প্রতিভার সামগ্রিক পরিচিতির সুসংবদ্ধ আভাস যাতে পাওয়া যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থখানির সম্পাদনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই গ্রন্থের অন্তর্গত কাব্য, সংগীত, দর্শন, শিক্ষা ইত্যাদি মোট এগারোটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটির সূচনায় সেই বিশেষ শাখাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত কবি-মানস এবং পটভূমির প্রসঙ্গে একটি ক'রে আলোচনা যুক্ত আছে। আশা করি, পূর্বভাষ-স্বরূপ এই আলোচনার সাহায্যে সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধগুলির পাঠ ও মর্মগ্রহণ সহজতর হবে।

'রবি-প্রদক্ষিণ' গ্রন্থখানি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশনার জন্যে প্রকাশক শ্রীজয়ন্ত বসুর আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল অপর্যাপ্ত। তা ছাড়া এই গ্রন্থ-সম্পাদনার ব্যাপারে বিশ্বভারতীর শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী এবং রবীন্দ্রভারতীর শ্রীঅসীমকুমার ঘোষ নানা ভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ছাপার ব্যাপারে শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়ের কাছেও আমাদের কৃতজ্ঞতা রয়েছে। এই অক্লান্তকর্মী মানুষটির ঐকান্তিক চেষ্টা না থাকলে, গ্রন্থপ্রকাশের কাল হয়তো আরও বিলম্বিত হ'ত। অলমিতি—

২৫ বৈশাখ, ১৩৬৭ সম্পাদক

## ॥ সূচীপত্র ॥


| | | | |
|---|---|---|---|
| **কাব্য** | | | |
| কবি রবীন্দ্রনাথ | হরপ্রসাদ মিত্র | ... | ৯ |
| কাব্যের উপেক্ষিতা | অতুলচন্দ্র গুপ্ত | ... | ৩০ |
| "সে নারী বিচিত্রবেশে" | প্রমথনাথ বিশী | ... | ৩৯ |
| **সংগীত** | | | |
| রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে | ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় | ... | ৭১ |
| **দর্শন** | | | |
| "মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে" | হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৮৫ |
| রবীন্দ্রকাব্যে 'আমি ও তুমি' | শশিভূষণ দাশগুপ্ত | ... | ৯৫ |
| **শিক্ষা** | | | |
| জাতীয় শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের স্থান | প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় | ... | ১২৭ |
| শ্রীনিকেতন ও প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ | সমীরণ চট্টোপাধ্যায় | ... | ১৩৪ |
| **স্বাদেশিকতা** | | | |
| রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা | শচীন সেন | ... | ১৬৭ |
| **প্রবন্ধ** | | | |
| রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্য | উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য | ... | ১৯১ |
| **সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব** | | | |
| ভাষা-সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ | সুকুমার সেন | ... | ২১৭ |
| সাহিত্যতত্ত্ব-বিচারে রবীন্দ্রনাথ | সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত | ... | ২২৩ |
| **ছোটোগল্প** | | | |
| রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প | শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ২৪১ |
| **নাটক** | | | |
| রবীন্দ্রনাট্যের পরিবেশ-সাপেক্ষতা | সাধনকুমার ভট্টাচার্য | ... | ২৭৫ |
| **উপন্যাস** | | | |
| রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস | হীরেন্দ্রনাথ দত্ত | ... | ৩১১ |
| **ছন্দ ও চিত্রকলা** | | | |
| ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ | প্রবোধচন্দ্র সেন | ... | ৩৩৭ |
| শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের রবীন্দ্রকথা | অনুলিখন : বিষ্ণু দে | ... | ৩৬২ |

রবি-প্রদক্ষিণ

কাব্য

[ সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ১৩৩৮ সালের ২৫শে বৈশাখ শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত অভিভাষণের একস্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

> "... শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে যাঁরা আমাকে উচ্চমঞ্চে বসাতে চান, তাঁদের আমি বলি, আমি নিচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি, প্রবীণের প্রধানের আসন থেকে খেলার ওস্তাদ আমাকে ছুটি দিয়েছেন। এই ধুলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি-ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতে হাঁটতে আরম্ভ ক'রে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।"

রবীন্দ্রনাথ মানুষের কবি।

'সুখে-দুঃখে-অনন্ত-মিশ্রিত প্রেমধারার অশ্রুজলে চিরশ্যাম' মর্ত্যভূমির প্রাণের কবি রবীন্দ্রনাথ—এইটিই তাঁর সবচেয়ে সত্য পরিচয়। তাঁর সর্বব্যাপী বিরাট প্রতিভার সম্বন্ধে মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবতে গিয়ে এই মূল কথাটি যেন আমরা ভুলে না যাই।

রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে একেবারে গোড়ায় এ-কথার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। একক স্রষ্টার সৃষ্টি হিসাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্তহীন বৈচিত্র্য এবং প্রাচুর্য এই সমকালীন মানুষের কাছেও এক বিপুল বিস্ময়। কাব্য, সঙ্গীত, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রাজনীতি, দর্শন, এমনকি বিজ্ঞান পর্যন্ত—রসসাহিত্য কিম্বা জ্ঞানমার্গী তাত্ত্বিক বিষয়—সাহিত্যের কোনো শাখাই রবীন্দ্র-প্রতিভার অকৃপণ দান থেকে বঞ্চিত থাকেনি। তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শে বাংলা-সাহিত্য অজস্র সম্ভারে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। এই অপরিমিত দানে দিশেহারা

হ'য়ে আমরা অনেকসময়ই রবীন্দ্র-প্রতিভার কোনো একটি রূপকে অবলম্বন ক'রে তাঁর সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ এবং বিক্ষিপ্ত একটি ধারণা তৈরি ক'রে নিয়েছি, এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এ ভুল বিশেষ ক'রে ঘটেছে দর্শনতত্ত্বকে কেন্দ্র ক'রে, তা বলতে আমাদের দ্বিধা নেই। কাব্যপাঠ করতে বসে আমরা এ-কথা ভুলতে পারিনি যে, রবীন্দ্র-মানসের পটভূমি ঔপনিষদিক ভাবধারায় পুষ্ট এক পরিবেশ। তাই কাব্যের যথার্থ রসগ্রহণকে মুলতুবি রেখে অনেকসময়ই আমরা তাঁর কাব্যে শুধু দার্শনিক চেতনার স্বরূপটিকেই গভীর অভিনিবেশে খুঁজে থাকি।

যে-কোনো বিরাট প্রতিভার মর্মকেন্দ্রে জীবনসত্যের একটি নিজস্ব দর্শন থাকবেই, তাকে অস্বীকার করা চলে না। রবীন্দ্র-প্রতিভাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু দার্শনিক বক্তব্য-প্রতিষ্ঠাই যদি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিচেতনার প্রধানতম বিষয় হ'ত তাহ'লে তার প্রকাশ-মাধ্যম আর যাই হ'ক, কাব্য নিশ্চয়ই হ'ত না। আমরা বলি, দার্শনিক চেতনা তাঁর মানসলোকের উপলব্ধিকে ক্রমপরিণতির স্তরে স্তরে গভীর থেকে গভীরতর হ'তে সাহায্য ক'রে চলেছে তাঁর জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত, কিন্তু তাঁর কবিসত্তাকে আচ্ছন্ন করেনি কোথাও। তাই তাঁর বলবার কথা সবচেয়ে বেশী তিনি বলেছেন কাব্যে আর গানের সুরে। কবি তাঁর প্রকাশ-ব্যাকুল হৃদয়ের অন্তরতম সুরটি বিভোর হ'য়ে বাজিয়েছেন কাব্যবীণার তারে তারে। বার বার গভীর অন্তরঙ্গতায় গেয়েছেন—আমি কবি, আমি কবি, আমি তোমাদেরই কবি।

রবীন্দ্রকাব্যের পরিণত স্তরে যে দার্শনিক প্রতীতি মিশে একাকার হ'য়ে আছে, শুধু সেইটুকুকে অবলম্বন ক'রে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচার সম্পূর্ণ হ'তে পারে না, এ-কথা আগেই বলা হ'য়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। এই দার্শনিক প্রতীতির বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠা ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের এক সুনির্দিষ্ট ক্রমপরিণতির ভিতর দিয়ে। সেই ক্রমপরিণতির অন্তর্নিহিত সত্যটুকু বুঝতে পারলেই এর রহস্য স্পষ্ট হবে।

জীবন-সত্যের অন্বেষণে অবিশ্রান্ত গতিশীলতা রবীন্দ্র-কাব্যের সেই অন্তর্নিহিত সত্য। 'মানসী' বা 'সোনার তরী' রচনাকালে কবির চেতনায় জীবন-জিজ্ঞাসার যে অস্ফুট প্রকাশ, সেই জিজ্ঞাসাই বিপুল বেগে কবি-হৃদয়কে এগিয়ে নিয়ে চলেছে এক সুদীর্ঘ যাত্রাপথ ধ'রে। প্রথম-উন্মেষিত অস্ফুট চেতনা স্ফুটতর হ'তে হ'তে গভীর উপলব্ধিতে পরিণত হ'য়েছে 'বলাকা', 'পূরবী' বা 'মহুয়া'র কালে। মানসী আর মহুয়ার কবি-অনুভূতির মধ্যে বিরাট ব্যবধান।

এ ব্যবধানের পিছনে ক্রমপরিণতির এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। জীবন ও সৌন্দর্য-প্রীতি তাঁর কাব্যের প্রথম যুগ থেকে শেষ যুগ পর্যন্ত মূল আবহ-সুর। সে-সুরের ঝঙ্কারটুকু কখনও থামেনি। রবীন্দ্র-কাব্যে দুঃখানুভূতি বা অরূপানুভূতি জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনো অনুভূতি নয়। জীবনের রূপসাগরে ডুব দিয়েই অরূপরতনকে উপলব্ধি করবার গভীরতা এসেছে কবির পরিণত অনুভূতির চেতনায়। 'মানসী' বা 'সোনার তরী'র কালে ওই চেতনার আভাস হয়তো আছে, কিন্তু সেই সামান্য আভাসের সূত্র ধ'রে যদি তাঁর সমগ্র কাব্যকৃতিকে আমরা 'ঔপনিষদিক ভাবধারায় পুষ্ট এক ঋষিকবির রচনা' ব'লে এক কথায় রায় দিয়ে বসি, তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়তো হবে না, কিন্তু নিঃসন্দেহে অবিচার করা হবে, এ-কথা সত্য।

রবীন্দ্রনাথ মহামনীষী। কিন্তু কাব্যেই তাঁর মনীষার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ, গূঢ়তম পরিচয়। রবীন্দ্রমানসের ক্রমপরিণতির স্তরগুলি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, প্রত্যেকটি স্তরে কবি-হৃদয়ের যে পরিচয়টি তাৎকালিক কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে, সেই পরিচয়টিই বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন রূপে প্রতিফলিত হয়েছে সমসাময়িক কালে রচিত অন্যান্য ধরনের রচনায়। নিজের বলবার কথাকে বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে প্রকাশ ক'রেও কবির চিত্ত শেষপর্যন্ত আবার ফিরে যেতে চেয়েছে কাব্যের অঙ্গনে। 'ছিন্নপত্র'র একখানি পত্রে কবির এই মনোভাবটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

> "... আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক-এক সময়ে মনে হয়, আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে—লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। এক-এক সময় মনে হয় আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়, সেগুলো ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো; বোধহয় তাতে ফলও আছে, আনন্দও আছে। এক-এক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা খুব দরকার, যখন আর-কেউ করছে না তখন কাজেই আমাকে এই অপ্রিয় কর্তব্যটা গ্রহণ করতে হয়—আবার এক-এক সময় মনে হয়, দূর হোকগে ছাই, পৃথিবী আপনার চরকায় আপনিই তেল দেবে এখন; মিল করে ছন্দ গেঁথে ছোটো ছোটো কবিতা লেখাটা আমার বেশ

আসে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক। মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাইনে—কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং হয়তো 'দীর্ঘ দৌড়ে' কোনোটিই পরিপূর্ণভাবে আমার আয়ত্ত হয় না। সাহিত্য-বিভাগেও কর্তব্যবুদ্ধির অধিকার আছে, কিন্তু অন্য বিভাগের কর্তব্যবুদ্ধির সঙ্গে তার একটু প্রভেদ আছে। কোন্‌টাতে পৃথিবীর সবচেয়ে উপকার হবে সাহিত্য-কর্তব্যজ্ঞানে সে কথা ভাববার দরকার নেই, কিন্তু কোন্‌টা আমি সবচেয়ে ভালো করতে পারি সেইটেই হচ্ছে বিচার্য। বোধহয় জীবনের সকল বিভাগেই তাই। আমার বুদ্ধিতে যতটা আসে তাতে তো বোধ হয়, কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয়, এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না; আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই কি, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বাল্যবিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয়, এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ যে চিত্রবিদ্যা ব'লে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকেও সহজে পাবার জো নেই—তাঁর একেবারে ধনুকভাঙা পণ—তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধে—বোধহয় যেন উনিই আমাকে সবচেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন; আমার ছেলেবেলাকার, আমার বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী। ...”

কাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গী যখন প্রকাশ পেয়েছে তখন কবির বয়স বত্রিশবছর মাত্র। এমনকি, তাঁর কবিমানসে 'সোনার তরী'র কালও তখন শেষ হয়নি। কিন্তু কবির অনুভূতিতে কাব্যের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যে স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্কটি ধরা দিয়েছিল, পরিণততম প্রতিভার বিকাশকালেও সেই সম্পর্কটাই তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড়ো সত্য ব'লেই চিহ্নিত হ'য়ে আছে। উপরে উদ্ধৃত পত্রখানির অল্পকিছুকাল আগে লিখিত আর-একখানি পত্রে কাব্যের মধ্যেই নিজের স্বচ্ছন্দ এবং পূর্ণ প্রকাশের অনুভূতিকে তিনি ব্যক্ত করেছেন গভীর বিশ্বাসে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে।

> "কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী—বোধহয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল। ··· তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারি শক্ত, কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি কবিকল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালাবদল হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয়, তা স্বীকার করতে হয়; আর যাই হোক সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারি নে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ··· যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তি স্থাপন করে গৃহস্থ হ'য়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।"

কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান' ব'লে এই যে বিশেষ ভাবে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন, এ কেবল আঙ্গিকগত নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিপুল পরিধির সর্বত্রই তাঁর কবিমানসের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। ছোটোগল্প, নাটক, উপন্যাস, এমনকি প্রবন্ধসাহিত্যেও তাঁর কবি-ধর্মেরই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যের মধ্যেও কাব্যব্যঞ্জনা

কেন যে এত ব্যাপক তার কারণ নিহিত আছে এর মধ্যে। সৃজনধর্মী রচনার ক্ষেত্রে তো বটেই, মননধর্মী বা তত্ত্বমূলক আলোচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক সৃষ্টি, যা রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব। সে-রীতির বহিরঙ্গটি গদ্যের, অন্তরঙ্গটি অনন্যসাধারণ কাব্য-পরিমণ্ডলের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় ঝংকৃত। বক্তব্য বিষয় যাই হ'ক না কেন, তার উপস্থাপনায় পরিপূর্ণ এক কবিমানসের প্রতিফলন রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসগ্রহণ কিম্বা তত্ত্বালোচনার সময় এই গোড়ার কথাটি যেন আমরা ভুলে না যাই। ]

# কবি রবীন্দ্রনাথ

## হরপ্রসাদ মিত্র

রবীন্দ্রনাথ যে প্রধানতঃ কবি, সে-কথা অনেক বার অনেক জনে বলেছেন। তাঁর সেই একান্ত কবিসত্তা বলতে কী বোঝায়, সেটা উপলব্ধির ব্যাপার। যুক্তি তর্ক দিয়ে সেটা বুদ্ধিবাদী শিক্ষিত সমাজে পরিবেষণ করা দুঃসাধ্য নয়,—কিন্তু সে-কাজ জ্ঞানীর কাজ। বড়ো কবি আমাদের বোধের সামর্থ্য দেখিয়ে দিয়ে যান। জ্ঞানী অ্যারিস্টটল বলেছিলেন কবিত্বের আসল কথাটাই হোলো রূপক-সৃষ্টির সামর্থ্য। আমাদের দেশেও লোকোত্তর কবি কালিদাসের উপমা-সিদ্ধির কথা সুপরিচিত। উপমা, রূপক ইত্যাদি অর্থালংকারের প্রধান কারণই হোলো সাদৃশ্যের চিন্তা। কবিরা সাদৃশ্যের দ্রষ্টা। তাঁরা জগতের যাবতীয় ব্যাপারের মধ্যে সুনিশ্চিত অন্বয় অনুভব করে থাকেন। এ অর্থে দেখলে তাঁকেই কবি বলতে হয়—যিনি বহুর মধ্যে একের সন্ধানী। রবীন্দ্রনাথ তাই ছিলেন।

অবিশ্যি আমাদের ব্যবহারিক জগতে সাধারণ-অসাধারণ সব রকম জ্ঞানের দৃষ্টিই বিশ্লেষণভিত্তিক। বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষে পৌছলেও তাকে বিশ্লেষণ-ভিত্তিক বলতে আপত্তি হবে কেন? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পথ স্বতন্ত্র। তিনি নিজে বলে গেছেন যে, জ্ঞানের প্রখর আলোকের চেয়ে সৃষ্টির ছায়ালোকেই তাঁর সত্যিকার আগ্রহ। বিধাতার উদ্দেশেও তিনি সেই কথাই বলে গেছেন:

যেথায় তুমি দৃষ্টিকর্তা নহ,
সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি লয়ে রহ
যেথা নানা বর্ণের সংগ্রহ,
    যেথা নানা মূর্তিতে মন মাতে,
যেথা তোমার অতৃপ্ত আগ্রহ
    আপনভোলা রসের রচনাতে।

'মহুয়া'র এই 'ছায়ালোক' লেখা হয়েছিল তেরশ' পঁয়ত্রিশ সালের আশ্বিন মাসে। 'মহুয়া' প্রকাশিত হবার প্রায় পনেরো বছর আগেকার বই 'উৎসর্গ'র আট-সংখ্যক কবিতায় তিনি বলেছিলেন :

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর আমি উদাসী।
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
তরুমর্মরে ছায়ার খেলায়,
কী মূরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি।
হে সুদূর আমি উদাসী।

এবং সৃষ্টির ছায়ালোকে আগ্রহী, রসতীর্থের এই উদাসী রবীন্দ্রনাথই সে-আমলে লিখেছিলেন :

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী—
পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিণী।
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমার স্মৃতি
কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার
গোপনে রয়েছে নিতি।

সেই সর্বান্বয়ী দৃষ্টিতেই জগৎকে তিনি নিজের বলে উপলব্ধি করেছিলেন। এই 'উপলব্ধি'-ব্যাপারটি তো কুড়িয়ে কুড়িয়ে সংগ্রহ নয়! এতে খোঁজাও আছে, বোঝাও আছে,—তবে, শরীরের পরিশ্রম আর বুদ্ধির প্রয়াসের মধ্যেই সেই সক্রিয়তা সীমিত নয়। সে একরকম বেজে ওঠা! ঐ 'উৎসর্গ' বইখানির চোদ্দ-সংখ্যক রচনায় তাঁকে বলতে শোনা গেছে :

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।

পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

✓সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে নিজের একান্ত অন্বয় অনুভব করবার ব্যাকুলতাই কবি রবীন্দ্রনাথের জীবন-সত্য। তেরশ' বারো সালে শিলাইদহে পদ্মা-স্রোতে ভাসতে-ভাসতে তিনি লিখেছিলেন ঃ

তোমার বীণার সাথে আমি
সুর দিয়ে যে যাব
তারে তারে খুঁজে বেড়াই
সে সুর কোথায় পাব।

এ লেখাটি 'খেয়া'তে সংকলিত হয়েছে। এরকম অজস্র রচনা তাঁর রচনাবলীতে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। এসব কথা যে তাঁর জীবনের কোনো বিশেষ পর্বের কথা, তা বলা ঠিক নয়। তাঁর যৌবন শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। প্রথম থেকেই তাঁর বৈরাগ্য ধ্রুব বলে বোঝা গিয়েছিল। তিনি ছিলেন পূর্ণ যৌবনের, সহজ বৈরাগ্যের কবি!

রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতার কথা সংক্ষেপে ভেবে দেখতে হলে প্রথমেই মনে পড়ে যে, কৈশোরের প্রথম লেখার নমুনাগুলিকে তিনি 'কপিবুক যুগের' চৌকাঠের ওপারে রাখতে চেয়েছিলেন। আর, সন্ধ্যাসংগীত থেকে এপারের সব কবিতাই এপারের! রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে তাই তিনি স্পষ্টভাবে এই কথাই বলেছিলেন যে, সন্ধ্যাসংগীতেই তাঁর কাব্যের প্রথম পরিচয়।—'সে উৎকৃষ্ট নয় কিন্তু আমারই বটে। সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিলনা।'

নিজেরই রচনাধারার প্রথম স্তরের দিকে এই তাঁর বিশেষ তর্জনী-সংকেত। আর শেষ দিকে, একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন ঃ

লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে,
সময় রাখিনি ওজন দেখিতে মেপে,
কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী,
এ অপরাধের জন্যে যে-জন দায়ী
তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে।

'নবজাতক'-এর এই লেখাটির নাম 'অবর্জিত'। তখন চন্দননগরে 'পদ্মা' বোটে তাঁর বাস। উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন সেদিন।

'সন্ধ্যাসংগীত' বই হয়ে বেরিয়েছিল ১২৮৮ সালে। সে বইখানির অধিকাংশ রচনাই পূর্ববর্তী বছর-দুয়েকের মধ্যে লেখা,—কেবল 'বিষ ও সুধা' নামে একটি লেখা আরো আগেকার। সেটি পরে আর ছাপা হয়নি। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর 'হৃদয়ের গীতিধ্বনি' কবিতাটিতে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল :

ও কী সুরে গান গাস হৃদয় আমার ?
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বসন্ত শরৎ নাই, ···

এবং 'কেহ শুনিছে না যবে, চারিদিকে স্তব্ধ সবে'—তখনো তাঁর নিজের গভীর মনে সেই একমাত্র শব্দই বার বার ধ্বনিত হয়েছে! সেদিন 'দুঃখ-আবাহন' নামে একটি কবিতায় তিনি বলেছিলেন—'আয় দুঃখ হৃদয়ের ধন'। 'শান্তি-গীত' নামে আর-একটি কবিতায় তিনি বলেছিলেন—'দুঃখ তুই ঘুমা'। কারণ,—তখন তাঁর কবি-মানসের গহন লোকে 'ধীরে উঠিতেছে গান,—ক্রমে ছাইতেছে প্রাণ,—নীরবতা ছায় যথা সন্ধ্যার গগন'! ইংরেজি হিসেবে 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর প্রকাশ-কাল গেছে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সুদূর আঠারো শ' একাশিতে তিনি দুঃখ সম্বন্ধে এই যে-সব ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন,—তাঁর আরো আগেকার 'বনফুল' ( ৯ মার্চ, ১৮৮০ ) কাব্যগ্রন্থে,—'কবিকাহিনী'তে ( ৫ নভেম্বর, ১৮৭৮ ),—এবং তাঁর 'সন্ধ্যাসংগীতে'রই সমকালীন রচনা 'ভগ্নহৃদয়'-এর ( ২৩ জুন, ১৮৮১ ) মধ্যেও এই ধরনের কথা দেখা গেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুঃখের দুর্বোধ্য বোঝা বইতে হয়নি তাঁকে! নিজের জীবনই তাঁকে তাঁর সুখ-দুঃখের সর্বান্বয়ী শক্তিতে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। মনে

পড়ে, শান্তিনিকেতনে 'শ্যামলী'তে লেখা—উনিশ শ' উনচল্লিশের ২৬এ নভেম্বর তারিখের কবিতা 'জয়ধ্বনি'ও তাঁর শেষদিকের সেই 'নবজাতক' বইখানিতে সংকলিত হয়েছে। তখন নিজের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সম্বন্ধে লেশমাত্র দুঃখ ছিলনা তাঁর। তাতে তিনি বলে গেছেন:

যাবার সময় হলে জীবনের সব কথা সেরে
শেষবাক্যে জয়ধ্বনি দিয়ে যাব মোর অদৃষ্টেরে।

তাহলেও জীবনে—'যাহা রুগ্ন, যাহা ভগ্ন, যাহা মগ্ন পঙ্কস্তরতলে',—আমাদের সেই সর্বস্বীকৃত দুঃখের দিকটা তিনি কোনোদিনই উপেক্ষা করেননি,—তাকে অলীকও বলতে চাননি। যেসব 'আত্মপরাভব' আমাদের মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে দিয়ে যায়, মানবজীবনের সেইসব রূঢ় সত্যের দিকে কোনোরকম উদাসীনতা-চর্চার কথাও তিনি বলেননি। তবে, সব দুঃখের প্রতিকার সকলের সাধ্য নয়। রবীন্দ্রনাথও অলৌকিক দেবতা ছিলেন না। তিনি মানুষেরই মহাকবি। এ-কালের জীবনরঙ্গমঞ্চের সব-রকম আলোছায়া, সব-রকম হাসি-কান্নার অংশীদার ছিলেন তিনি। ঐ 'জয়ধ্বনি' কবিতাতেই তিনি সে-কথা বলে গেছেন:

মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সমুখে,
ছুটিনি করিতে প্রতিকার—
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।

একদিকে তাঁর এই আত্মধিক্কার,—এই বেদনাবোধ,—অন্যদিকে তাঁর সুদীর্ঘ আশিবছরের মর্ত্য-পরমায়ু-ব্যাপী অশেষ বিস্ময়বোধ! ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৪০ তারিখে শান্তিনিকেতনে তাঁর 'উদীচী' ভবনে যখন তাঁর বাস ছিল, সেই-সময়কার বই 'সানাই'-এর 'ক্ষণিক' কবিতার প্রথম কয়েক ছত্রে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল:

এ চিকন তব লাবণ্য যবে দেখি
মনে মনে ভাবি, এ কি
ক্ষণিকের 'পরে অসীমের বরদান,
আড়ালে আবার ফিরে নেয় তারে
দিন হলে অবসান।

জীবনের মহাশিল্পী যিনি, তাঁর মনে নেই লাভ-ক্ষতির দুর্ভাবনা। মাটির ভঙ্গুর পাত্রেই তো তাঁর শ্রেষ্ঠ দান পরিবেষিত হয়ে থাকে! তিনি মর্ত্যের সামান্য পটেই অমূল্য ছবি এঁকে থাকেন! তাঁর স্বভাবের কথা বলতে গিয়ে কবি লিখে গেছেন—'প্রকাশে বিনাশে বাঁধিয়া সূত্র ক্ষয়ে নাহি মানে ক্ষয়'!

রবীন্দ্রনাথও ক্ষয় মানেননি! তিনি শ্রান্তি মানেননি, বাধা মানেননি,—সমালোচকদের কোনো রূঢ় কথাতেই নিজের লক্ষ্য ত্যাগ করতে চাননি তিনি! তাঁর নিজের কথা দিয়েই বলা চলে যে, একদিন 'সন্ধ্যা-সংগীত'-এর 'গদগদ্ভাষী হৃদয়াবেগের আন্দোলন' পার হয়ে 'প্রভাত-সংগীত'-এর যৎসামান্য মননলোকে এসে পৌছেছিলেন তিনি। সেখান থেকে ক্রমে এগিয়ে গেছেন আরো বিস্তীর্ণ, পরিণত, বিচিত্র বিস্ময়জনক বৃহৎ দেশে-দেশান্তরে! 'প্রভাত-সংগীত'-এর একটি কবিতায় তাঁর সেই সুদূর যাত্রার ইশারা ছিল ঃ

জগৎ দেখিতে হইব বাহির<br>
আজিকে করেছি মনে<br>
দেখিবনা আর নিজেরি স্বপন<br>
বসিয়া গুহার কোণে।

তার অনেকদিন পরে, তেরশ' বাইশ সালের ২৩এ কার্তিক তারিখে লেখা 'বলাকা'র সাঁইত্রিশ-সংখ্যক কবিতায় তিনি জানিয়েছিলেন ঃ

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে ;<br>
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে ;<br>
মৃত্যু করে লুকোচুরি<br>
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।

তবু কবিতার পাত্রে বিশ্বের মানুষের জন্যে নিজের এই শুভ-প্রত্যয় তিনি রেখে গেছেন যে,—দুনিয়ার সমস্ত প্রলয়-পারাবারের দুঃখ-বিভীষিকা এবং নিখিলের যাবতীয় বজ্রবাণের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও একমাত্র মানুষই বলতে পারে ঃ

তোরে নাহি করি ভয়,<br>
এ-সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।<br>
তোর চেয়ে আমি সত্য এ-বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ্।<br>
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।

মানুষের বিকৃতির সহস্র লক্ষণেও মানব-জীবনের অনস্বীকার্য মহিমা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যয় খর্ব হয়নি। 'নবজাতক'-এর ঐ 'জয়ধ্বনি' কবিতাটিরই শেষ কয়েক ছত্রে তিনি বলে গেছেন ঃ

প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা,
গুহাগহ্বরের যত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
পারেনি বিদ্রূপ করিবারে—
যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষবাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি।

এই লেখাটিরই কয়েক সপ্তাহ পরে, উনিশ শ' চল্লিশের ১৩ই জানুয়ারি, 'গানের খেয়া' কবিতাতে তিনি নিজের গান রচনার কথা বলেছিলেন। সে-কবিতা পরে 'সানাই' বইখানির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

যে গান আমি গাই
জানি নে সে কার উদ্দেশে।

এই লৌকিক সংসারের নানা দৃশ্যে,—নানান্ সম্পর্কে কবির প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে যিনি বিরাজ করেছেন, হয়তো তাঁরই উদ্দেশে,—হয়তো বা অনাগত আর কারও উদ্দেশে !—

ঐ মুখে চেয়ে দেখি,
জানিনে তুমিই সে কি
অতীত কালের মূরতি এসেছ
নতুন কালের বেশে।
কভু জাগে মনে,
যে আসেনি এ জীবনে
ঘাট খুঁজি খুঁজি
গানের খেয়া সে মাগিতেছে বুঝি
আমার তীরেতে এসে।

এবং এই 'গানের খেয়া' লেখাটির কয়েকদিন আগে ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে

তাঁর ‘সানাই’ বইয়ের বিখ্যাত ‘সানাই’ কবিতাটি লেখা হয়। তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি-মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান
কোন্ উদ্‌ভ্রান্তের কাছে,
বুঝিবার সময় কি আছে।

সানাইয়ের সুর সেই ঐক্যেরই পুনরপি সংকেত! সানাই ‘অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি’—‘অমর্ত্য লোকের কোন্ বাক্যের অতীত সত্যবাণী’! এই ঐক্য-সন্ধান তাঁর সারা জীবনের সাধনা। প্রথম স্তর থেকে শেষ স্তর পর্যন্ত—তাঁর রচনাধারার সর্বত্রই এই ঐক্যে তাঁর গভীর বিশ্বাস!

বিশ্বের বিবিধ আকর্ষণে মানবচিত্তের এই উদ্‌ভ্রান্ত ভাব,—জীবনের রহস্য সম্বন্ধে তাঁর আকুল জিজ্ঞাসা এবং এতৎসত্ত্বেও তাঁর অন্য এক গভীর বোধ—তাঁর এই ‘সানাই’ পর্বের বহু আগে লেখা ‘চিত্রা’র ‘অন্তর্যামী’তে দেখা গিয়েছিল। সে অতীতের বৃত্তান্ত,—১৩০১ সালের ভাদ্র মাসের কথা। সে লেখাটিতে তিনি বলেছিলেন ঃ

এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
যেদিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই।

জগতের পান্থ-মানুষ তাঁরই ইচ্ছায় পথ পেরিয়ে চলে। তিনি কে? তিনি সেই কৌতুকময়ী! তাঁর অনতিগোচর কথাই পথিকের আপন কথা,—তাঁর চালনাই মানুষের জীবন! রবীন্দ্রনাথ সে-আমলে তাঁকে ‘অন্তর্যামী’ বলেছেন—‘প্রেয়সী’ বলেছেন,—বলেছেন ‘দেবতা’—কখনো বা ‘বিশ্বরূপী’! সেই সঙ্গে তাঁকে তিনি প্রশ্ন করেছেন ঃ

অর্ধনিশীথে নিভৃতে নীরবে
এই দীপখানি নিবে যাবে যবে,
বুঝিব কি, কেন এসেছিনু ভবে,
কেন জ্বলিলাম প্রাণে?

আবার এই লেখাটিরই বছর দেড়েক পরে তাঁর 'জীবনদেবতা' ( ২৯ মাঘ, ১৩০২ ) কবিতায় তিনি আপন কবিসত্তারই কোনো এক অন্তরতম-কে 'প্রাণেশ' বলে সম্বোধন করেছিলেন! তাঁকেই বলেছিলেন 'জীবননাথ',—তাঁকেই বলেছিলেন 'বঁধু'! বলেছিলেন :

নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে।

ইহজীবনে অচিনের কাছে এই তাঁর সমর্পণ! অনাগত ভবিষ্যতেও জীবন-নাথের কাছে তাঁর সেই একই সমর্পণ :

নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন-ডোরে।

সেই 'চিত্রা'তেই 'মৃত্যুর পরে' নামে একটি কবিতা আছে। তাতে তিনি বলেছিলেন :

জানিনা কিসের তরে
যে যাহার কাজ করে
সংসারে আসিয়া,
ভালোমন্দ শেষ করি
যায় জীর্ণ জন্মতরী
কোথায় ভাসিয়া।

রবীন্দ্র-কাব্যে জীবনের নানান্ সুখ-দুঃখের কথা থেকে এইভাবেই কখনো কখনো মৃত্যুর ভাবনা দেখা দেয়। মৃত্যুর পটে জীবনের রূপ ফুটে ওঠে আশ্চর্য লাবণ্যে,—দীপ্তিতে—রহস্যে,—ব্যাকুলতায়! মৃত্যুকে বার বার অনুভব করবার ব্যাকুলতা দেখা যায়। হয়তো বেদনাই জীবন-উপলব্ধির মর্মার্থ! রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমাদের অশেষ জীবন-পিপাসা এবং অনন্ত মৃত্যু-জিজ্ঞাসার কেবলই বিস্ময়কর পুনরাবৃত্তি! কবিতায় তিনি কী কী তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করেছেন, সে-প্রশ্ন সত্যিই কতকটা অবান্তর নয় কি? তাঁর কবিতা কী-পরিমাণে তাঁর পাঠকদের আত্মবোধ জাগিয়েছে,—তাদের আত্মজিজ্ঞাসাই বা কী-পরিমাণে উৎসাহিত করেছে, সেইটেই আসল কথা! তাঁর কবিতা পড়লে, গভীর জীবন-সত্যের উপলব্ধি হয় বলে বিশ্বাস করি। মনের মেঘ কেটে যায়, আলো ফুটে ওঠে।

প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি যা যা ভেবেছেন, সে-সব কথা কোন্ কোন্ সূত্রে নিবদ্ধ করা যেতে পারে,—প্রেমের অনন্ত আকর্ষণ-বিকর্ষণের পর্যালোচনা তাঁর কবিতায় কী-রকম বা কতোদূর সার্থক হয়েছে বা হয়নি,—সৌন্দর্য সম্বন্ধে পদ্যবন্ধে বা গদ্য-কবিতায় তিনি কোন্ কোন্ চূড়ান্ত কথা বলে গেছেন,—রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে এই ধরনের আলোচনা সুপরিচিত। আগেও অনেক হয়েছে,—ভবিষ্যতে বহুদিন ধরে আরো অনেক হবে। মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সীমা-সংকোচের কথাই এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে। আমরা এক নজরে কোনো বৃহৎ দৃশ্যের সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে দেখতে পারি না। তাই টুকরো টুকরো করে দেখতে হয়। আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান একসঙ্গে, একই রকম তীব্রভাবেও পেতে পারি না। তাই হয় আমাদের দেখতে হয়, নয় আমাদের শুনতে হয়,—নয়তো একই রীতিতে অন্য কোনো ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্তিতে চিত্ত সংহত রাখতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতাও সেইরকম সুবিপুল এক মহাদেশ। পাঠকের পক্ষে যথার্থ কাব্যজিজ্ঞাসা ছাড়া এ-পথে আর কোনো দ্বিতীয় নির্ভরযোগ্য পথ-প্রদর্শক নেই। এবং সেই জিজ্ঞাসা যাঁর আছে, তিনি নিজের অন্তরের ক্ষুৎ-পিপাসার নির্দেশ মেনে নিয়েই এগিয়ে যাবেন—কবির এক কবিতার বই থেকে অন্য বইয়ে,—এক উপলব্ধি থেকে অন্য উপলব্ধিতে। কোনো চূড়ান্ত তত্ত্বজ্ঞানে এ চলার শেষ নয়! কবিতাকে যাঁরা কথার জাদু বা বচনের মায়া মাত্র মনে করেন,—রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লে তাঁদেরও চিত্তশোধন ঘটতে পারে। 'সোনার তরী'র 'মায়াবাদ' অবিশ্যি ঠিক তাঁদের উদ্দেশে লেখা হয়নি। তবে, কবিতায় যাঁরা কেবলমাত্র লোক-সমাজের ব্যবহারিক বিজ্ঞতার খোঁজ করেন,—অথবা তত্ত্ববিজ্ঞতার বাটখারা দিয়ে যাঁরা কবিতার ওজন মেপে দেখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,—কিংবা আর্থিক যোগ্যতা থেকে আলাদা করে কবিতার পরমার্থের ধারণা উপলব্ধি করা যাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার,—'সোনার তরী'র 'পুরস্কার'-এর কয়েক ছত্র বিশেষভাবে তাঁদেরই কাজে লাগতে পারে। রাজা রাজসভায় বসে নানান্ প্রার্থীকে নানান্ উপহার দিয়েছিলেন—কাউকে পঞ্চহাজার টাকা, কাউকে বা দক্ষিণ হাতে দক্ষিণা! কিন্তু কবিকে তিনি কী দেবেন?—কী তিনি দিতে পারেন? নিজের গলার মালাটি ছাড়া আর কী-ই বা দেওয়া যায়? কারণ, কবির তো অন্য কোনো অভাব নেই, কামনা নেই, লোভ নেই! রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই অনাসক্ত দৃষ্টি এবং চিরজাগ্রত বিস্ময়বোধই সর্বাধিক, সর্বোচ্চ কথা। মনে পড়ে তাঁর আপন কথা :

শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে ;
সমস্ত প্রাণে কেন-যে কে জানে
ভরে আসে আঁখিজল,
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা
লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।

সুন্দরের এই আহ্বানই রবীন্দ্র-কাব্যের স্থায়ী উপলব্ধি এবং এই বোধই তাঁর চিরন্তন আবেদন। 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'ক্ষণিকা', 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'উৎসর্গ',—তারপর তাঁর 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য', —তাঁর 'বলাকা', 'পলাতকা', 'লিপিকা', 'পূরবী',—উনিশ শ' পঁচিশের বই 'পূরবী' থেকে শুরু করে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত তাঁর শেষ জীবনের ভূরি-পরিমিত কবিতার ছত্রে ছত্রে এই সর্বান্বয়ী শান্ত সুন্দরই প্রধান হয়ে আছেন! তাঁর প্রকৃতি-বন্দনা, প্রেমানুভূতি, দেশপ্রেম, মানবানুরাগ, ভগবৎ-সান্নিধ্য-চিন্তা এবং এই তালিকায় অনুক্ত অন্যান্য যাবতীয় বিশেষত্ব সেই 'সুন্দর'-এর সঙ্গে জড়িত। তাঁর কবিতার পরিণতি বা বিবর্তনের কথা এইদিক থেকে বিবেচ্য। কবিতায় তাঁর আঙ্গিক বা কলাকৌশলের বিচিত্রতাও গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। 'ক্ষণিকা' থেকে 'বলাকা',—'বলাকা' থেকে 'লিপিকা',—'মহুয়া', 'নবজাতক', 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক' ইত্যাদি অজস্র কবিতার সংগ্রহে তাঁর কলাকৌশলের অশেষ রহস্যই চোখে পড়ে। সেও তাঁর অন্তরের অভিব্যক্তি। তাকে মৌশুমী হাওয়াও বলা চলে না,—কেবলমাত্র 'কলাভঙ্গি' বলাও ঠিক নয়।

'বলাকা'র আটত্রিশ সংখ্যক কবিতায় তিনি লিখেছিলেন ঃ

ওগো, আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারি আকাশ,
রঙের নেশায় মেটেনা তার আশ,
তাই তো বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানী,
কখনো জাফরানী,
আজ তোরা দেখ্ চেয়ে আমার নূতন বসনখানি
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ যেন নবীন আসমানী।

'গীতাঞ্জলি'-পর্বের বৃষ্টিধারার পরে সত্যিই 'বলাকা'য় সেই নতুন আকাশ দেখা গিয়েছিল! সেই কবিতারই প্রথম দুটি ছত্রে বলা হয়েছিল—

সর্বদেহের ব্যাকুলতায় কী বলতে চায় বাণী,
তাই আমার এই নূতন বসনখানি।

এই সুনিবিড় ব্যাকুলতাবোধই তাঁর অন্তহীন কলাবৈচিত্র্যের কারণ! তাঁর সেই 'বলাকা' বইখানিরই একচল্লিশ-সংখ্যক কবিতায় আর-এক-রকম ব্যাকুলতার তাড়নায় তিনি লিখেছিলেন:

যে-কথা বলিতে চাই,
বলা হয় নাই,
সে কেবল এই—
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখিসম্মুখেই
দেখিনু সহস্রবার
দুয়ারে আমার।

তাঁর রচনাধারায় কখনো দেখা যায় আঙ্গিকের উদ্দীপনা আর সমারোহ,— কখনো বা অপরিসীম সারল্য! তাঁরই আপন কথাতে—কখনো মনে পড়ে— 'তোমায় সাজাব যতনে ভূষণে রতনে',—কখনো বা, 'যেমন আছ তেমনি এসো আর কোরোনা সাজ'! তাঁর কলাকৌশল বা আঙ্গিকের কথা-সূত্রে তাঁর এই দু'রকম মর্জির কথাই বিবেচ্য। তাঁর সমস্ত ভঙ্গিই আন্তরিক। নতুন কালের নতুন কবিসমাজকে তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন—'শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ'! মনে পড়ে, তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটকের কথা। সেখানে 'শ্রুতিভূষণ'কে কথায়-কথায় তাঁর বৈরাগ্য-বারিধি থেকে বেশ অর্থসমৃদ্ধ পদ্য শুনিয়ে যেতে দেখা যায়, কিন্তু 'কবি' এসে বলেন:

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে
বাজে আমার বুকের মাঝে,
বাজে বেদনায়
আমার ঘরে থাকাই দায়।

'পথ', 'আকাশ', 'নদী', 'তরী'—এ-সবই তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গ। এবং গতির নানা ছবি,—নানা রূপ আর বিচিত্র সংগীত পরিবেষণ করতে-করতে এই একটি কথা তিনি আগেও বলেছেন, পরেও বার-বার বলেছেন যে,—বিশ্বের সমস্ত প্রকাশের মূলে যিনি, তাঁকে জানতে হলে মানুষের বোধকে শুদ্ধ করে তুলতে হবে। যথার্থ নির্লোভ হতে হবে। নির্লোভ অর্থাৎ নিরাসক্ত!

উনিশ-শ' উনচল্লিশের ১০ই মার্চ তারিখের কবিতা 'প্রজাপতি' তার 'নবজাতক' বইখানিতে ছাপা হয়েছে। ছোটো একটি প্রজাপতির কাহিনী সেটি। কবির লেখার ঘরে ঢুকেছিল সেই প্রজাপতি। সকালে দেখা গেল যে সে শেল্‌ফের ওপর নিস্পন্দ দুটি রেশমি সবুজ ডানা মেলে রেখেছে। সেই সূত্র ধরেই সেদিন তাঁর মনের মধ্যে কবিতার ঢেউ জেগেছিল। তিনি ভেবেছিলেন যে, সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঢুকে পড়ে প্রজাপতি হয়তো বা অবাক বোধ করেছিল! কারণ, প্রজাপতি তো অন্য দৃশ্যে অভ্যস্ত। যেখানে অরণ্যের বর্ণ-গন্ধ নেই, সেই গৃহসজ্জাময় দৃশ্যে প্রজাপতির পক্ষে কোন্ সার্থকতার ভাবনাই বা ভাবা সম্ভব? অতঃপর দেখা দিয়েছে কবির অন্তর্মুখী আলাপ :

বিচিত্র বোধের এ ভুবন,
লক্ষকোটি মন
একই বিশ্ব লক্ষকোটি করে জানে
রূপে রসে নানা অনুমানে।
লক্ষকোটি কেন্দ্র তারা জগতের,
সংখ্যাহীন স্বতন্ত্র পথের
জীবনযাত্রার যাত্রী,
দিনরাত্রি
নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা-কাজে
একান্ত রয়েছে বিশ্ব-মাঝে।

যেমন প্রজাপতি, তেমনি তিনিও! নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কাজ করে চলেছে জগতের লক্ষকোটি পথিক!

প্রজাপতি বসে আছে যে কাব্যপুঁথির 'পরে
স্পর্শ তারে করে,
চক্ষে দেখে তারে,

তার বেশি সত্য যাহা তাহা একেবারে
তার কাছে সত্য নয়—
অন্ধকারময়।

নবজাতকের এই 'প্রজাপতি'র মধ্য দিয়েই—সুন্দরের সাধককে তিনি আর-একবার নির্লোভ হবার ইশারা জানিয়েছিলেন। প্রজাপতি তো যথার্থ সুন্দরকে জানে না! কারণ—

ও জানে কাহারে বলে মধু, তবু
মধুর কী সে রহস্য জানেনা ও কভু।
পুষ্পপাত্রে নিয়মিত আছে ওর ভোজ—
প্রতিদিন করে তার খোঁজ
কেবল লোভের টানে,
কিন্তু নাহি জানে
লোভের অতীত যাহা। সুন্দর যা, অনির্বচনীয়,
যাহা প্রিয়
সেই বোধ সীমাহীন দূরে আছে
তার কাছে।

শেষ পর্বের কবিতায় এই ভাবে রবীন্দ্রনাথকে যতো উল্লসিত দেখা যায়, ঠিক ততোই চিন্তান্বিত বলে মনে হয়। চিন্তাতে-উল্লাসে এ-রকম ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে চলা অবিশ্যি তাঁরই স্বভাবের বিশেষত্ব। আর, এই শেষ পর্বে তাঁর অজস্র কবিতায় নতুন নতুন শব্দ-শব্দবন্ধের ঐশ্বর্য,—পরমাশ্চর্য মনন-সমৃদ্ধি,—তারই মধ্যে চারদিকের মানব-সংসার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত আগ্রহ এবং নানা ধরনের সাদৃশ্যের অভিনবত্ব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। উপমা, রূপক ইত্যাদি অলংকারের বিচিত্রতা তাঁর আদি মধ্য-অন্ত্য সকল পর্বেই অবিশ্যি ভূরি-পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু এই শেষ পর্বের লেখাতে তাঁর নানাবিধ সাদৃশ্যে যে নতুনতর মৌলিকতা দেখা যায়,—যে চাতুর্য এবং রসকল্পনা অনুভব করা যায়, সে কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করা দরকার। এবং বিশেষভাবে বলতে গেলেই উদাহরণের কথা মনে আসে। 'পুনশ্চ' বইখানির 'দেখা' কবিতার প্রথম কয়েক ছত্রে তিনি লিখেছেন ঃ

মোটা মোটা কালো মেঘ
ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন,
সমস্ত রাত বর্ষণের পর
আকাশের একপাশে এসে জমল
ঘেঁষাঘেঁষি করে।
বাগানের দক্ষিণ সীমায় সেগুন গাছে
মঞ্জরীর ঢেউগুলোতে হঠাৎ পড়ল আলো,
চমকে উঠল বনের ছায়া।

এই পালোয়ান-প্রসঙ্গ থেকেই আরো নানা সাহিত্যের নানা উপমার কথা—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে হয়তো মনে পড়তে পারে, মহাভারতের সভাপর্বের একটি বর্ণনা। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ থেকে সেই ছবিটুকু এখানে তুলে দেখা যেতে পারে ঃ

'অমর্ষী ভীমসেন এই কথা কহিতে কহিতে আরও ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। দহ্যমান বৃক্ষকোটরের ন্যায় তাঁহার রোমকূপ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল।' —মহাভারত ঃ সভাপর্ব—দ্যূতপর্বাধ্যায় [ ৬৯ অধ্যায় ]

ক্লান্ত পালোয়ানের মতন অতিবর্ষণে স্থূলকায় মেঘের অবসন্ন অপসরণ,—হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে চমকে ওঠা বনস্থলী,—আর এই দহ্যমান বৃক্ষ-কোটরের সঙ্গে ক্রোধজ্বালাময় রোমকূপের সাদৃশ্য-চিন্তা একই সুরের মননক্রিয়া এবং একই ধরনের কল্পনার উদাহরণ। সে যাই হোক, 'পুনশ্চ' বইয়ের এই কবিতায় হঠাৎ মেঘ দেখা দিয়েছে রাত্রিশেষে,—সারারাত বর্ষণের পর আকাশের এক পাশে তারা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছে ক্লান্ত পালোয়ানের মতো। ইতিমধ্যে বাগানের দক্ষিণ সীমায় সেগুনগাছের মঞ্জরীতে হঠাৎ দেখা দিয়েছে শ্রাবণের রোদ। তখন হাসির কোলাহল উঠেছে গাছে-গাছে, ডালে-পালায়। এখানকার এই চিত্র-প্রদর্শনীর মধ্যে শুধু যে বস্তুর ছবিই উজ্জ্বল এবং অভিনব হয়ে উঠেছে, তা নয়—আমাদের মনের নানান্ ভাবনার মতন সংশয়াতীত অ-বস্তুও ছবি হয়ে ফুটেছে, রূপ হয়ে গতিশীলতায় মণ্ডিত হয়েছে! যেমন—

শ্রাবণ মাসের রৌদ্র দেখা দিয়েছে
অনাহূত অতিথি,

হাসির কোলাহল উঠল
গাছে গাছে ডালে-পালায়।
রোদ-পোহানো ভাবনাগুলো
ভেসে ভেসে বেড়ালো মনের দূর গগনে।
বেলা গেল অকাজে।

১৩৩৯ সালের আশ্বিন মাসে তাঁর এই 'পুনশ্চ' বইখানি প্রকাশিত হয়। ১৩৪০ সালের ফাল্গুনে এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁর 'পরিশেষ' থেকে খেলনার মুক্তি, পত্রলেখা, খ্যাতি, বাঁশি, উন্নতি, এবং ভীরু, এই কবিতাগুলি, আর এ-ছাড়া নতুন-লেখা আরো কয়েকটি কবিতা সংযোজিত হয়। ১৯৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পুনশ্চ' বইখানির রচনারীতি সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে যে চিঠি লেখেন, ১৩৪০-এর বৈশাখ সংখ্যার 'পরিচয়ে' সেখানি প্রকাশিত হয়। কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হলেও তাঁর সেই ভূমিকাটি এখানে স্মরণ করা দরকার। ২রা আশ্বিন ১৩৩৯ তারিখে 'পুনশ্চ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন :

'গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু, চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।

তার পরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমার মত এই যে, তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয় নি। আর-একবার আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলবার আছে। গদ্যকাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত

গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন 'তরে' 'সনে' 'মোর' প্রভৃতি যে-সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এই-সকল কবিতায় স্থান দিই নি।'

এই তো গেল তাঁর সেই ভূমিকার কথা। এ-ছাড়া ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে লেখা সেই চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, 'পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতিককে সমাদর করে ভোজে বসানো হয়েছে'। সেই চিঠিরই কয়েক ছত্র পরে আবার এই কথাটিই অন্যভাবে বলেছেন—'বক্ষ্যমাণ কাব্যে গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবুও তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে …।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি তাহলে সাহিত্যসংসারে আলংকারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক, তার চরিত্রের দিক, অনেকটা খোলা জায়গা পায়; কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়।'

সেই ঋতু-পরিবর্তন আর আঙ্গিক-পরিবর্তনের ভাবনা ভাবতে-ভাবতেই সে-পর্বে তিনি লিখেছিলেন:

তাই ফিরে আসতে হল আর একবার।
দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু।
তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে।
আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে—
তাকে রেখে দিয়ে গেলেম
পথের ধারে পান্থশালায়,
পথিক বন্ধু, তোমারি কথা মনে করে।

[ নূতন কাল, 'পুনশ্চ' ]

আবার নিজের অতীত-বর্তমানের তুলনা মনে রেখেই তিনি লিখেছিলেন :

আমার বয়সে
মনকে বলবার সময় এল,
কাজ নিয়ে কোরো না বাড়াবাড়ি,
ধীরে সুস্থে চলো,
যথোচিত পরিমাণে ভুলতে করো শুরু
যাতে ফাঁক পড়ে সময়ের মাঝে মাঝে।
বয়স যখন অল্প ছিল
কর্তব্যের বেড়ায় ফাঁক ছিল যেখানে সেখানে।
তখন যেমন খুশির ব্রজধামে
ছিল বালগোপালের লীলা।
মথুরার পালা এল মাঝে,
কর্তব্যের রাজাসনে।
আজ আমার মন ফিরেছে
সেই কাজ-ভোলার অসাবধানে।

[ ফাঁক, 'পুনশ্চ' ]

এই শেষ পর্বেও তিনি যে সব সময়ে গভীর, গম্ভীর সুরে কথা বলেছেন, তা নয়। 'মহুয়া'র 'নাম্নী' কবিতাবলীতে নতুন নতুন নামের ছটা দেখা দিয়েছিল। আবার আরো পরের বই 'সানাই'-এর একটি লেখাতে দেখা গেছে তাঁর আর-একরকম নামকরণের ভঙ্গি :

বাদলবেলায় গৃহকোণে
রেশমে পশমে জামা বোনে,
নীরবে আমার লেখা শোনে,
তাই সে আমার শোনামণি।

প্রচলিত ডাক নয় এ যে
দরদীর মুখ উঠে বেজে,
পণ্ডিতে দেয় নাই মেজে—
প্রাণের ভাষাই এর খনি।

[ নামকরণ, 'সানাই' ]

এইরকম দরদ আর হালকা হাসির মর্জিতেই তাঁর 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি' প্রভৃতি বইগুলি লেখা হয়েছে। সেই ধারার মধ্যেই আবার মনে পড়ে তাঁর বহুশ্রুত 'নবজাতক'-এর ভূমিকা। তাঁর কাব্যের ঋতু-পরিবর্তনের কথা তিনি নিজেই বলে গেছেন। ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪০, 'নবজাতকে'র সূচনায় তিনি বলেছিলেন :

> 'আমার কাব্যের ঋতু-পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু-জোগান নতুন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারদিকের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু তারা এই বিশিষ্টতা টের পায় স্বাদে। কোনো কোনো বনের মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রঙ হয় রাঙা ; কোনো পাহাড়ি মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, সে শুভ্র ; আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে।'

'মহুয়া' থেকে—কিংবা 'মহুয়া'রও আগেকার আমল থেকে শুরু করে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত তাঁর যাবতীয় কবিতার সামান্যধর্ম বা প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি তাঁর এই 'নবজাতক'-এর ভূমিকাতেই আসল কথাটা বলে গেছেন। সেই ভূমিকাতেই পরের অংশে তিনি লিখেছেন :

> 'কাব্যে এই যে হাওয়াবদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাইরে থেকে সমজদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে। সম্প্রতি সেই সমজদারের সাড়া পেয়েছিলুম। আমার একশ্রেণীর কবিতার এই বিশিষ্টতা আমার স্নেহভাজন বন্ধু অমিয়চন্দ্রের দৃষ্টিতে পড়েছিল। ঠিক কী ভাবে তিনি এদের বিশ্লেষণ করে পৃথক করেছিলেন তা আমি বলতে পারি নে। হয়তো দেখেছিলেন, এরা বসন্তের ফুল নয় ; এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তা হলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা। কিন্তু এ আলোচনা আমার

পক্ষে সংগত নয়। আমি তাই নবজাতক গ্রন্থের কাব্যগ্রন্থনের ভার অমিয়চন্দ্রের উপরেই দিয়েছিলুম। নিশ্চিন্ত ছিলুম, কারণ দেশবিদেশের সাহিত্যে ব্যাপকক্ষেত্রে তাঁর সঞ্চরণ।'

এইসব হাওয়াবদলের মধ্যেই উনিশ শ' সাঁইত্রিশ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'ছড়ার ছবি'র 'আকাশ' কবিতাটি লেখা হয়েছিল। তাতে তিনি জানিয়েছিলেন :

শিশুকালের থেকে
আকাশ আমার মুখে চেয়ে একলা গেছে ডেকে।

দিন কাটত কোণের ঘরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা
কাছের দিকে সর্বদা মুখ-ফেরা ;
তাই সুদূরের পিপাসাতে
অতৃপ্ত মন তপ্ত ছিল। লুকিয়ে যেতেম ছাতে,
চুরি করতেম আকাশভরা সোনার বরণ ছুটি,
নীল অমৃতে ডুবিয়ে নিতেম ব্যাকুল চক্ষু দুটি।

সেই নীল আকাশের 'আকাশপ্রিয় পাখিকে' তাঁর মন জানে! চিলের তীক্ষ্ণ তীব্র সুর সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম হয়ে দূর থেকে আরো দূরে চলে যায়! সেই বৈরাগী পাখির ভাষায় তাঁর মন কেঁদে ওঠে তখনো!

এসব কথা তো আছেই। তা ছাড়া, শেষ পর্বে নিজের কাব্যকলার কথাই কি তিনি কম ভেবেছেন? সে-সব কথার অন্ত নেই। 'ছড়ার ছবি'র 'আকাশ' কবিতাটিরই পাশে রেখে দেখা যেতে পারে তাঁর 'শেষ সপ্তক'-এর ছেচল্লিশ-সংখ্যক সেই কবিতাটি যেখানে তিনি তাঁর সাতবছর বয়সের প্রকৃতি-প্রীতির কথা বলে গেছেন। সেই সুদূরকালের সঙ্গে তাঁর সেই অন্ত্যকালের সমাবেশ এবং বিচ্ছেদের কথা ভাবতে-ভাবতেই তিনি লিখেছিলেন :

আজ নেব মুক্তি
সামনে দেখছি সমুদ্র পেরিয়ে
নতুন পার।
তাকে জড়াতে যাব না
এ পারের বোঝার সঙ্গে।

এ নৌকোয় মাল নেব না কিছুই
যাব একলা
নতুন হয়ে নতুনের কাছে।

এই 'একলা চলার' কথাও তিনি যে কতোবার বলেছেন! কতো আলোতে অন্ধকারে এই শেষ জয়যাত্রার কথা তাঁর মনে বেজেছে! সমুখে শান্তি-পারাবার! মনে পড়ে 'জন্মদিনে' বইখানির দু'নম্বর কবিতা:

নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে
ফোটেনি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।
শুধু করি অনুভব,
চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবসরাত্রিরে।

এই লেখার তারিখ উনিশ শ' একচল্লিশের ২০এ ফেব্রুয়ারি! জীবনের পথে চলতে চলতে এই তাঁর একরকম বয়সবোধ! আর-এক-রকম বয়সবোধের কথা আছে তাঁর সেই শেষ পর্বেরই আর-এক ধরনের কবিতায়। 'প্রহাসিনী'র 'আধুনিকা' কবিতাটির কথা মনে পড়ে। তাতে নিজের বার্ধক্যের উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে যদিচ—

পাজিতে যে আঁক টানে গ্রহ-নক্ষত্তর
আমি তো তদনুসারে পেরিয়েছি সত্তর—

এবং তবু,—'মনে রেখো, তবু আমি জন্মেছি অধুনাই'।

রবীন্দ্রনাথ সেই চিরকালের আধুনিক কবি! অর্থাৎ তিনি শাশ্বত, চিরন্তন!

# কাব্যের উপেক্ষিতা

## অতুলচন্দ্র গুপ্ত

কবি যখন কোনও কাব্য নিয়ে আলোচনা করেন তখন সে আলোচনা যে কাব্যধর্মী হয়ে উঠবে এ অনুমান স্বাভাবিক। কবির শক্তি রসসৃষ্টির শক্তি। নানা উপাদানের মিশ্রণে কবির প্রতিভা কাব্যের রস সৃষ্টি করে। সে রস আস্বাদনে পাঠকের যে আনন্দ তা এক বিশেষ রকমের আনন্দ। সহৃদয় বুদ্ধিমানেরা তার তুলনায় যে সব স্বাদ ও আনন্দের উল্লেখ করেন তার উদ্দেশ্য এই কথা বলা যে সে স্বাদের আনন্দ অনির্বচনীয়। কবির কাব্য আলোচনার কাব্যধর্মিতা হচ্ছে সে আলোচনা পড়ে পাঠকের আনন্দ কাব্য-পাঠের আনন্দের অনুরূপ আনন্দ। অতি সূক্ষ্মদর্শী নিপুণ কাব্যসমালোচকের বিশ্লেষণে সে আনন্দ কখনও পাওয়া যায় না।

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। 'কাব্যের উপেক্ষিতা' রবীন্দ্রনাথের একটি প্রসিদ্ধ রচনা। "কাব্যসংসারে এমন দুটি-একটি রমণী আছে যাহারা কবি কর্তৃক সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াও অমরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। পক্ষপাত কৃপণ কাব্য তাহাদের জন্য স্থানসংকোচ করিয়াছে বলিয়াই পাঠকের হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আসন দান করে।" এরাই 'কাব্যের উপেক্ষিতা'। "কিন্তু এই কবিপরিত্যক্তাদের মধ্যে কাহাকে কে হৃদয়ে আশ্রয় দিবেন তাহা পাঠকবিশেষের প্রকৃতি এবং অভিরুচির উপর নির্ভর করে।"

রবীন্দ্রনাথ এই কবিপরিত্যক্তা পাঠকের হৃদয়বাসিনীদের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের তিনজনের কথা বলেছেন—রামায়ণের উর্মিলা, শকুন্তলা নাটকের প্রিয়ম্বদা-অনসূয়া, কাদম্বরী আখ্যায়িকার পত্রলেখা। কালিদাস তাঁর নাটকে শকুন্তলার দুই সখীকে, যার একজনকে অন্যজন ছাড়া দেখি না, বহু ঐক্যের মধ্যে ব্যক্তিত্বের অনন্যতায় জীবন্ত করে এঁকেছেন। সে ভিন্নতা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য

ও কল্পনার পক্ষে অবান্তর। সুতরাং ও দুজনকে একজন বলেই ধরে নেওয়া চলে।

"আমি বলিতে পারি, সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যযজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে যে কয়টি অনাদৃতার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে তাহার মধ্যে উর্মিলাকে আমি প্রধান স্থান দিই। বোধ করি তাহার একটা কারণ, এমন মধুর নাম সংস্কৃত কাব্যে আর দ্বিতীয় নাই। এই নামটির জন্য বাল্মীকির নিকট কৃতজ্ঞ আছি। কবিগুরু ইহার প্রতি অনেক অবিচার করিয়াছেন, কিন্তু দৈবক্রমে ইহার নাম যে মাণ্ডবী অথবা শ্রুতকীর্তি রাখেন নাই সে একটা বিশেষ সৌভাগ্য। মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, জানিবার কৌতূহলও রাখি না।

"উর্মিলাকে কেবল আমরা দেখিলাম বধূবেশে, বিদেহনগরীর বিবাহসভায়। তার পরে যখন হইতে সে রঘুরাজকুলের সুবিপুল অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল তখন হইতে আর তাহাকে একদিনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

"তরুণশুভ্র ভালে যে দিন প্রথম সিন্দূরবিন্দুটি পরিয়াছিলেন, উর্মিলা চিরদিনই সেইদিনকার নববধূ। রামের অভিষেক-মঙ্গলাচরণের আয়োজনে যে দিন অন্তঃপুরিকাগণ ব্যাপৃত ছিল সে দিন এই বধূটিও কি সীমন্তের উপরে অর্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া রঘুকুললক্ষ্মীদের সহিত প্রসন্নকল্যাণমুখে মাঙ্গল্যরচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত ছিল না! আর, যে দিন অযোধ্যা অন্ধকার করিয়া দুই কিশোর রাজভ্রাতা সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া তপস্বীবেশে পথে বাহির হইলেন সে দিন বধূ উর্মিলা রাজহর্ম্যের কোন নিভৃত শয়নকক্ষে ধূলিশয্যায় বৃন্তচ্যুত মুকুলটির মত লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা কি কেহ জানে! যে ঋষিকবি ক্রৌঞ্চবিরহিণীর বৈধব্য দুঃখ মুহূর্তের জন্য সহ্য করিতে পারেন নাই তিনিও একবার চাহিয়া দেখিলেন না!

"লক্ষ্মণ রামের জন্য সর্বপ্রকারে আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছিলেন সে গৌরব ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে আজও ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু সীতার জন্য উর্মিলার আত্মবিলোপ কেবল সংসারে নহে, কাব্যেও। লক্ষ্মণ তাঁহার দেবতাযুগলের জন্য কেবল নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; উর্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন, সে কথা কাব্যে লেখা হইল না।

"লক্ষ্মণ তো বারোবৎসর ধরিয়া তাঁহার উপাস্য প্রিয়জনের প্রিয়কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; নারীজীবনের সেই বারোটি শ্রেষ্ঠ বৎসর উর্মিলার কেমন করিয়া কাটিয়াছিল। সলজ্জ নবপ্রেমে আমোদিত বিকাশোন্মুখ হৃদয়-মুকুলটি লইয়া

স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভ-সময় সেই মুহূর্তে লক্ষ্মণ সীতাদেবীর রক্তচরণক্ষেপের প্রতি নতদৃষ্টি রাখিয়া বনে গমন করিলেন ; যখন ফিরিলেন তখন নববধূর সুচির প্রণয়ালোক বঞ্চিত হৃদয়ে আর কি সেই নবীনতা ছিল ! পাছে সীতার সহিত উর্মিলার পরম দুঃখ কেহ তুলনা করে, তাই কি কবি সীতার স্বর্ণমন্দির হইতে এই শোকোজ্জ্বল মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন—জানকীর পাদপীঠ-পার্শ্বেও বসাইতে সাহস করেন নাই ?"

উর্মিলা রামায়ণ মহাকাব্যে মহাকবির সৃষ্টি। সে কাব্যের বাইরে তার সত্তা নেই। রামায়ণের গল্পের যে জনশ্রুতির উপর বাল্মীকির মহাকাব্যের ভিত্তি তাতে সম্ভব লক্ষ্মণের বধূ উর্মিলার নামটি ছিল, যে নামের জন্য রবীন্দ্রনাথ কবি-গুরুর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। যে কৃতজ্ঞতা খুব সম্ভব প্রাচীন জনশ্রুতির প্রাপ্য। রামায়ণ রচনার পর যে জনশ্রুতি বেঁচে ছিল না। রামায়ণ পাঠকের কাছে উর্মিলা কবির কল্পনার সৃষ্টি। তার স্রষ্টার সে উপেক্ষিতা। এবং সে উপেক্ষার প্রকৃতি বর্ণনা—এ কি বস্তু !

স্পষ্টতই এটা রামায়ণের উর্মিলা চরিত্রের সমালোচনা নয়। কাব্যের বিচারে এ চরিত্র-সৃষ্টির উৎকর্ষ অপকর্ষ, ঔচিত্য অনৌচিত্য এর কোনও কিছুর আলোচনা নয়। 'কাব্যের উপেক্ষিতা' কি ব্যাপার তা রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের প্রিয়ম্বদা-অনসূয়ার প্রসঙ্গে খুলেই বলেছেন।

"সংস্কৃত কাব্যের আর দুইটি তপস্বিনী আমাদের চিত্তক্ষেত্রে তপোবন রচনা করিয়া বাস করিতেছে। প্রিয়ম্বদা আর অনসূয়া। তাহারা ভর্তৃগৃহগামিনী শকুন্তলাকে বিদায় দিয়া পথের মধ্য হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল ; নাটকের মধ্যে আর প্রবেশ করিল না। একেবারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

"জানি, কাব্যের মধ্যে সকলের সমান অধিকার থাকিতে পারে না। কঠিনহৃদয় কবি তাঁহার নায়ক-নায়িকার জন্য কত অক্ষয় প্রতিমা গড়িয়া গড়িয়া নির্মম চিত্তে বিসর্জন দেন। কিন্তু তিনি যেখানে যাহাকে কাব্যের প্রয়োজন বুঝিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলেন সেইখানেই কি তাহার সম্পূর্ণ শেষ হয় ? দীপ্তরোষ ঋষিশিষ্যদ্বয় এবং হতবুদ্ধি রোরুদ্যমানা গৌতমী যখন তপোবনে ফিরিয়া আসিয়া উৎসুক উৎকণ্ঠিত সখী-দুইটিকে রাজসভার বৃত্তান্ত জানাইল তখন তাহাদের কী হইল সে কথা শকুন্তলা নাটকের পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক, কিন্তু তাই বলিয়া কি সেই অকথিত অমেয় বেদনা সেইখানেই ক্ষান্ত হইয়া গেল ?

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে কি বিনা ছন্দে বিনা ভাষায় চিরদিন তাহা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল না ?

"শকুন্তলা বিদায় লইলেন, তাহার পরে সখীরা যখন শূন্য তপোবনে ফিরিয়া আসিল তখন কি তাহাদের শৈশবসহচরীর বিরহই তাহাদের একমাত্র দুঃখ ? শকুন্তলার অভাব ছাড়া ইতিমধ্যে তপোবনের আর কি কোনও পরিবর্তন হয় নাই ? হায়, তাহারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছে, যাহা জানিত না তাহা জানিয়াছে। কাব্যের কাল্পনিক নায়িকার বিবরণ পড়িয়া নহে, তাহাদের প্রিয়তমা সখীর বিদীর্ণ হৃদয়ের মধ্যে অবতরণ করিয়া।

"এখন সেই সখীভাবনির্মুক্তা স্বতন্ত্রা অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদাকে মর্মরিত তপোবনে তাহাদের নিজের জীবনকাহিনীসূত্রে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছি। তাহারা তো ছায়া নহে ; শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এক দিগন্ত হইতে অন্য দিগন্তে অস্ত যায় নাই তো। তাহারা জীবন্ত, মূর্তিমতী। রচিত কাব্যের বহির্দেশে, অভিনীত নাট্যের নেপথ্যে এখন তাহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে। অতিপিনদ্ধ বল্কলে এখন তাহাদের যৌবনকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। এখন তাহাদের কলহাস্যের উপর অন্তর্ধান ভাবের আবেগ নববর্ষার প্রথম মেঘমালার মতো অশ্রুগম্ভীর ছায়া ফেলিয়াছে। এখন এক-এক দিন সেই অন্যমনস্কাদের উটজপ্রাঙ্গণ হইতে অতিথি আসিয়া ফিরিয়া যায়। আমরাও ফিরিয়া আসিলাম।"

এ কল্পনা কাব্য-সমালোচনা নয়। কাব্য-সংসারের প্রজাপতি কবি-মহাকবিরা তাঁদের কাব্যে যে সকল নর-নারীর সৃষ্টি করেন, প্রজাপতির সৃষ্টি লৌকিক নর-নারীর মত তাদের অনেকে জীবন্ত। আর তাদের শরীর ও মনের চেহারা অবান্তর বাহুল্য বর্জিত হওয়ায় বাস্তব জীবনে অনেক নর-নারীর চেয়ে আমাদের কাছে বেশী পরিচিত মনে হয়। এবং রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন কাব্যের প্রয়োজনে কবি তাদের কথা যেখানে শেষ করেছেন সেখানেই তা নিঃশেষ হয় না। পাঠকের মন তাদের ঘিরে নানা কল্পনার জাল বুনতে থাকে। এবং দৈবাৎ যদি সে পাঠক হয় রবীন্দ্রনাথের মত কবি তবে কল্পনার সৃষ্টি নর-নারী তাঁর মনে যে কল্পনার জন্ম দেয় তার প্রকাশ হয়ে ওঠে অপরূপ নূতন কাব্য। 'কাব্যের উপেক্ষিতা' সেই কাব্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা।

এ যে সমালোচনা নয় কল্পনা, তার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ এ লেখায় ছড়িয়ে রেখেছেন। তিনি বাল্মীকির নিকট কৃতজ্ঞ যে, উর্মিলার নাম উর্মিলা রেখেছেন, মাণ্ডবী কি শ্রুতকীর্তি রাখেন নাই। যদি রামায়ণে উর্মিলার নাম থাকতো

মাণ্ডবী, তবে জীবনে ভাগ্যহীনা ও কাব্যে অনাদৃতা লক্ষ্মণের বধূটির কথা রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা-ই বলতেন ; কর্কশ নামের বাধা বিন্দুমাত্র বোধ করতেন না। আর মাণ্ডবীর নাম যদি থাকতো উর্মিলা তবুও তার কথা জানতে অর্থাৎ কল্পনা করতে কিছুমাত্র কৌতূহল বোধ করতেন না। সংস্কৃত কাব্যের এই অদ্বিতীয় মধুর নামটি বিফল হতো। পাছে পাঠকেরা অবিশ্বাস করে যে সংস্কৃত কাব্যযজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে অনাদৃতাদের মধ্যে যে প্রধান স্থান দিয়েছেন উর্মিলাকে তার একটা কারণ, "এমন মধুর নাম সংস্কৃত কাব্যে আর দ্বিতীয় নাই", সেই জন্য একটু ধমকের সুরে বলেছেন, "নামকে যাঁহারা নাম মাত্র মনে করেন, আমি তাঁহাদের দলে নই"। এবং নাম-মাহাত্ম্যের একটা সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানী-বিচারও জুড়ে দিয়েছেন।

অনসূয়া-প্রিয়ম্বদার প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমি তো মনে করি, রাজসভায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে যে চিনিতে পারেন নাই তাহার প্রধান কারণ, সঙ্গে অনসূয়া প্রিয়ম্বদা ছিল না। একে তপোবনের বাহিরে, তাহাতে খণ্ডিতা শকুন্তলা— চেনা কঠিন হইতে পারে।"

দুর্বাসার শাপে দুষ্মন্তের মন থেকে শকুন্তলার স্মৃতি লোপ হওয়া শকুন্তলা নাটকের এক আশ্চর্য কবি-কৌশল। সে কৌশলের কথা 'শকুন্তলা' নাটকের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বিবৃত করেছেন ;—

"য়ুরোপীয় কবি হইলে এইখানে সাংসারিক সত্যের নকল করিতেন ; সংসারে ঠিক যেমন, নাটকে তাহাই ঘটাইতেন। শাপ বা অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা কিছুই আবৃত করিতেন না। যেন তাঁহাদের 'পরে সমস্ত দাবী কেবল সংসারের, কাব্যের কোনও দাবী নাই। কালিদাস সংসারকে কাব্যের চেয়ে বেশি খাতির করেন নাই। পথে-ঘাটে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাকে নকল করিতেই হইবে, এমন দাসখত তিনি কাহাকেও লিখিয়া দেন নাই। কিন্তু কাব্যের শাসন কবিকে মানিতেই হইবে। তিনি সত্যের আভ্যন্তরিক মূর্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সত্যের বাহ্য মূর্তিকে তাঁহার কাব্যসৌন্দর্যের সহিত সংগত করিয়া লইয়াছেন। তিনি অনুতাপ ও তপস্যাকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু পাপকে তিরস্করণীর দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন। শকুন্তলা-নাটক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে একটি শান্তি সৌন্দর্য ও সংযমের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এরূপ না করিলে তাহা বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। সংসারের নকল ঠিক পাইত, কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী সুকঠোর আঘাত পাইতেন।"

এই গভীর কাব্যকৌশলের কি স্থূল বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা 'কাব্যের উপেক্ষিতা'য় ?

ভর্তৃগৃহগামিনী শকুন্তলাকে বিদায় দিয়ে অনসূয়া-প্রিয়ম্বদা পথের মধ্যথেকে ফিরে এলো ; "নাটকের মধ্যে আর প্রবেশ করিল না"। এ ঘটনা যেন রবীন্দ্রনাথের মনকে পীড়া দিয়াছে। সে শূন্যতা তিনি 'কাব্যের উপেক্ষিতা'য় স্বতন্ত্রা অনসূয়া-প্রিয়ম্বদার জীবনকাহিনীর কল্পনায় ইঙ্গিতে পূর্ণ করেছেন। বিচিত্র সে কল্পনা! পাঠকের মন নানা রসে ভরে' ওঠে। কিন্তু শকুন্তলা নাটকের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

"কালিদাস যে তাহাকে কণ্বের তপোবনে ফিরাইয়া লইয়া যান নাই, উহা তাঁহার অসামান্য কবিত্বের পরিচয়। পূর্বপরিচিত বনভূমির সহিত তাহার পূর্বের মিলন আর সম্ভবপর নহে। কণ্বাশ্রম হইতে যাত্রাকালে তপোবনের সহিত শকুন্তলার কেবল বাহ্যবিচ্ছেদ মাত্র ঘটিয়াছিল, দুষ্যন্তভবন হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল ; সে শকুন্তলা আর রহিল না। এখন বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ-পরিবর্তন হইয়া গেছে, এখন তাহাকে তাহার পুরাতন সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করিলে অসামঞ্জস্য উৎকট নিষ্ঠুর ভাবে প্রকাশিত হইত। এখন এই দুঃখিনীর জন্য তাহার মহৎ দুঃখের উপযোগী বিরলতা আবশ্যক। সখীবিহীন নূতন তপোবনে কালিদাস শকুন্তলার বিরহদুঃখের প্রত্যক্ষ অবতারণা করেন নাই। কবি নীরব থাকিয়া শকুন্তলার চারিদিকের নীরবতা ও শূন্যতা আমাদের চিত্তের মধ্যে ঘনীভূত করিয়া দিয়াছেন। কবি যদি শকুন্তলাকে কণ্বাশ্রমের মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া এইরূপ চুপ করিয়াও থাকিতেন, তবু সেই আশ্রম কথা কহিত। সেখানকার তরুলতার ক্রন্দন, সখীজনের বিলাপ, আপনি আমাদের অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হইতে থাকিত। কিন্তু অপরিচিত মারীচের তপোবনে সমস্তই আমাদের নিকট স্তব্ধ, নীরব। কেবল বিশ্ববিরহিত শকুন্তলার নিয়মসংযত ধৈর্যগম্ভীর অপরিমেয় দুঃখ আমাদের মানস নেত্রের সম্মুখে ধ্যানাসনে বিরাজমান। এই ধ্যানমগ্ন দুঃখের সম্মুখে কবি একাকী দাঁড়াইয়া আপন ওষ্ঠাধরের উপর তর্জনী স্থাপন করিয়াছেন ; এবং সেই নিষেধের সংকেতে সমস্ত প্রশ্নকে নীরব ও সমস্ত বিশ্বকে দূরে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।"

কাব্যের কল্পনার উপর কবির কল্পনা যে রঙীন ঊর্ণনাভের জাল বোনে, তার সঙ্গে কবির কাব্য-সমালোচনার যে প্রভেদ, 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র সঙ্গে

'শকুন্তলা'র সমালোচনা পড়লেই মন নিঃসংশয় হয়। সে সমালোচনায় যে কল্পনা আছে, যা তাকে কাব্যত্বে উত্তীর্ণ করেছে, তার কাজ সত্যকে সুস্পষ্ট করে' মনে এঁকে দেওয়া; কল্পনার কোনও বাহুল্য যেখানে থাকে না। 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র মনোরম কল্পনা মাঝে মাঝে ভাব-গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটি কৌতুকের স্মিতহাস্য তার সমস্ত গাম্ভীর্যকে ঘিরে আছে। রবীন্দ্রনাথ যেন পাঠককে ডেকে বলছেন, এ কল্পনা আমার নিজের মনকে খুসি করেছে, সম্ভব তোমার মনকেও করবে। কিন্তু মনে রেখো এ কল্পনা। এর সকল কথা সোজাসুজি বিশ্বাস কোরো না। পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ। সেইজন্য বার বার নিজের জবানীতে কথা বলেছেন। প্রবন্ধকে সত্যের নৈর্ব্যক্তিক রূপ দেন নাই।

এক কবির কাব্যের কল্পিত নর-নারী অন্য কবির কল্পনাকে জাগিয়ে সেই সব নর-নারী নিয়ে নতুন কল্পনায় নূতন কাব্যের সৃষ্টি করে,—এটা নূতন কথা নয়, এবং এর উদাহরণও বিরল নয়। ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে শেলির *To a Lady with a Guitar* বিখ্যাত কবিতা। এ কবিতায় শেলি কল্পনা করেছেন যেন তিনি *Tempest* নাটকের 'এরিয়েল', *Lady with a Guitar* সেই নাটকের 'মিরাণ্ডা'। যেদিন থেকে তাঁর সঙ্গে ফার্নিনেণ্ডের প্রণয়লীলার আরম্ভ সে দিন থেকে জন্মের পর জন্ম তিনি তাঁদের সেবা করে এসেছেন। আজ কোন্ পাপের ফলে কবরের মত দেহে তিনি আবদ্ধ। 'আজ জন্ম জন্ম সেবা ও দুঃখের বিনিময়ে তোমার কাছে আমার বেশী কিছু চাওয়ার সাহস নাই,— আজ একটু হাসি, কাল একটি গান।

From you he only dares to crave,
For his service and his sorrow
A smile today, a song tomorrow.'

এর সমস্তটাই শেলির কল্পনা। *Tempest* নাটকে এ কল্পনার বিন্দুমাত্র ভিত্তি নেই। সমস্ত *Tempest* নাটকে 'এরিয়েল' 'মিরাণ্ডা'র সঙ্গে একটা কথাও বলে নাই। যখন থেকে সেক্সপিয়র তাকে নাটকের মধ্যে এনেছেন তখন থেকেই তার মুখে এক কথা 'মুক্তি'। যে যাদুবিদ্যার বলে সে প্রস্পেরোর দাস হয়ে তার সব আদেশ পালন করছে—সেই যাদুর বন্ধন থেকে মুক্তি। কোনও মানুষের সঙ্গে তার প্রীতির সম্বন্ধ নেই। সেক্সপিয়রের কল্পনায় 'এরিয়েল' মানুষের চেয়ে স্বতন্ত্র শ্রেণীর জীব, যদি সে জীব হয়। মানুষের সুখ-দুঃখ অনুভূতি-সহানুভূতি তার নেই।

*Ariel*—That if you now behold them, your affections
Would become tender.

*Prospero*—Dost then think so, spirit ?

*Ariel*—Mine would, Sir, were I human.

*Prospero*—And mine shall,
Hast thou, which are but air, a touch, a feeling
Of their afflictions, and shall not myself,
One of their kind, that relish all as sharply,
Passion as they, be kindlier moved than thou art ?

নাটকের শেষ অঙ্কে যখন প্রস্পেরো তাঁর যাদুকরের পোষাক ফেলে দিয়ে নিজের পোষাক পরছেন, আর এরিয়েল তাঁকে সেই পোষাক পরাতে পরাতে বিখ্যাত গানটি গাচ্ছে,—

Where the bee sucks, there suck I ;
In a cowslip's bell I lie :

তখন প্রস্পেরো বললেন,—

Why, that's my dainty Ariel !
I shall miss thee ;

আসন্ন বিদায়ের এ রকম কথা সেক্সপিয়র কখনও এরিয়েলকে দিয়ে বলান নি। নাটকের শেষে যখন যাদুর বন্ধন থেকে প্রস্পেরো এরিয়েলকে মুক্তি দিলেন, তখন বললেন,

My Ariel, chick,
That is thy charge ; then to the elements
Be free, and fare thou well.

প্রত্যভিবাদনের কোনও শুভেচ্ছা এরিয়েলের মুখে নেই ; যদিও এ মুক্তি নিজের যাদুর বন্ধনজাল থেকে প্রস্পেরোরও মুক্তি, এবং সে কথা এরিয়েলের অজ্ঞাত নয়।

শেলির কল্পনা *Tempest* নাটকে এরিয়েলের কল্পনার পরিপূরক নয়, তার সঙ্গে সম্বন্ধহীন নতুন কল্পনাও নয়। সেক্সপিয়রের কল্পনার বিপরীত ও বিরুদ্ধ কল্পনা। বন্ধন থেকে মুক্তি-প্রয়াসী এরিয়েলের কল্পনা, *In a body like a grave*-এর কারাগার থেকে মুক্তিকামী শেলির মনের তারে গভীর ঘা দিয়েছে। সেক্সপিয়রের এরিয়েল-সৃষ্টির মর্মকথা শেলির কবিমর্মে ঠিক প্রতিভাত হয়েছে ; কিন্তু তা মিশে গেছে কবির মানসীর কল্পনার সঙ্গে, যার প্রতি তাঁর মনের কামনা

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow.

সে মিশ্রণে যা গড়ে উঠেছে তা মনোরম কাব্য, কিন্তু *Tempest*-এ এরিয়েল-মিরাণ্ডার সম্পর্কের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। বাস্তব সৃষ্টিকে অনুসরণের দাসখত কবি কাকেও দেন নাই; কাব্যের সৃষ্টিকে অনুসরণের দাসখতও নয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উপর কল্পনার সৃষ্টি এর চেয়ে অনেক বাস্তবধর্মী; অবশ্য এ প্রসঙ্গে কাব্যের সৃষ্টিই বাস্তব সৃষ্টি। 'কাব্যের উপেক্ষিতা'য় কাব্যের নর-নারী সম্বন্ধে যে কল্পনা, মনে হয় তা কল্পনা নয়, সত্য কথা; শুধু কাব্যের কবি সে সব কথা বলতে ভুলেছেন। কল্পনার অসামান্য কৌশলে যা সৃষ্টি, মনে হয় তা কল্পনা নয় নির্ভেজাল সত্য। যে কৌশলের মায়া সত্যের এই প্রতীতি সৃষ্টি করে সে হচ্ছে সব সময় কল্পনার রাশ টেনে রাখা, গণ্ডীর বাইরে যাতে সে ছড়িয়ে না পড়ে। জীবন থেকে যে কাব্য তার এই কৌশল, কাব্য থেকে যে কাব্য তারও সেই কৌশল। তবে এই শেষের কৌশল কেবল মহাকৌশলীদেরই আয়ত্তে, অল্পকৌশলীদের সাধ্যের অতীত। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন কাব্যের নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে যে সব কাব্য রচনা করেছেন এ কৌশলের তা চরম দৃষ্টান্ত। 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'কচ ও দেবযানী' এদের সঙ্গে আমাদের নিবিড় পরিচয়। এদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে নতুন কল্পনা করেছেন তা নূতন বলে মনেই হয় না। মনে হয় অতি পরিচিত লোকের মুখে যে কথা শুনছি, তা তাদের মুখে অতি স্বাভাবিক। এতদিন কেন সে কথা শুনি নাই, তাতেই মনে বিস্ময়ের চমক লাগে!

# "সে নারী বিচিত্রবেশে"

## প্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রনাথের অনেক কাব্য আলোচনা করিবার মস্ত একটা সুবিধা এই যে, অনেক কাব্যের কবিকৃত পটভূমি পাওয়া যায়। সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালির রচনাকাল ব্যাপ্ত করিয়া আছে ছিন্নপত্র গ্রন্থখানা। ঐ কাব্য তিনখানা রচনা-কালীন কবির মনের গতিবিধির পদাঙ্ক রহিয়াছে ছিন্নপত্রে। এ যেন আকাশে উড়ো মেঘের মাটিতে-পড়া চলতি ছায়া। মেঘেতে আর ছায়াতে মিলাইয়া লইলে সবটা অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। আবার গীতাঞ্জলি কাব্য রচনার পটভূমি শান্তিনিকেতন নামে উপদেশসংগ্রহ গ্রন্থ। এখানে কাব্য ও পটভূমির মধ্যে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ, মাটির নীচেকার মৃণাল ও জলের উপরকার শতদলের যোগ। যে-সাধনার তত্ত্বরূপ শান্তিনিকেতন গ্রন্থে—তাহারই কাব্যরূপ গীতাঞ্জলি কাব্যে। আরো পরে লিখিত পূরবী কাব্যেরও এমনি একখানি পটভূমি পাওয়া যায় যাত্রী গ্রন্থের পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী অংশে। পূরবী কাব্য রচনাকালে কবির মনে যে-সব ভাবের ওঠাপড়া চলিতেছিল তাহারই কতক ছাপ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারীতে, কতক ছাপ পূরবী কাব্যে। পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী ও পূরবী কাব্যের দুই কূলের মধ্যে প্রবাহিত তৎকালীন রবীন্দ্রনাথের কবিমন। কাব্য ও তাহার পটভূমির অন্তরঙ্গতার এমন দৃষ্টান্ত আরো সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

এখন পূরবী কাব্যের আলোচনায় নামিবার আগে তাহার বহিরঙ্গ সম্বন্ধে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা সারিয়া লইতে ইচ্ছা করি।

পূরবী কাব্যের প্রধান অংশ লিখিত হয় কবির দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রাকালে, দক্ষিণ আমেরিকায় ও তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে। অর্থাৎ ইহা সমুদ্রের উপরে ও সমুদ্রপারে লিখিত কাব্য। প্রথম দিকে বিভিন্ন সময়ে লিখিত ষোলটি কবিতা আছে, যাহার মধ্যে চার পাঁচটি পূরবীর বিশিষ্ট সুরে বাঁধা। কাজের সুবিধার জন্য পূরবী কাব্যের বিভিন্ন অংশের একটা খসড়া তালিকা পাদটীকায় প্রদত্ত হইল। [১]

আমাদের বিবেচনায় পাদটীকায় উল্লিখিত শেষোক্ত ষাটটি কবিতাই যথার্থ পূরবী কাব্য, প্রথম ষোলটির চার পাঁচটির সঙ্গে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক যোগ আছে—যথাস্থানে সে যোগ দেখাইতে চেষ্টা করিব। তাহার আগে কাব্যরচনার ইতিহাস বিবৃত করি—ইহাও বহিরঙ্গের কথা।

কবি ১৯২৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর কলম্বো বন্দরে জাহাজে চাপিলেন। প্রথম দিন-দুই বাদলা ছিল, কাজেই কবির মন প্রসন্ন ছিল না। তারপরে সূর্যের আলো দেখা দিতেই প্রসন্ন কবিমন আপন কল্পনার মহিমায় জাগিয়া উঠিল—লিখিত হইল সাবিত্রী কবিতাটি। কলম্বো হইতে মার্সাই বন্দরে পৌছিবার মধ্যে ছয়টি কবিতা লিখিত হইল। এই ছয়টি কবিতার সমান্তরালে চলিয়াছে পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী—যাহাকে আমরা এই কাব্যের পটভূমি বলিয়াছি।

ফ্রান্সের শেরবুর্গ বন্দর হইতে দক্ষিণ আমেরিকার বুয়োনেস এয়ারিস পর্যন্ত সমুদ্রপথে অনেকগুলি কবিতা লিখিত হইয়াছে। আবার বুয়োনেস এয়ারিসে থাকাকালীন আরো অনেকগুলি কবিতা লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার মতো এই যে ইহাদের সমান্তরাল ভাবে গদ্যের কলম চলে নাই। আবার বুয়োনেস এয়ারিস হইতে ইটালী ফিরিবার পথে কবির গদ্যের কলম বেশ সচল—নাই কবিতা। তারপরে ইটালী হইতে বোম্বাই ফিরিবার পথে সমুদ্রপথে লিখিত হয় তিনটি কবিতা, সঙ্গে অবশ্য ডায়ারী আছে, তবে দুয়ের যোগাযোগ খুব স্পষ্ট নয়। একটি কবিতা ইটালীর মিলান শহরে লিখিত। ইহাই পূরবী কাব্য-

---

[১] প্রথম অংশে ষোলটি। তন্মধ্যে শেষ ছয়টি ১৩৩০ সালের ফাল্গুন মাসে লিখিত। অন্য দশটি তার আগে বিভিন্ন সময়ে রচিত।

প্রধান অংশে ষাটটি কবিতা, রচনাকাল ১৯২৪ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২৫ সালের ২৪শে জানুয়ারী, মোট চার মাস কাল।

রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পাঠকের সুবিধা হইবে আশায় পাদটীকায় আমরা কবিতা ও গদ্যের জোড়-মেলানো রূপের একটা খসড়া দিলাম।[২]

পূরবীর বহিরঙ্গের আলোচনা একরকম শেষ করিয়া এবারে আমরা অগ্রসর হইতে পারি। বলাকা কাব্য প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে, তারপরে পূরবীর প্রকাশ ১৯২৫ সালে। মধ্যবর্তী নয় বৎসরে কবি গান লিখিয়াছেন অনেক —আর কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন দুইখানি; পলাতকা ও শিশু ভোলানাথ; প্রথমখানি নারী-বিষয়ক, দ্বিতীয়খানি শিশু-বিষয়ক। এ দু'খানার গুরুত্ব হ্রাস না করিয়াও বলা চলে যে, বলাকার পরে পূরবী রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য প্রধান কাব্য। আর এ কাব্যখানি বলাকার মতো মিশ্র ভাবোপাদানে গঠিত নয়— ইহা অমিশ্র প্রেমের কাব্য। কিন্তু আলোচনার পথে আরো একটু অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে এই চারখানি কাব্যে—বলাকা, পলাতকা, শিশু ভোলানাথ ও পূরবীতে যোগটা ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক।

বলাকা কাব্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে* আমরা বলিয়াছি যে পৃথিবীর বৃহৎ

---

| [২] পূরবী কাব্যের কবিতা | পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারীর পৃষ্ঠাঙ্ক |
|---|---|
| সাবিত্রী— | ৩৭৬—৩৭৮ |
| পূর্ণতা— | ৩৮৬—৩৯৬ |
| আহ্বান— | ৩৮৬—৩৯৬ |
| ছবি— | ৩৯৬—৩৯৮ |
| লিপি— | ৩৯৯ |
| ক্ষণিকা— | ৪০৩ |
| খেলা— | ৪০৩—৪০৯ |
| পদধ্বনি— | ৪৩৮—৪৪০ |

পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী রবীন্দ্ররচনাবলী উনবিংশ খণ্ডের যাত্রী গ্রন্থের অন্তর্গত। পৃষ্ঠাঙ্কগুলি সেই গ্রন্থভুক্ত।

এই সব কবিতার প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়াও রক্তকরবী, শিশু ভোলানাথ প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা আছে পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারীতে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব ও নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়ক বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও আলোচনা পাওয়া যাইবে গ্রন্থখানির মধ্যে।

* কথাসাহিত্য, শ্রাবণ ১৩৬৭, পৃ. ৯১০—৯৩৩

সামাজিক সমস্যায় কবির মন যখন উত্তেজিত ছিল তখন হঠাৎ বহুকাল পূর্বে পরলোকগত প্রিয়জনের একখানি ছবির সম্মুখে তিনি উপস্থাপিত হইলেন। সেই মানসিক ভূমিকম্পে প্রিয়জনের স্মৃতি ও সেই স্মৃতির সূত্রে তাঁহার 'ভুলে-যাওয়া যৌবন' কবির কাছে এমন একটা মহত্তর বাস্তবসত্তা লাভ করিল যে সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। ইহার একমাত্র তুলনা প্রথম যৌবনের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার ছাপ যেমন বহন করিতেছে পরবর্তী কাব্যসমূহ, বলাকার এই অভিজ্ঞতার ছাপ তেমনি বলাকা-পরবর্তী কাব্যসমূহে। বলাকা-পরবর্তী অধিকাংশ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা এই অভিজ্ঞতার শিখর হইতে নির্গত। সে অভিজ্ঞতার মূল কথা প্রেম, অধিকাংশ পরবর্তী কাব্য ও কবিতা প্রেম-বিষয়ক। পূরবী এই শ্রেণীর কাব্যের পুরোভাগে অবস্থিত। বলাকার অভিজ্ঞতায় দ্বিতীয় যৌবনের সিংহদ্বারে জীবনের এক রহস্যময় নিকেতনে কবি প্রবেশ করিয়াছেন।

পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারীর ভূমিকাস্বরূপে কবি বলিতেছেন যে, ডায়ারী লেখা তাঁহার অভ্যাস নয়, কিন্তু এবারে ডায়ারী লিখিবেন। উপলক্ষ্যটা তুচ্ছ, একটি মেয়ের অনুরোধ। ইহা নিতান্তই উপলক্ষ্য—আসল কথা, অনেক বিষয় মনের মধ্যে জমিয়া ছিল, সেগুলি প্রকাশ করা আবশ্যক। ঐ অনুরোধটুকু না থাকিলেও, খুব সম্ভব অন্য একটা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া লইয়া তিনি ডায়ারী লিখিতেন। কিন্তু এই রচনাটিকে কবি কেন ডায়ারী অভিধা দিলেন জানি না, ডায়ারীতে যে প্রাত্যহিক পরিবেশ প্রত্যাশিত, দৈনন্দিনের সঙ্গে চিরন্তনের যে মিশ্রণ স্বাভাবিক—ইহাতে তাহার কিছুই নাই। পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী প্রাত্যহিক পরিবেশ বিমুক্ত চিন্তাধারা। সন-তারিখের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ইহা একখানি অবিচ্ছিন্ন দার্শনিক সন্দর্ভ—যাহার মূল বক্তব্যবিষয় প্রেমতত্ত্ব ও নরনারীর সম্পর্ক। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বিষয়টা ব্যাপকভাবে তাঁহার মনের মধ্যে ছিল—এবারে অনবচ্ছিন্ন অবকাশের সুযোগে প্রকাশের পথ পাইল। বলাকা কাব্য-রচনার সময় হইতেই এ দুটি বিষয় কবির মন অধিকার করিয়াছিল, তাহারি কাব্যময় প্রকাশ পলাতকা ও শিশু ভোলানাথে পাইয়াছি—এখন গদ্যে, পদ্যে, তত্ত্বে, কাব্যে পূর্ণাঙ্গ রূপে পাইলাম পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারীতে ও পূরবীতে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে দ্বিতীয় যৌবনটা, যাহাকে তিনি 'প্রৌঢ়ের যৌবন' বলিয়াছেন অধিকতর সার্থক। এই 'প্রৌঢ়ের যৌবনের' পূর্ণ ব্যাখ্যা আছে ফাল্গুনী নাটকে—আর ইহার প্রথম অতর্কিত সাক্ষাৎ বলাকা কাব্যে। এই

সূত্রটি হইতে একাধিক উপসূত্র বাহির হইয়াছে। তাঁহার কল্পনার উপরে রূপান্তর-প্রাপ্ত নারীর প্রভাব সমধিক। আমরা আগে প্রসঙ্গান্তরে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে কোন বস্তু, ঘটনা বা মানুষ দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনাকে তেমন করিয়া উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। এখানে দূরত্ব বলিতে মৃত্যুকেও বুঝিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে যে কয়জন মানুষ বার বার উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে তাহাদের সকলেই তরুণ বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছে। আর এই লোকান্তরপ্রাপ্তির পরে তাহারা যেন অধিকতর দিব্যমূর্তি গ্রহণ করিয়া কবির চিত্তাকাশে উদিত হইয়া আলোছায়ার লীলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বলাকার সেই ছবিখানা যাহারই হোক সে ব্যক্তি মৃত, দীর্ঘকাল পূর্বে মৃত—তাই সে কবির জীবনে এমন প্রোজ্জ্বল ভাবে সফল। যৌবন দেহের ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়া মনের মধ্যে ফিরিয়া আসিলে তবে প্রৌঢ়ের যৌবন—ঠিক সেই নিয়ম অনুসারেই প্রিয়ব্যক্তি জীবলোক হইতে অপসৃত হইয়া স্মৃতিলোকে পুনরুদিত হইলে তবেই যেন তাহার পূর্ণ প্রভাব প্রকট হয়। "স্মৃতির চেয়ে আসলটিতে আমার অভিরুচি"—এ ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের কথা; কবি-রবীন্দ্রনাথের কথা ঠিক উল্টা। বস্তু, ঘটনা ও মানুষ একবার বিস্মৃতিসাগরে ডুব দিয়া উঠিয়া দিব্যমূর্তি না ধারণ করা পর্যন্ত তাঁহার কল্পনার অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার পায় না। এই জন্যেই ডায়ারী ও সাময়িক কবিতা রচনায় তাঁহার আগ্রহের অভাব। ডায়ারী দিনের সঞ্চয় তথ্যের ডালায় ধরিয়া রাখে; সাময়িক কবিতা সময়ের অঙ্কপাত ভুলিতে দেয় না। আর জীবন্ত মানুষ সন তারিখ ও তথ্যপুঞ্জের সহিত এমন জড়িত যে তাহার সম্যক্ রূপটি, বিশুদ্ধ রূপটি পড়িতে চায় না কবির চোখে—সেজন্য তাহাকে মরিয়া দ্বিজত্ব লাভ করিতে হইবে কবির জগতে। তাই পূর্বোল্লিখিত মূল সূত্রের উপসূত্র হইতেছে কবির কাছে মিলনের চেয়ে বিরহের মূল্য বেশি।

> "মিলনে আছিলে বাঁধা
> শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
> আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছ, প্রিয়ে,
> তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।"

'শুধু এক ঠাঁই' দেখা নিতান্তই আংশিক দেখা, তাহাতে তৃপ্তি নাই, সম্যক দেখাই সত্য দেখা, সে-দেখা একমাত্র বিরহেই সম্ভব। "বিয়াত্রিচে দান্তের কল্পনাকে

যেখানে তরঙ্গিত করে তুলেছে সেখানে বস্তুত একটি অসীম বিরহ। দান্তের হৃদয় আপনার পূর্ণচন্দ্রকে পেয়েছিল বিচ্ছেদের দূর আকাশে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর হয়তো বাইরের বিচ্ছেদ ছিল না, কিন্তু কবি যেখানে তাকে ডেকে বলছে,

তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা—

সেখানে রজকিনী রামী কোন্ দূরে চলে গেছে তার ঠিক নেই। হোক-না সে নয়নের তারা তবুও যে-নারী বেদবাদিনী, হরের ঘরণী, সে আছে বিরহ-লোকে। সেখানে তার সঙ্গ নেই, ভাব আছে। নারীর প্রেমে মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের বেদনা।" [৩]

"তারপরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এলো বিচ্ছেদ অপার।
দেখাশুনা হল সারা,
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর।
তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা-একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।" [৪]

পূরবী কাব্য তথা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রেমকাব্য বিরহের শূন্যতা-মন্থন-জাত 'স্বপ্নের ভুবন'। এখন এই যে রূপান্তরপ্রাপ্ত নারী, রবীন্দ্রনাথ তাহার নাম দিয়াছেন লীলাসঙ্গিনী। জীবলোক ও স্মৃতিলোক ব্যাপিয়া কবি ও কবি-প্রেয়সীতে যে নিত্যলীলা চলিতেছে, সেই লীলাসহচরীর অন্য আর কোন্ নাম

[৩] পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী, পৃ. ৩৯৪, র-র, ১৯শ খণ্ড

[৪] পূর্ণতা, পূরবী

সম্ভব? মূল সূত্রের ইহা আর একটি উপসূত্র। পূরবী কাব্যের বিস্তারিত আলোচনাপ্রসঙ্গে লীলাসঙ্গিনী তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, কাজেই এখন তাহাতে বিরত থাকিলাম। এবারে পূরবী কাব্যের বিশদ পরিচয়ে অবতীর্ণ হওয়া যাক্।

॥ ২ ॥

বলাকা কাব্যের গুরুত্ব প্রসঙ্গ বারে বারে উল্লেখ করিয়াছি। বলাকা-পরবর্তী রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের বিভিন্ন ধারা-উপধারার সহিত বলাকা কাব্যের নিবিড় যোগ—বস্তুত বলাকার শিখরেই ইহাদের উদ্ভব। ফাল্গুনী নাটকে প্রৌঢ়ের যৌবনের বিশদ চিত্র—তাহার মূলে বলাকার "ভুলে-যাওয়া যৌবনের" অতর্কিত আহ্বানের অভিজ্ঞতা। পলাতকা কাব্যে নারীজীবন সম্বন্ধে যে নূতন ধারণা কবির মনে দেখা দিয়াছে—বলাকা-পূর্ব-জীবনে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাধান্য নারীর মাতৃমূর্তির, বলাকা-পরবর্তী-জীবনে রবীন্দ্রসাহিত্যে সেই প্রাধান্য পাইয়াছে নারীর প্রেয়সী মূর্তি—পলাতকায় প্রথম স্পষ্টভাবে সেই প্রেয়সী নারীকে দেখিতে পাই—এই পলাতকা কাব্যখানির উৎসও বলাকার নিভৃত গহ্বর। ১৯২২ সালে শিশু ভোলানাথ কাব্যে যে শিশুকে পাই, সে শিশু কাব্যের শিশুর ন্যায় real নয়—সে আগাগোড়া ideal, সে কবির বৃদ্ধবয়সের, দ্বিতীয় শৈশবের লীলা-সহচর। শিশু ভোলানাথ কাব্য রচনার বিস্তারিত পটভূমি পাওয়া যাইবে পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারীতে।* কৌতূহলী পাঠকদের পূর্ণ বিবরণ পড়িবার ভার ছাড়িয়া দিয়া এখানে নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার করিয়া দিলাম।

"তার পরে কথাটা এই যে, ঐ 'শিশু ভোলানাথ'-এর কবিতাগুলো খামকা কেন লিখতে বসেছিলুম। সেও লোকরঞ্জনের জন্যে নয়, নিতান্ত নিজের গরজে।

"পূর্বেই বলেছি, কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম, কিছুই জমিয়ে তোলবার মতো এত বড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্ধা করে; কিন্তু কিছুই থাকবে না, আজ বাদে কাল সব সাফ হয়ে যাবে।

* পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী, পৃ ৪০৩—৪০৯, র-র, ১৯শ খণ্ড

যে-স্রোতের ঘূর্ণীপাকে এক-এক জায়গায় এই সব বস্তুর পিণ্ডগুলোকে স্তূপাকার করে দিয়ে গেছে সেই স্রোতেরই অবিরত বেগে ঠেলে ঠেলে সমস্ত ভাসিয়ে নীল সমুদ্রে নিয়ে যাবে—পৃথিবীর বক্ষ সুস্থ হবে। পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ ; সে কিছু জমতে দেয়না, কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায় ; সে-যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্য তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড় ক'রে সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরী করে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড় বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে ; এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধুলানিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্যে সূর্যকে পরাভূত করে দিয়ে তারপরে নিজের দৌরাত্ম্যের কোনো চিহ্ন না রেখে চলে যায়, এসব তেমনি করেই শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

"কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদ্‌গারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম। সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ঐ পথিকের সহচর।

"আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে, তেমনি করে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এত বড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে, সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে-শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।

"এই কথাটার এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছি এইজন্যে যে, যে-লীলালোকে জীবনযাত্রা শুরু করেছিলুম, সে-লীলাক্ষেত্রে জীবনের প্রথম অংশ অনেকটা কেটে

গেল। সেইখানেই জীবনটার উপসংহার করবার উদ্বেগে কিছুকাল থেকেই মনের মধ্যে একটা মন-কেমন-করার হাওয়া বইছে।”[৫]

রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনতত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই লীলারহস্য বোঝা অত্যাবশ্যক। কবির দৃষ্টিতে এই বিশ্বব্যাপারটাই লীলা, যাহার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত ভগবানের লীলাময় রূপ। মানুষ নিজের স্বরূপ বুঝিলে দেখিতে পায় যে সে বিধাতার লীলাসহচর। এই বিশ্বব্যাপী লীলানিকেতনেরই একটা ক্ষুদ্রতর রূপ মানুষের সংসার। সেখানে কবি লীলানায়ক, তাহার সহচর যে শিশু সে-ও লীলাময়—তাই সে ideal! এই লীলাতত্ত্ব নারীর উপরে আরোপ করিলে যে নারীকে পাই সে “বিশ্বের কবিতা” বা “গৃহের বনিতা” নয়—সে নিতান্তই লীলাসহচরী, লীলাসঙ্গিনী। বলাকা-পরবর্তী কবির মানসী হইতেছে কবির লীলাসঙ্গিনী। সেই লীলাসঙ্গিনীর প্রথম নিঃসংশয় উজ্জ্বল প্রকাশ পূরবী কাব্যে। তাই পরবর্তী সমস্ত কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পূরবীর এত মূল্য।—এই লীলাসঙ্গিনী নারী ‘শিশু ভোলানাথ’ কাব্যের শিশুর মতোই ideal। এই লীলাসঙ্গিনী কোন বিশিষ্ট নারীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে না—এ কথা একমুহূর্তের জন্যও ভুলিলে চলিবে না। কবির জীবনে পর্বে পর্বে যে-সব নারীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহাদের স্মৃতি, মাধুর্য, করুণা, সৌন্দর্য প্রভৃতি উপাদান লীলাসঙ্গিনীর মধ্যে থাকিতে পারে, বস্তুত তাহাদের উপাদানেই লীলাসঙ্গিনীর মিশ্র মূর্তি গঠিত, তৎসত্ত্বেও সে ক, খ, গ প্রভৃতি কোন বিশিষ্ট মহিলা নয়। Real যখন ideal হইয়া ওঠে তখন এই নিয়মেই ওঠে।

এখন এই লীলাসঙ্গিনী তত্ত্বটা, লীলাসঙ্গিনীর স্বরূপটা বেশ ভালো করিয়া না বুঝিলে রবীন্দ্রপ্রেমতত্ত্ব বোঝা সহজ হইবে না। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে অনেকের অভিযোগ এই যে তাহাতে যেন মানবিক স্পর্শের অভাব। চণ্ডীদাসের অনেক পদ পড়িতে পড়িতে মনে হয় কবি যেন আমাদের হৃদয় নিঙড়াইয়া শেষ বিন্দু রস নির্গত করিয়া লইতেছেন, কবিতার ধ্বনি যেন “চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি হৃদয় সহিত মোর”—তারপরে অতর্কিত পাঠক দেখিতে পায় কখন্ যেন রাধিকার আর্তির আগুনের তাপে নিজের দেহ তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথে এ সমস্ত কিছুই নাই। তাঁহার নায়িকা যেন স্ফটিকের প্রাচীরের অন্তরালে। হাত বাড়াইলে তাহাকে পাইনা,

[৫] পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী, পৃ. ৪০৮-৪০৯, র-র, ১৯শ খণ্ড

হাতে ঠেকে স্ফটিকের শীতলতা। তাঁহার প্রেমের কবিতার উপবনে যে বসন্তের হাওয়া বহিতেছে তাহাতে ফুলের পরাগ, জীর্ণ পাতা ও পাঠকের মন কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়—সবসুদ্ধ মিলিয়া একটা বাসন্তিক উদ্‌ভ্রান্তি ও দীর্ঘনিশ্বাসের উদাসীনতা। এখন এই ধারণা যদি সত্য হয়, তাঁহার অধিকাংশ প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে নিশ্চয় সত্য, শেষজীবনের প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে তো নিঃসন্দেহ সত্য, তাঁহার প্রেমের কবিতা যদি "বিশ্ব হ'তে হারিয়ে-যাওয়া স্বপ্নলোকের চাবি"—খুঁজিতে উদ্যত করিয়াই ইসারায় জানাইয়া দেয় যে তাহা আর ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব নয়—তবে তাহার প্রধান কারণ কবির মানসী লীলাসঙ্গিনী, ideal-এর রসে সে গঠিত, বিরহের পটে সে অবস্থিত। স্মৃতির ক্ষুধিত পাষাণের ছলনাময়ীর মতো সেই নারীর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে কবি বিস্মিত হন—

"এলো চুলে বহে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল?
বকুলগন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল?"

তারপরে একটু সম্বিৎ পাইয়া যেন চিনিতে পারেন—

"দুয়ারবাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী।"

পূরবী কাব্যের গোড়ার দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রার পূর্বে লিখিত কবিতাগুলি যে অংশে স্থান পাইয়াছে তাহাতে এই তিনটি কথাই সংক্ষেপে বর্তমান। এই অংশটাকে সমগ্র পূরবী কাব্যের ভূমিকা বলিলে মন্দ হয় না। বলাকা কাব্যে 'ভুলে-যাওয়া যৌবন' কবিকে অক্ষয় মন্দারের মালা পাঠাইয়াছে। তপোভঙ্গ কবিতায় সেই ভুলে-যাওয়া যৌবনের দিনগুলি হঠাৎ ঢেউয়ে ঢেউয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

"যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী।

চঞ্চল চৈত্রের রাতে
কিংশুকমঞ্জরী-সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি।
আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণশুভ্র মেঘের ভেলায়
গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায়,?"

সে-সব দিন কি একেবারেই চলিয়া গিয়াছে ?

"নহে নহে, আছে তারা ; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সংগোপনে।"

বলাকা কাব্যে যৌবন নিজে জানাইয়াছে সে আছে,—নূতনতর, উজ্জ্বলতর মূর্তিতে আছে। এখানে কবি জানাইতেছেন সে আছে স্বয়ং মহাপ্রেমিক আদি দম্পতির ধ্যানের অন্তর্গত হইয়া আছে। 'নাই' এ কথাটা শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসীদের অহমিকা-সঞ্জাত ভ্রান্তি। এখন এই রূপান্তরিত যৌবনের অমরাবতীই হইতেছে রূপান্তরিত মানসীর খেলার ঘর—লীলাসঙ্গিনীর লীলাভূমি। গানের সাজি ও লীলাসঙ্গিনী কবিতা দুটি এই প্রসঙ্গে পাঠ্য।

"রসে বিলীন সে-সব দিন
ভরেছে আজি বরণডালা
চরম তব বরণে।
সুরের ডোরে গাঁথনি ক'রে
রচিয়া মম বিরহমালা
রাখিয়া যাব চরণে।"

সে-সব দিন বিস্মৃতির টানে চলিয়া যায় নাই বলিয়াই আজ পায়ে রাখিয়া আসা সম্ভব হইতেছে। 'রসে বিলীন' দিনগুলি ভাবলোক উত্তীর্ণ হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে। আর বকুলবনের পাখী কবিতাটিতে কবির চোখে হঠাৎ পড়িয়াছে নিজের বহুকাল আগেকার বালকমূর্তিটি।

"বালক ছিলাম কিছু নহে তার বাড়া,
রবির আলোর কোলেতে ছিলেম ছাড়া,

চাঁপার গন্ধ বাতাসের প্রাণ-কাড়া
যেত মোরে ডাকি ডাকি।
সহজ রসের ঝরণা-ধারার 'পরে
গান ভাসাতেম সহজ সুখের ভরে।"

এখানেই সেই সংশয়ভরা প্রশ্ন—সে-সব দিন কি সত্যই চলিয়া গিয়াছে?

"যায়নি সেদিন যেদিন আমার টানে,
ধরার খুশিতে আছে সে সকলখানে;
আজ বেঁধে দাও আমার শেষের গানে
তোমার গানের রাখি।"

না, কিছুই যায় নাই, পৃথিবীর আনন্দের সহিত মিশিয়া সর্বব্যাপী হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। বালকের আনন্দ আজ সর্বলোকের আনন্দ। কাজেই দেখা যাইতেছে রূপান্তরিত যৌবন, মানসী ও বালক অর্থাৎ প্রৌঢ়ের যৌবন, লীলা-সঙ্গিনী ও শিশু ভোলানাথ এই তিনটিই সমসূত্রে উপস্থিত। এখন এই তিনটি আইডিয়াকে মনের মধ্যে লইয়া কবি দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা উপলক্ষ্যে জাহাজে চড়িয়াছেন। আর সমুদ্রপথের সুদীর্ঘ অবকাশের সুযোগে এই ভাব তিনটি অবাধে শাখাপ্রশাখা মেলিয়া দিয়া পূরবী কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

॥ ৩ ॥

পূরবীর আহ্বান কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব তথা রূপান্তরিত প্রেয়সীতত্ত্ব বীজাকারে রহিয়া গিয়াছে।* তপোভঙ্গ কবিতা যদি ভুলে-যাওয়া যৌবনের পুনঃস্মরণে লিখিত হয়—আহ্বান কবিতা ভুলে-যাওয়া নারীসমূহের, যাহারা এখন মিলিয়া মিশিয়া গিয়া *The woman* বা আদর্শ নারীতে পরিণত হইয়াছে—পুনঃস্মরণ। ঊষা যেমন

---

* সাবিত্রী একটি সার্থক ও উচ্চাঙ্গ কবিতা। কিন্তু যে ভাবসূত্রে আমরা পূরবী কাব্যের অধিকাংশ কবিতা গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছি—সাবিত্রী তাহাদের অন্তর্গত নয়। সূর্যের আলোর সঙ্গে কবির ইন্দ্রিয়সমূহের, সবিতৃদেবের সঙ্গে কবির মনের যে নিগূঢ় যোগ আছে—এই কবিতায় তাহারই প্রকাশ। ওটিকে পূরবী কাব্যের উদ্বোধনী কবিতা মনে করা উচিত। এই উদ্বোধনী কবিতা কবিকল্পনাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিয়া পূরবী কাব্যের স্বর্ণদ্বার খুলিয়া দিয়াছে।

অন্ধকারে আত্মবিস্মৃত জগৎকে সম্বিৎ দান করিয়া আত্মস্থ করিয়া তুলিয়া গানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে—তেমনি

"তুমি সে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী
দেবতার দূতী।
মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকূতি।
* *
তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে,
মানসতরঙ্গতলে বাণীর সঙ্গীতশতদল
নেচে ওঠে জেগে।"

সেই অভিসারিকা নারীর জন্যই কবির চিত্ত অপেক্ষা করিয়া আছে। সে আসিবে, কবিকে দিয়া জীবনের চরম গান গাওয়াইবে—তারপরে এই লীলার অবসান। সেই নারীকে আহ্বান এই কবিতায়।

"আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী বিচিত্রবেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।"

এখানে 'সে নারী বিচিত্রবেশে'—এই শব্দকয়টির উপরে একটু জোর দিতে চাই। এখানে একসঙ্গে এক এবং অনেককে পাইলাম। আমরা আগে বলিয়াছি যে কবির জীবনে যুগে যুগে যে-সব নারী আসিয়াছে—তাহাদের উপাদানে একটি মিশ্র নারীসত্তা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা একরকমের স্মৃতির তিলোত্তমা। ইহাকেই রূপান্তরিত নারী বা আদর্শ নারী বলিয়াছি। 'বিচিত্রবেশ' বলিতে নিশ্চয় কেবল বহিরঙ্গের প্রসাধন বা সাজসজ্জা মাত্র বুঝাইতেছে না। বাস্তবের ক্ষেত্রে ইহারা বিচিত্র বা বহু বা *women* কল্পনার ক্ষেত্রে ইহারা এক বা ***The woman*** ! এই ***The woman*** পূরবীর নায়িকা, তাহার সঙ্গেই কবির লীলা, সে-ই কবির লীলাসঙ্গিনী। তাহাকেই এই কাব্যে তিনি ফিরিয়া ডাকিয়াছেন—আবার কখনো বা তাহার 'পরশরসতরঙ্গে' পুলকিত হইয়া কবি

গান রচনা করিয়াছেন। 'লিপি' কবিতায় পৃথিবীকে বিরহিণী নারীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে এবং অতঃপর পৃথিবী জীবজননী রূপে কল্পিত হইয়াছে। এখানে বিরহিণী রূপে তাহার কল্পনা অভিনব—এই অভিনবত্বের কারণ আর কিছুই নয়, এখানে পৃথিবীতে আদর্শ নারীরূপ আরোপিত হইয়াছে—কেননা, এখন চরাচরের চেতন অচেতন সমস্ত পদার্থই ঐ একমাত্র প্রসঙ্গেই সত্য। পরবর্তী ক্ষণিকা, খেলা, অপরিচিতা, আনমনা, ও বিস্মরণ প্রভৃতি কবিতা লীলাসঙ্গিনীর সহিত বিচিত্র লীলাপ্রসঙ্গে পূর্ণ। তন্মধ্যে ক্ষণিকা কবিতাটির একটু বিশদ ব্যাখ্যা আবশ্যক।

এবারে পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী হইতে যে অংশ উদ্ধার করিতে যাইতেছি তাহাতে অনেকগুলি বিষয়ের মীমাংসা হইবে। কবি লিখিতেছেন—"এও বুঝলুম, এ জগতে কাঁচা মানুষের খুব একটা পাকা জায়গা আছে, চিরকেলে জায়গা। ষাট বছরে পৌঁছে হঠাৎ দেখলুম, সেই জায়গাটা দূরে ফেলে এসেছি। ··· মন কাঁদছে, মরবার আগে গা-খোলা ছেলের জগতে আর-একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্ববিহীন খেলা। আর, কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটলো। তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়; তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে। ··· তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, 'আমার জীবনে যাতে সত্যিকার ফসল ফলিয়েছে সেই আলোর, সেই উত্তাপের দূত তোমরাই। প্রণাম তোমাদের। তোমাদের অনেকেই এসেছিলে ক্ষণকালের জন্য, আধো-স্বপ্ন আধো-জাগার ভোরবেলায় শুকতারার মতো, প্রভাত না হতেই অস্ত গেল।' মধ্যাহ্নে মনে হল তারা তুচ্ছ; বোধ হল, তাদের ভুলেই গেছি। তারপরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষত্রলোক সমস্ত আকাশ জুড়ে আমার মুখের দিকে চাইল, তখন জানলুম, সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয়, তারাই চিরকালের; ভোরের স্বপ্নে বা সন্ধ্যাবেলার স্বপ্নাবেশে জানতে না-জানতে তারা যার কপালে একটুখানি আলোর টিপ পরিয়ে দিয়ে যায় তাদের সৌভাগ্যের সীমা নেই। তাই মন বলছে, একদিন যারা ছোটো হয়ে এসেছিল আজ আমি যেন ছোটো হয়ে তাদের কাছে আর একবার যাবার অধিকার পাই; যারা ক্ষণকালের ভান করে এসেছিল, বিদায় নেবার দিনে আর একবার যেন তারা আমাকে বলে 'তোমাকে চিনেছি', আমি যেন বলি

'তোমাদের চিনলুম'।" [৭] এই অংশটির বিস্তারিত আলোচনায় নামিবার আগে সমান্তরালে লিখিত ক্ষণিকা কবিতার একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

"খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,—
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলিবেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা।"

মনে রাখা আবশ্যক ক্ষণিকা কবিতাটি ও ডায়ারীর পৃষ্ঠোক্ত অংশ একদিনের ব্যবধানে লিখিত। [৮]

আমরা আগে বলিয়াছি যে শিশু ভোলানাথের লীলাসহচর তত্ত্ব ও পূরবীর লীলাসহচরী বা লীলাসঙ্গিনী তত্ত্ব একই প্রেরণা হইতে সঞ্জাত। ডায়ারীর পৃষ্ঠোক্ত পাঠের পরে আর সে বিষয়ে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। "মন কাঁদছে, মরবার আগে গা-খোলা ছেলের জগতে আর একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্ববিহীন খেলা। আর, কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটলো।" দেখা যাইতেছে দুটি ভাবের মূলেই কবিচিত্তের একই প্রেরণা। ঐ দিনে লিখিত ডায়ারীর অংশেই শিশু ভোলানাথের বিস্তৃত আলোচনা আছে—তাহাও আমার মতের সমর্থক। প্রবন্ধমধ্যে বলিয়াছি যে কবির জীবনে যুগে যুগে যে-সব নারী আসিয়াছে, লীলাসঙ্গিনী তাহাদেরই মিশ্র একটা রূপ—অর্থাৎ সে এক হইলেও উপাদান রূপে অনেক আছে তাহার মধ্যে। সে একটি composite personality। ইহার অনুকূলেও প্রমাণ মিলিবে উদ্ধৃত অংশে—"কিশোর বয়সে যারা আমাকে", ··· আবার "তারা মস্ত বড় কিছুই নয়;।" কবিতায় যে নারী একবচনের চৌদোলে অধিষ্ঠিতা, বাস্তবে, তাহাদের জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল বহুবচনের বৃহৎ ময়ূরপঙ্খী নৌকার। আরো দেখা যাইবে যে কৈশোরে ও যৌবনে যে-সব নারী ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়া অস্ত

---

[৭] পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী, পৃ. ৪০৩, র-র, ১৯শ খণ্ড

[৮] ডায়ারীর অংশ ৫ই অক্টোবর, ১৯২৪; ক্ষণিকা কবিতা—৬ই অক্টোবর, ১৯২৪। এই প্রসঙ্গে তুলনীয় 'তারা' কবিতাটি।

গিয়াছিল কবির জীবনে, জীবনের উত্তরার্ধে তাহারাই যখন নক্ষত্ররূপে উদিত হইল তখন দেখা গেল যে দিবসের এলোমেলোর মধ্যে যাহাদের ক্ষণিকা মনে হইয়াছিল বস্তুতঃ তাহারা চিরক্ষণিকা—তাহারাই নক্ষত্রের মতো শাশ্বত। পূরবী কাব্যের কবিতার পরে কবিতা এই লীলাসঙ্গিনীর পদাঙ্কমেখলা রচনা করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে।

লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতার দৃষ্টান্তে আর একটু আলোচনা করিতে চাই, তার আগে লীলার কোন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কিনা দেখা আবশ্যক। খুব সম্ভব 'কিশোর প্রেম' কবিতাটিতে কবি আপনার অগোচরে ব্যাখ্যার সূত্রটি ধরাইয়া দিয়াছেন।

"অনেকদিনের কথা সে যে অনেকদিনের কথা ;
পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এল কোন্ জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর-প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা ;"

কবির পক্ষে এ লীলা সম্ভব হইয়াছে কেন, না, 'পুরানো সেই ঘাটের ধারে, ফিরে এল কোন্ জোয়ারে'—পুরাতন কিশোর-প্রেমের দরুন ব্যাকুলতার স্মৃতি।

আমার মনে হয় মানুষের চৈতন্যের স্রোতে রীতিমতো জোয়ার ভাটা খেলে। ভাটার টানে যাহা ভাসিয়া গিয়াছে জোয়ারের ঠেলায় তাহা মাঝে মাঝে পুরাতন ঘাটের ধারে ফিরিয়া আসে। ইহাকে স্মৃতির খেয়াল বলিয়া লঘু করিয়া দেখিলে চলিবে না। এই 'জোয়ার' স্মৃতির চেয়েও কিছু বেশি। কালিদাস দুষ্যন্তকে দিয়া বলাইয়াছেন—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি ন নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥

'ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি'—এ কি কেবল স্মৃতির খেয়াল? স্মৃতি কি জন্মান্তরের সংস্কার টানিয়া আনিতে পারে? না। রবীন্দ্রনাথ যে জোয়ারের কথা বলিয়াছেন খুব সম্ভব কালিদাস এখানে তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই জোয়ারের টানে রবীন্দ্রনাথের মনে 'কিশোর-প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা'

'আজ এসে মোর স্বপন মাঝে পেয়েছে তার বাসা'। অবশ্য কিশোর-প্রেমের এই স্মৃতি ইহজীবনেরই বস্তু। কিন্তু অন্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের দুষ্মন্তের মতোই জন্মান্তরের রহস্যের আবির্ভাবকে স্বীকার করিয়াছেন। বসুন্ধরা, ও সমুদ্রের প্রতি শ্রেণীর কবিতায় কবি যে 'মহাব্যাকুলতার' উল্লেখ করিয়াছেন তাহা 'ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি' পর্যায়ের বস্তু। উহার আর কোন ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না—উহার আর কোন প্রমাণও সম্ভব নহে। চৈতন্যের মধ্যে এইরূপ একটা প্রক্রিয়া আছে বলিয়াই আপনার অতীতের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া ও তাহাকে বাস্তবের সীমানাভুক্ত করিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে লীলার সম্পর্ক স্থাপন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়। 'আজ বেদনায় উঠল ফুটে—তার সেদিনের ব্যথা'।

ব্যাপারটি যেমন নিগূঢ় তেমনি কল্পনাতীত, কবিও অন্ধকারে ঢিল ছুড়িয়া ইঙ্গিতের বেশি করিতে সক্ষম নন। এখানে তেমনি একটি ইঙ্গিতের দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"মনের কথা যত
উজান তরীর মতো;
পালে যখন হাওয়ার বলে
মরণপারে নিয়ে চলে,
চোখের জলের স্রোত যে তাদের টানে
পিছু ঘাটের পানে
সেথায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা ব'সে আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে।"

মনের দোটানা ভাবটি, যাহার ফলে পুরাতন ঘাটের ধারে জোয়ারে ফিরিয়া আসা সম্ভব, এখানে ইঙ্গিতে অঙ্কিত হইয়াছে। খুব সম্ভব ইহাই লীলার মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি। এবার লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে।

লীলার সঙ্গে জীবনের গোড়াকার প্রভেদটা এই যে জীবন বর্তমান ও বাস্তবের অঙ্গ, লীলা বাস্তবের অতীত ও চিরন্তনের অংশ। চব্বিশ বৎসর বয়সে যার মৃত্যু হইয়াছে, হাজার বছর পরেও তাহার বয়স চব্বিশ থাকিবে। জীবনের কোন স্পর্শে আর সে আবিল হইবে না।

"তুমি পথ হ'তে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।"

এ দুয়ের মধ্যে আর একটি গোড়াগুড়ি প্রভেদ এই যে লীলারঙ্গমঞ্চের পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে একজনের স্থান বাস্তবের মধ্যে আর একজনের স্থান বাস্তবের উর্ধ্বে। সেইজন্যে দুজনের মধ্যে সম্বন্ধটি বড় বিচিত্র; প্রেম আছে অথচ প্রেমের আসক্তি নাই; আকর্ষণ আছে অথচ ঘরে ফিরিবার চেষ্টা নাই। এ জগতে যেন মাধ্যাকর্ষণের শক্তি নাই, দুজনেই বেশ হাল্কা। সেইজন্যেই এখানকার আবহাওয়ায় মুক্তিটা সহজলভ্য, সামান্য একটুখানি হাত বাড়াইলেই দেখা যায় যে আদৌ দুর্গত নয়। শুধু তাই নয়। বাস্তবের অঙ্গীভূত রূপে যে ব্যক্তি একসময়ে বন্ধনস্বরূপ ছিল লীলার জগতে—

"সেই তুমি আর নও তো বাঁধন,
স্বপ্নরূপে মুক্তিসাধন"—

তখন বড় একটি ভরসা ও আনন্দ পাওয়া যায়। লীলার ক্ষেত্রে মিলন মুক্তির মিলন—কবি সর্বদা সেইদিনের আশাতে আছেন—

"সেদিন আমার মুক্তি, যবে হবে, হে চিরবাঞ্ছিত,
তোমার লীলায় মোর লীলা।"

তখন ঝড় আসিয়া যে গর্জন করে তাহাও মুক্তির আশ্বাসে পূর্ণ—

"রাখি যাহা, তাই বোঝা,
তারে খোওয়া, তারে খোঁজা,
নিত্যই গণনা তারে, তারি নিত্য ক্ষয়।
ঝড় বলে এ তরঙ্গে
যাহা ফেলে দাও রঙ্গে
রয়, রয়, রয়।"

লীলারসে যে মুক্তি তাহারই জন্য কবির আকাঙ্ক্ষা—

"ক্লান্ত আমি তারি লাগি, অন্তর তৃষিত,
কত দূরে আছে সেই খেলাভরা মুক্তির অমৃত।"

যতক্ষণ জীবনে এই লীলারসের উপলব্ধি না ঘটিতেছে ততক্ষণই 'পদধ্বনিতে' শঙ্কা

জাগে—কত না অমূলক ভয় পাইয়া বসে। তবু মনের মধ্যে একটুখানি ভরসার মতো থাকে—এ বুঝি তাহারই, আমার দোসরের, আমার লীলাসঙ্গীর পদধ্বনি?

"হে বিরহী,
আমার অন্তরে দাও কহি
ডাকো মোরে কি খেলাতে
আতঙ্কিত নিশীথবেলাতে?"

আসক্তিহীন সম্বন্ধ, বন্ধনহীন প্রেম ও বাস্তবাতীত পরিবেশ এই লীলাতত্ত্বের মূল কথা, রবীন্দ্রনাথের লীলারসসঞ্জাত প্রেমের কবিতাগুলিরও মূল কথা। কাজেই লীলারসিক কবির চূড়ান্ত আশা অতি সামান্য, অতিশয় তুচ্ছ—

"ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা।
করেছিনু আশা।"

আশা করিতেছি এতক্ষণে লীলাতত্ত্বের একটা কাঠামো গড়িয়া তাহার মধ্যে পূরবী কাব্যখানাকে স্থান করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছি। আর একটুখানি চেষ্টা করিলে পূরবী কাব্যের প্রায় সমস্ত কবিতাগুলিকে কাঠামোর মধ্যে সাজানো সম্ভব হইতে পারে—কিন্তু তাহার প্রয়োজন আছে মনে হয় না, আমাদের ধারণা যদি যুক্তিসহ হয়, তবে খসড়াতেই পূর্ণরূপের আভাস পাওয়া যাইবে। তবু মনে হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আর একটু আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

সকল কবির মনে লীলারসের প্রভাব সমান প্রকট বা প্রবল নয়। কাহারো মনে বেশি কাহারো কম। এমন হয় কেন? রবীন্দ্রনাথের মনে যেমন প্রবল তেমনি প্রকট, তেমনি তার বৈচিত্র্য। বস্তুতঃ শেষ জীবনের অধিকাংশ প্রেমের কবিতা ও প্রেমের কবিতার আধিক্য—লীলারস হইতেই উদ্ভূত। আগে শুধাইয়াছি কেন এমন হয়, এখন, রবীন্দ্রনাথের বেলায় শুধাইতেছি কেন এমন হইল? অন্যান্য কারণের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হইতেছে যে তাঁহার মনের গড়নটাই ইহার অনুকূল। একটি গানে তিনি বলিয়াছেন যে "মাটির মাঝে বন্দী যে-জল মাটি পায়না তাকে"।—যখন সেই জল বাষ্পরূপে আকাশে উঠিয়া মেঘে পরিণত হয়, মেঘে পরিণত হইয়া বিচিত্র আকারের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া রঙে আর বাতাসে যখন লীলা সুরু করিয়া দেয়—তখনই তাহার পৃথিবীর বুকে ফিরিয়া আসিবার ভূমিকা সৃষ্টি হয়—অবশেষে ফিরিয়া আসে বর্ষণধারায়।

সমাপ্ত হয় তাহার চক্রাবর্তন। কবির মনেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে। বর্তমানের গণ্ডীতে আবদ্ধ মানুষকে যথার্থরূপে তাঁহার পাইবার উপায় নাই। সে মানুষ যখন স্মৃতির মেঘরূপে মনের আকাশে লীলা সুরু করে—তখনই তাহাকে পাইবার ভূমিকা রচিত হয়—অবশেষে বাণীরূপে নামে কবির কল্পনায়। এমন যে হয় তার কারণ কবির মনের বিশেষ প্রকৃতি। পূরবী কাব্যের 'পথ' ও 'চাবি' কবিতায় নিজ মনের বিশেষ প্রকৃতির বর্ণনা তিনি করিয়াছেন।

"আমি পথ, দূরে দূরে দেশে দেশে ফিরে ফিরে শেষে
দুয়ার-বাহিরে থামি এসে
ভিতরেতে গাঁথা চলে নানা সূত্রে রচনার-ধারা,
আমি পাই ক্ষণে ক্ষণে তারি ছিন্ন অংশ অর্থহারা,
সেথা হতে লেখে মোর ধূলিপটে দীপরশ্মিরেখা
অসম্পূর্ণ লেখা।"

কবির মন পথের মতো উদাসীন, পথের মতো সংসারের যাবতীয় সুখদুঃখের বাহন হইয়া সুখদুঃখের অতীত, সকলের হইয়াও সকল হইতে বিচ্ছিন্ন।

"শুধু শিশু বোঝে মোরে ; আমারে সে জানে ছুটি ব'লে,
ঘর ছেড়ে আসে তাই চলে।
নিষেধ বা অনুমতি মোর মাঝে না দেয় পাহারা,
আবশ্যকে নাহি রচে বিবিধের বস্তুময় কারা,
বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভরে—
শিশু বোঝে মোরে।"

আবার শিশুতে, লীলারসিক শিশু ভোলানাথে আসিয়া পড়িলাম। পথ সঙ্গ পায় শিশুতে, কবি সঙ্গী পান শিশু ভোলানাথে। পথের ভূমিকা লীলা, কবির ভূমিকা লীলার সাহায্যে।

এবারে চাবি কবিতাটি—

"বিধাতা যেদিন মোর মন
করিলা সৃজন
বহু-কক্ষে-ভাগ-করা হর্ম্যের মতন,
শুধু তার বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানা মতো অতিথির তরে ;

নীরব নির্জন অন্তঃপুরে
তালা তার বন্ধ করি চাবিখানি ফেলি দিলা দূরে।
মাঝে মাঝে পান্থ এসে দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
বলিয়াছে 'খুলে দাও' ; উপায় জানিনা খুলিবারে।
… … …
দূরে চেয়ে থাকি একা—
মনে করি, যদি কভু পাই তার দেখা
যে-পথিক একদিন অজানা সমুদ্র-উপকূলে
কুড়ায়ে পেয়েছে চাবি ; বক্ষে নিয়ে তুলে
শুনিতে পেয়েছে যেন অনাদিকালের কোন্ বাণী ;
সেই হ'তে ফিরিতেছে বিরাম না জানি।
অবশেষে
মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে
যাত্রা তার হবে অবসান ;
খুলিবে সে গুপ্তদ্বার কেহ যার পায়নি সন্ধান।"

কবি এখানে যাহার অপেক্ষায় আছেন, আহ্বান কবিতায় তাহাকেই ফিরিয়া ফিরিয়া ডাকিয়াছেন। সে চাবি কেহ কুড়াইয়া পাইয়াছে, একদিন আসিয়া অপূর্ব উন্মুক্ত দ্বার সে খুলিয়া ফেলিবে এই দুর্মর আশা কিছুতেই যায় না। আমার তো মনে হয়, সে চাবি কেহ কখনো পাইবে না, সে চাবি অতলে পড়িয়াছে। "বিশ্ব হ'তে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাবি"।

চিররুদ্ধ যাহার মন, বাস্তবের প্রবেশের পথ যেখানে নিষিদ্ধ সেখানে "বহু কক্ষে ভাগ করা" হর্ম্যকে লীলার পুত্তলি দিয়া সাজানোর আর কি উপায় থাকিতে পারে। বাস্তবের বিকল্প লীলাপুত্তলি সৃষ্টি করিয়া কবি শেষ জীবনে যে নূতন ভুবন গড়িয়াছেন—পূরবীতে তাহার প্রথম নিঃসংশয় পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ।

# সংগীত

[ "গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে, যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়—বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, কর্তব্যের দাবীগুলোকে মন এক-ধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।" —রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রসাহিত্যের রাজ্যে কাব্যের পরেই সংগীতকে নিঃসংশয়ে স্থান দেওয়া যেতে পারে। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা প্রায় দু'হাজার। প্রথমতঃ এই সংখ্যা-প্রাচুর্য এক বিরাট বিস্ময়ের ব্যাপার। তার ওপরে রয়েছে সুর-তাল-মান-সমেত ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে কবির অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রসঙ্গ। অতি শৈশবকাল থেকে ঠাকুর-পরিবারে সংগীত-চর্চার পরিবেশ তাঁর মনের উপর কিরকম প্রভাব বিস্তার করেছিল তা কবির নিজের বক্তব্য থেকেই অনুধাবন করা যাক।—

"আমাদের পরিবারে গানচর্চার মধ্যেই শিশুকাল হইতে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে, বাল্যকালে গাঁদাফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় আর-আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না।"

শৈশবে সংগীত-রচনার প্রথম উদ্যম প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতির গীতচর্চা অধ্যায়ে কবি বলেছেন,

"একসময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরী করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরগুলিকে কথা দিয়ে বেঁধে রাখবার প্রয়াসে যে বালক-সংগীতকারের হাতেখড়ি হয়েছিল, সেই বালকই পরবর্তী যুগে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতকার ও সংগীতজ্ঞ !

'রবীন্দ্রসংগীত' এই কথাটির দ্বারা একালে গানের জগতে একটি স্বতন্ত্র শাখার পরিচয় স্থায়ী হয়ে গেছে। কিন্তু শুধুমাত্র 'রবীন্দ্রনাথের রচিত গান'—এইটুকু বললেই রবীন্দ্রসংগীতের সম্পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। গানের বাণী, সুরবৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি গায়কী রীতির মৌলিকতা—প্রথমতঃ এই তিনটি বিষয়ের সমন্বিত পরিচয়ে রবীন্দ্রসংগীতের সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা দেওয়া যেতে পারে। কথাবস্তুতে ব্রহ্মসংগীত, স্বদেশ, পূজা, প্রেম, প্রকৃতি ইত্যাদি সব-রকমের গানেই রবীন্দ্রনাথের রচনারীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। প্রথম যুগে রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলির মধ্যে ভাবগত বিচারে কবির মৌলিকতার চেয়ে পরিবেশগত প্রভাব বেশী, এ কথা স্বীকার করে নিতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু পরবর্তী স্তরে রবীন্দ্রসংগীতের কথাবস্তু ভাবের আধারে স্থাপিত হয়ে এমন এক স্তরে গিয়ে পৌছেছে, যার বিশ্লেষণ করা দুরূহ। রবীন্দ্রসংগীতের এই পর্যায়ের কথাবস্তু অনুভূতির সামগ্রী।

সুরবৈশিষ্ট্য এবং সুরপ্রয়োগের বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রসংগীত মুখ্যতঃ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতরীতির সঙ্গেই বেশী সম্পর্কিত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের নিজস্ব লোকসংগীতের কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতির প্রাণরসসমৃদ্ধ ধারা। ভারতীয় রাগসংগীত, চলতি কথায় যাকে হিন্দুস্থানী সংগীত বলা হয়, তার প্রত্যক্ষ প্রভাবেই যে কিশোর বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথের মানসপুষ্টি ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্য-সংগীতের উপর তাঁর যথেষ্ট দখল থাকলেও, তাঁর সংগীতরাজ্যে পাশ্চাত্য-সংগীতের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব পড়েনি। প্রথমবয়সে গীতিনাট্য বাল্মীকি-প্রতিভায় পাশ্চাত্য-সংগীতের কিছু প্রভাব অবশ্য দেখা যায়।

> "এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম হইল। ... বাল্মীকি-প্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া। ... বিলাতি সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপ-গানে বসাইয়াছি। ..."

পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য-সংগীতের প্রভাব বা সুরপ্রয়োগের রীতি তাঁর গানে

আর ছিলই না বলা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

> " ... ইংরিজী গান গাবার অভ্যাস তাঁর অনেকদিন পর্যন্ত ছিল ; অন্যান্য দুই-একটা য়ুরোপীয় ভাষার সংগীতও তিনি চর্চা করতেন। কিন্তু তাঁর স্বরচিত গানের উপর বিদেশী সুরের প্রভাব খুব কমই পরিলক্ষিত হয়, সেটা আশ্চর্যের বিষয়। ...
>
> বিদেশী সংগীতের স্রোতে তিনি গা ভাসিয়ে দেননি, তার কারণ ছেলেবেলা থেকে তাঁদের বাড়ীতে ভাল হিন্দুস্থানী সংগীতবেত্তার যাতায়াত ছিল। যদু ভট্ট, মৌলাবক্স, এসব নাম আমাদের কানে শোনামাত্র হ'লেও, তাঁদের চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন, এবং এঁদের কাছে হিন্দু সংগীত শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল। বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী আমাদের কাল পর্যন্ত সে-সংগীতের জের টেনে এনেছিলেন, এবং তার পরে নানা দেশে নানা ভালমন্দ ওস্তাদ শোনবার সৌভাগ্য আমাদের অনেকেরই হয়েছে। সুতরাং কোনো বিশেষ ওস্তাদের কাছে রীতিমতো শিক্ষা না পেলেও সবসুদ্ধ হিন্দুসংগীতের মূলনীতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল এবং ভাল হিন্দী গানবাজনা শুনতে তিনি খুবই ভালবাসেন তা সকলেই জানেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম-সংগীত সকল প্রকার হিন্দী সুরের একটি রত্নাকরবিশেষ, তা মন্থন করলে হেন হিন্দী রাগতান নেই যা পাওয়া যায় না। এবং তার দ্বাদশ ভাগের প্রথম তিনভাগ বাদ দিলে, শেষ নয় ভাগের অধিকাংশ গানই বোধহয় রবীন্দ্র-রচিত।..."

ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য—উভয় রীতির সংগীতের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র একস্থানে বলেছেন,

> " ... সমুদ্রের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে গুন্‌গুন্ করে একটা দেশী রাগিণী ধরেছিলুম। তখন দেখতে পেলুম অনেকদিন ইংরাজি গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন শ্রান্ত ও অতৃপ্ত হয়েছিল। হঠাৎ এই বাংলা সুরটা পিপাসার জলের মতো বোধ হল। আমি দেখলুম সেই সুরটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যেরকম প্রসারিত হল এমন আর কোন সুর কোথাও পাওয়া যায় বলে আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরাজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরাজি

সংগীত লোকালয়ের সংগীত আর আমাদের সংগীত প্রকাণ্ড নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় সংগীত। কানাড়া, ঠুংরি প্রভৃতি বড় বড় রাগিণীর মধ্যে যে গভীরতা এবং কাতরতা আছে সে যেন কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়—সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গিহীন বিশ্বজগতের।"

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একবার আলোচনা হয়। উভয় রীতির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের মনের উপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতের যে ক্রিয়া তা বিশ্লেষণ করে দেখা শক্ত। পাশ্চাত্য সংগীত আমার মনকে খুব নাড়া দেয়। ··· আমাদের নিজেদের সংগীত আমাকে মুগ্ধ করে তার লিরিক দিয়ে, কিন্তু য়ুরোপীয় সংগীতের ধরনটা এপিকের মতো, তার পরিকল্পনা বিশাল ও তার ঠাট গথিক। *

অবশ্য উপসংহারে উভয় মনীষীই স্বীকার করেন যে এই দুই রীতির সংগীতের বহিরঙ্গে বৈসাদৃশ্য যা-ই থাকুক, শ্রোতাকে গভীরভাবে স্পর্শ করার মধ্যেই তাদের সার্থকতা। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য—উভয় সংগীতের মূল লক্ষ্যও তাই।

রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে একদিকে শাস্ত্রীয় রাগরাগিণীর সমাবেশ, অন্যদিকে লোকসংগীতের ধারা বিস্ময়কর ভাবে পাশাপাশি মিশে রয়েছে। পল্লীবাংলার সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ মর্মস্পর্শী প্রাণের কথা যে-সুরের পাখায় ভর করে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে সে-সুর রবীন্দ্রনাথকেও স্পর্শ করেছিল। তাই তাঁর রচিত প্রায় দু'হাজার গানের মধ্যে বাউল ভাটিয়ালি আর কীর্তনের সুর কখন কোথায় এসে মিশে গেছে। কখনও বা রাগসংগীতের গায়কী ঠাটের মধ্যেই অবলীলাক্রমে তার সংমিশ্রণ ঘটেছে। কবির নিজের বক্তব্য উদ্ধৃত করি—

"আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁহা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ

---

* *Asia* পত্রিকায় প্রকাশিত *Rabindranath—Einstein News*-এর রণজিৎকুমার সেন কৃত অনুবাদ থেকে গৃহীত। [ শিক্ষক। শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬৬ ]

করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞান বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেচে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। ··· এমন বাউলের গান শুনেচি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্যরচনা, তেমন ভক্তি রস মিশেচে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।"

জীবনস্মৃতি গ্রন্থে 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে কথা এবং সুরের সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা মার্গসংগীতের ক্ষেত্রে হয়তো প্রযোজ্য হ'তে পারে। কিন্তু 'রবীন্দ্রসংগীত' নামক যে অনুপম সংগীত-নির্ঝরের সন্ধান আমরা পেয়েছি তার ক্ষেত্রে কতদূর প্রযোজ্য, তা রীতিমতো আলোচনার বিষয়।

"দ্বিতীয়বার বিলাতে যাইবার পূর্বদিন সায়াহ্নে বেথুন সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকাল কলেজ হলে আমি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। ··· প্রবন্ধের বিষয় ছিল সংগীত। যন্ত্রসংগীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি গেয় সংগীত সম্বন্ধে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণীর সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। ··· কিন্তু, যে-মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে-মতটি যে সত্য নয়, সে-কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহন মাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো; বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। ··· বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভালো। হিন্দুস্থানি গানের কথা সাধারণত এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার করিতে পারে। এইরূপে রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপ ভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সংগীতের উৎকর্ষ। কিন্তু বাংলাদেশে বহুকাল হইতে

কথারই আধিপত্য এত বেশি যে এখানে বিশুদ্ধ সংগীত নিজের স্বাধীন অধিকারটি লাভ করিতে পারে নাই।”

ধ্রুপদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় সংগীতে অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞের উক্তি হিসাবে এর বক্তব্য বিষয়টুকু মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনা বা রস-গ্রহণ-কালে কবির এই মতবাদটি সম্পূর্ণ গ্রহণীয় কিনা এতে মতভেদ হবার অবকাশ আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাক, বাহার রাগের ভিত্তিতে গেয় ‘আজি কমলমুকুলদল খুলিল’ কিম্বা ‘আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে’ গান দুটির ক্ষেত্রে সংগীতাভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে কথাবস্তুর চেয়ে আলোচ্য রাগের রূপটি এবং ব্যঞ্জনাই হয়তো প্রধান হয়ে উঠবে, এমনকি রাগসংগীতে নিতান্ত অনভিজ্ঞ শ্রোতার মনেও বসন্ত বা বাহার রাগের ব্যঞ্জনা বেশ কিছুটা প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ‘কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি’ অথবা ‘কেন যামিনী না যেতে জাগালে না’ গানের কথাবস্তু যদি উহ্য বা অপরিস্ফুট থাকে তাহলে শ্রোতার কাছে এর সুরটুকুই যথেষ্ট হবে কিনা? রবীন্দ্রসংগীত থেকেই অজস্র উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায় যে, গানের বাণী সুরকে না ছাপিয়েও ভাব এবং ব্যঞ্জনা সৃষ্টির পক্ষে কতখানি অপরিহার্য। রবীন্দ্রসংগীতের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য তার সুরের সার্থকতায় এবং কথা বা কাব্যাংশের ভাবগভীরতায়। নিছক ধ্রুপদাঙ্গ বা রাগসংগীতগুলিকে বাদ দিলে, রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রায় দু’হাজার গানে কথাবস্তুর গুরুত্ব এত বেশী যে, তাকে আমরা কেবল মার্গসংগীতের গায়কী বৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়ে অগ্রাহ্য করতে পারি না। রবীন্দ্রসংগীতে কথা এবং সুর সম্পূরক পরিপূরক হ’য়ে যথার্থ সংগীতের আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছে। কেউ কাউকে ছাপিয়ে যায়নি।

আমরা এর আগের অধ্যায়ে ( কাব্য ) এই কথা বলবার চেষ্টা করেছি যে, রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টিসম্ভারের পটভূমিটি হ’ল কবি-মানস। তিনি তাঁর শিল্পসৃষ্টির জন্যে সাহিত্যের সবরকম মাধ্যমকেই গ্রহণ করেছেন এবং পরিণত বয়সে চিত্রকলা পর্যন্ত তাঁর প্রতিভা-প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সব-কিছুর পেছনেই সেই বিরাট কবিসত্তা—যা কেবলই প্রকাশের আগ্রহে আকুল। কাব্য, সংগীত, নাটক—স্রষ্টাশিল্পীর প্রতিভা যে মাধ্যমেই বিকশিত হোক-না কেন, তার পরিণত লক্ষ্য রসব্যঞ্জনার সৃষ্টি করা। ফর্ম্ বা আঙ্গিক যা-ই হোক-না কেন, তার পশ্চাতে শিল্পীমানসের নিজস্ব মুড্ বা বিভাবনা হ’ল সকল সৃষ্টির উৎস। কাব্য ও গানের রূপগত পার্থক্য আছে।

বিশেষ ক'রে নাটকের মতো সম্পূর্ণ Composite art না হ'লেও, গান অংশতঃ Composite আর্ট তো বটে। কাব্যের ক্ষেত্রে কবি এবং পাঠকের সম্পর্ক স্থাপনে অন্য কোনো আঙ্গিকের প্রয়োজন নেই, কিন্তু গানের ক্ষেত্রে সুর তাল লয় এবং কথা সব-কিছুর প্রয়োজন আছে। তা সত্ত্বেও বৃহত্তর আবেদনের বিচারে, কাব্য· এবং সংগীতে নিশ্চয়ই আকাশ-পাতাল পার্থক্য নেই। দুয়েরই উদ্দেশ্য পাঠক বা শ্রোতার চিত্তে ভাবের অনুরণন জাগানো—পার্থক্য শুধু পদ্ধতির। রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্তর্নিহিত 'মুড্' সংগীতের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সক্রিয়। অন্যথায়, তিনি সংগীতবিশারদ পণ্ডিত হয়তো হ'তে পারতেন, কিন্তু আর যাই হোক, সংগীত-রচয়িতা হ'তেন না। এ সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলা যেতে পারে। প্রথমে কবিতা হিসাবে রচিত হয়ে, পরে তা গানের রাজ্যে চলে গেছে এমন অনেক কবিতা রবীন্দ্রকাব্যে আছে। যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা করেন তাঁরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, এমন অনেক গান আছে যার আংশিক কথাবস্তু সুর এবং তাল-মানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্যে মূল কবিতার কথাবস্তু থেকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়েছে ('ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে' গানটি লক্ষণীয়)। বাংলাদেশের গানে 'কথার আধিপত্য' নিয়ে কবির যে অনুযোগ তার অসারতা বোধহয় সবচেয়ে বেশি প্রমাণিত হয়েছে তাঁরই রচিত অজস্র গানে। কথাবস্তুকে বাদ দিতে গেলে, রবীন্দ্রসংগীতের ঠিক হৃৎপিণ্ডটির উপরেই আঘাত পড়বে। সংগীত-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের ভাবগত মুড কবি রবীন্দ্রনাথের মুড থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

> "সৃষ্টির অন্তরতম অহৈতুক লীলার রসটিকে যখন মন পেতে চায় তখনি বাদশাহী বেকারের মতো সে গান লিখতে বসে। চারখানি পাপড়ি নিয়ে একটি ছোটো জুঁইফুলের মতো একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সেই মহাখেলাঘরের মেজের উপরেই তার জন্যে জায়গা করা হয় যেখানে যুগ যুগ ধরে গ্রহনক্ষত্রের খেলা হচ্চে। সেখানে যুগ আর মুহূর্ত একই, সেখানে সূর্য আর সূর্যমণি ফুলে অভেদাত্মা, সেখানে সাঁঝসকালে মেঘে মেঘে যে রাগ-রাগিণী, আমার গানের সঙ্গে তার অন্তরের মিল আছে।"

রবীন্দ্রনাথের গানের সার্থকতা এইখানেই সবচেয়ে বেশী। কারণ এ গানে শুধু তাল-মানের কসরতই নয়, স্রষ্টাশিল্পীর একটা কিছু বলবার কথাও আছে। সেই কথাই মানুষের কাছে এসে পৌছয় সুরের ডানায় ভর করে।]

# রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে

## ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্বন্ধে লিখতে যাওয়া ধৃষ্টতা মনে করি। তার কারণ এই : প্রথমতঃ প্রায় আড়াই হাজার গান তাঁর রয়েছে এবং কেবল সংখ্যার দিক থেকেও সেগুলি বিচিত্র। দ্বিতীয়তঃ, যদি বৈচিত্র্যের কথাও ধরা যায়, তা হলে 'মূড' বা ভাব, সিম্‌বল ও ইমেজ বা প্রতীক ও চিত্রকল্প সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্ত জানা যায় নি। সবই সাহিত্যিক অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন। অতএব গুণবাচক বর্ণনা ও বিচার প্রায় এক রকম অসম্ভব। সুতরাং সংখ্যাধিক্য আর বিচারের অভাবের জন্য আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের যৎসামান্য নমুনা তুলে নিচ্ছি। হয়তো আড়াই হাজার গানের এক সময় সাংখ্যিক বিচার হবে। যদি হয়, তা হলে আমাদের এই বিচার চলবে না। সংখ্যা তখন গুণে পরিণত হবে। আমি মধ্যেকার কথাই বলছি।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত—যদি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বলাই যায়—মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা চলে। বাল্য-রচনা ছেড়ে দিলে প্রথমে আসে ব্রাহ্ম সঙ্গীত। আঙ্গিকের দিক থেকে তাকে ধ্রুবপদ্ধতির গানই বলা যায়। অর্থাৎ ধ্রুপদের চার তুক, সরল সহজ অনাড়ম্বর গায়ন। তালও মোটামুটি সহজ, অর্থাৎ চৌতাল, ঝাঁপ, তেওরা, আড়া ইত্যাদি। তান নেই বললেই হয় এবং আছে মীড ও কিছু গমক। ভাষাও সরল, ধর্মের গান সহজ হতেই বাধ্য।

কিন্তু সেই সঙ্গে কবিতার প্রলেপও এসেছে। অবশ্য তার ফলে আঙ্গিকের ধর্মচ্যুতি হয় নি। শুদ্ধ ধ্রুপদ ছেড়ে দিলে অনেক পাকা খেয়াল, ধ্রুব খেয়াল এবং সামান্য টপ্পার ছোঁয়াচও আমরা পাই। সোরীর টপ্পা পাই না, লক্ষ্ণৌ ঠুংরীও বোধ হয় নেই। সঙ্গীত-রসের দিক থেকে কোনটা বেশি ভালো বলা যায় না। কিন্তু খাঁটি বাংলা গান হিসাবে, যাকে রাগ-প্রধান বলা হয়, ব্রাহ্ম

সঙ্গীতের অনেকগুলি গান সত্যিই অপূর্ব। এ সঙ্গীতে ভাব আছে এবং ভাবগুলি অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট অর্থাৎ 'অ-বিশেষ', ব্যক্তি-সম্পর্ক-রহিত বলে' হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতন উপভোগ্য। ব্রাহ্ম সঙ্গীতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধ্রুপদ আছে বলে' উপভোগ্য নয়, ধর্ম-সঙ্গীতের সাঙ্গীতিক আঙ্গিকের জন্যও বটে। মাত্র ভাষা হিসাবে অনেকগুলি চমৎকার, কিন্তু এখানে মাত্র ভাষার ব্যবহার করছি না।

পরবর্তী কালের রচনাগুলি বেশির ভাগই মিশ্রণ—স্বরের মিশ্রণ এবং একত্রে ভাষা ও ভাবের মিশ্রণ। আমার মতে, প্রায় হাজার গানে মিশ্রণ ঘটেছে এবং তার মধ্যে দেড় শ' কি দু শ' গানে এই ধরনের মিশ্রিত রাগের একটা সম্পূর্ণ গঠন বা স্ট্রাক্‌চ্যর-সহজেই পাওয়া যায়। তাকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বলা চলে। আবার তারও মধ্যে গোটা কতক গান আছে যেগুলো মিশ্রিত হয়েও অ-মিশ্রিত, যেগুলি খাঁটি রাবীন্দ্রিক। এই ধরনের প্রায় শ' দেড়েক গানের যে নিজস্ব গঠন রয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু আঙ্গিকের বিচার করা যেতে পারে।

আমি মূলতঃ গোটা কয়েক 'জনক' রাগ নিচ্ছি। ভৈরবীতে বোধ হয় সব চেয়ে বেশি এই ধরনের রাগ রয়েছে। সেগুলিতে একধারে আশাবরী, তিন চার রকমের টোড়ী ও অন্যধারে সামান্য ভোঁরো। (বাউল-ভাটিয়ালের কথা শেষে বলব।) এখন কথা এই—এই ধরনের মিশ্রণ প্রায় সমধর্মী অর্থাৎ 'কগ্‌নেট'। যথা ভৈরবীর কোমল রে গা ধা নি সারং, পূরবী, ইমন প্রভৃতির সঙ্গে মিশ খায় না, পাশাপাশি এই ভৈরবী ধরনের রাগের সঙ্গেই মিশ খায়।

তা যদি হয়, এবং মিশ্রণগুলি যদি একাঙ্গ হয়ে যায়, তবে তাদের প্রত্যেকের এক একটা রূপ ফোটে। সেখানকার রূপ ঠিক অ-বিশেষ নয় আবার সব সময় স-বিশেষও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি। অবশ্য স্বর চালু হবার পরই রূপ পায়। যদি কোনোটা মিশ্রণ সর্বাবাদি-সম্মতি-ক্রমে গৃহীত না হল, তবে সে স্বর অপ্রচলিত হয়ে মরে গেল। আবার অনেক দিন পরে ফিরেও আসে, যেমন দুর্গা। কিন্তু সহৃদয় হৃদয়বেত্তা—যাকে আমি সর্ববাদি-সম্মতি বলছি—গ্রহণ করলে রূপের নাম পাবে, যেমন ঠাকুরী ভৈরবী। অবশ্য একাধিক ঠাকুরী ভৈরবী রয়েছে।

ভৈরবীর পরে মল্লার। দেশ-মল্লার, নট-মল্লার, সুরঠ-মল্লার, মিঞা-মল্লার, শুদ্ধ মল্লার—এগুলো তো রয়েইছে প্রায় বিশুদ্ধভাবে, কিন্তু এ ছাড়া বর্ষার গানে অন্য ভাবে পিলু-বারোঁয়া এমন কি ইমনকল্যাণও দেখা যায়। তার কারণও সোজা। হিন্দুস্থানী গানে মল্লারের বিস্তর রূপভেদ রয়েছে। অতএব

রবীন্দ্রনাথের রচিত মল্লারে গোটা কয়েক ব্যতীত হিন্দুস্থানী মল্লারের রূপই বেশি।

এর পর পূরবী; সেখানে পূরবী-কল্যাণই প্রায় সব। কোমল ধৈবত বোধ হয় নেই, কোমল রেখাবও কম, আছে তুই মধ্যম।

তার পর বেহাগ। সেখানে কেদারার অন্য প্রকারের তুই মধ্যম, বিহাগড়ার কোমল নিখাদ ইত্যাদি। কেদারার অংশই বেশি মনে হয়। আমার মতে প্রায় সব রাগেই কেদারা পাওয়া যায় এবং তার মিশ্রণ সত্যিই অদ্ভুত।

এর পর এমন একটি বস্তু এলো যেটার মিশ্রণ অভূতপূর্ব। তিনি বাউল ও ভাটিয়াল গ্রহণ করলেন এবং তারই ফলে, শুদ্ধ বাউল-ভাটিয়াল ছেড়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে হিন্দুস্থানী রাগ মিশিয়ে দিলেন। অনেকগুলি ঠিক মেশেনি, আবার অনেকগুলি মিশেছে। (অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বাউল-ভাটিয়াল আর শুদ্ধ বাউল-ভাটিয়াল এক নয়। রবীন্দ্রনাথের হ'ল ছাঁকা বালি আর গ্রামের হ'ল পাঁকের মাটি।)

এই ধরনের মিশ্রণের একটা নতুন প্রকৃতি আছে। সেটা হ'ল জীবনের প্রকৃতি। সুর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সাহিত্যে ভাঙ্গন ধরেছে, আর্টে নতুন কিছু হচ্ছে না, একাডেমিক হয়ে যাচ্ছে,—সে সময় জমি থেকে, মাটি থেকে একটা নতুন জীবন বইতে থাকে। অতি-মানব জীবনেও তাই। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত 'ওস্তাদী' গান হয়ে গেল, নতুন কিছু হচ্ছে না, সব বন্ধ হয়ে গেল,—তখন মাটির হাওয়া চাই, বাউল-ভাটিয়াল হওয়া চাই। অবশ্য এটা একটা মোটামুটি ধারণা। আমি প্রায়ই মহাভারত থেকে একটা গল্প বলি। ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান। তাঁর পৌত্র আত্মীয়-স্বজন শিষ্যবৃন্দ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি জল চাইলেন, কেউ দিতে পারলেন না। তখন অর্জুন মাটির লক্ষ্যভেদ করলেন, জল উপচে উঠল। ভীষ্ম তাই খেলেন এবং তার পর তাঁর মৃত্যু হ'ল।

এখন বাউল-ভাটিয়াল হ'ল মাটির লক্ষ্যভেদ আর সেই বাউল-ভাটিয়ালকে রবীন্দ্রনাথ ঢেলে সাজালেন। অনেক গান এই রকম ঢেলে সাজা। তারই মধ্যে যেগুলি উত্তীর্ণ হয়ে গেল, সেগুলি নতুন এবং চমৎকারের অধিক যদি কিছু বলা যায়, তা হ'ল পূর্ণ। শোভন তো আছেই। প্রথমেই বলেছি যে রবীন্দ্র-নাথের বাউল-ভাটিয়াল মার্জিত ও ভদ্র। ভাষা তো ভদ্র বটেই; স্বরবর্ণের সুদীর্ঘ টান, উচ্চারণের পাড়াগেঁয়ে ভাব একেবারেই নেই। অর্থাৎ 'রুর‍্যালিজ্‌ম' বা গ্রামীণতার এখানে নিতান্ত অভাব। আমার যেন মনে হয়

যে এই মিশ্রণের সময়, প্রথমে রাগ ও পরে বাউল-ভাটিয়াল। কিন্তু তার পর হ'ল প্রথমে ভাটিয়াল-বাউল ও পরে রাগ এবং শেষে হ'ল নিছক বাউল-ভাটিয়াল। সময়ের দিক থেকে আগে-পরে ঠিক নয়,—বলা যায়, **notionally**।

এ তো গেল মোটামুটি ইতিহাসের কথা, ক্রনলজি নয়। এখন প্রশ্ন হবে—কি উপায়ে রাবীন্দ্রিক সুর এল, তাদের আঙ্গিক কি? কি ভাবে 'ধীরে বন্ধু ধীরে' (আশোয়ারী, টোড়ী, ভৈরবী), 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটির পথ', 'কৃষ্ণকলি তাই তোমারে বলি' ইত্যাদি বাউল-ভাটিয়াল নতুন ভাবে জন্মাল? গোটা কয়েক কারণ আছে। সুরের আলোচনায় অনির্বচনীয়, বাক্যের অতিরিক্ত বলা চলেনা। যেখানে অতিরিক্ত, সেটা আমাদের আপাততঃ বুদ্ধির অগম্য বলাই ভালো।

প্রথম কথাটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন। হিন্দুস্থানী (এবং বেশির ভাগ সময় কনকাঙ্গী) সঙ্গীতের রাগবস্তুটি অ-বিশেষ, 'অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট'। অর্থাৎ বহু বিশেষের গ.সা.গু. এবং ল.সা.গু.। অবশ্য প্লেটোর 'আইডিয়া'-প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। মোটামুটি বলা যায় যে বৈজ্ঞানিক ভাবে **chant** প্রভৃতি প্রাথমিক, বিশেষ গানগুলিকে সাধারণভাবে সমন্বিত করলে অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট রাগে পরিণত হয়। কিন্তু এইখানেই বিপদ। রাগে কোনও বিশেষ গান ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট রাগ। অর্থাৎ ইতিহাসের উৎপত্তি চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে যেন প্রথম থেকেই অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌শন। অবশ্য সেই রাগেরই কত পরিবর্তন হয়েছে, কত মতামত বদলেছে! আর সেটা যেন কোনও না কোনও বিশেষের তাগিদে। আজ পর্যন্ত মল্লারের অন্ততঃ সাত আটখানি রূপ শুনেছি যেমন, শুদ্ধ মল্লার, মিঞা-কি-মল্লার, হরিদাসী মল্লার, সুরদাসী মল্লার, সুরঠ মল্লার, গৌড় মল্লার, দেশ মল্লার, মেঘ মল্লার ইত্যাদি।

এতগুলি মল্লারের বিশেষ রূপ নিশ্চয়ই আছে, অন্ততঃ ছিল মনে হয়। কোনোটা মন্দাক্রান্তা ছন্দের ঝর-ঝর বারিপাত, কোনোটা এক রকমের বিরহ। কোনোটা আকাশভাঙ্গা বর্ষণ, কোনোটা বৃষ্টির পূর্বাভাসে মেঘ, কোনোটা বা গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি। এ ছাড়াও অন্য ধরনের বিরহ রয়েছে। সেইখানেই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথের বিরহ বহু রকমের; সেটি প্রতি বিষাদের সম্পত্তি এবং প্রত্যেকটা পৃথক, অর্থাৎ প্রতি রচনা হ'ল বিশেষ। রাগ যেন স্ত্রীকে সব গহনা, সব কাপড় জামা সাজিয়ে দেখান, কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রত্যেক স্ত্রী

নিজের-নিজের পোশাক-পরা। যদি তাই হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের ভৈরবী বহু রূপের ভৈরবী। রাগের ভৈরবী একই ভৈরবী। অবশ্য রাগের ভৈরবীতেও কিছু ইতর-বিশেষ আছে নিশ্চয়। তবে সেটা তালের, ছন্দের এবং কিছু বন্দেশীতে।

দ্বিতীয় কথা হ'ল স্বরের 'মূড' বা ভাব। এই 'মূড'টা যে কি, তা ঠিক সত্যি করে বলা শক্ত। প্রথম কথা ওঠে ভাষা এবং সেই ভাষা সঙ্গীতে মূর্ত হয়ে ওঠে। কবিতায় যদি 'মূড' ফুটে ওঠে, তবে সেই 'মূড' স্বরে বসতে চায়। হিন্দী উর্দু ভাষায় কিন্তু সব সময় স্বরে বসছেনা দেখেছি। যেমন বৃষ্টি হলেই মল্লার, দুঃখ হলেই কোমল নিখাদ, গম্ভীর হলেই কেদারা মালকোষ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের 'মূড' স্বর ও কবিতার দ্বৈত সম্বন্ধ, যেন ডিপ্‌থং। এখানে, ভালো ভালো স্থানে, একত্রে দুয়ের যোগাযোগ। রবীন্দ্রনাথ যেন একত্রে স্বর ও কথা প্রয়োগ করছেন,—প্রয়োগ কথাটা ঠিক উপযুক্ত নয়, স্বর ও কথা একত্রে জন্মাচ্ছে। তারই ফলে এল 'মূড'।

অবশ্য এ কথা সত্যি যে দুয়ের সংযোগ বিধান এক প্রকার অনির্বচনীয়, অব্যক্ত বস্তু। কিন্তু কখনও কখনও আরও একটি কথাও মনে হয়। এটা ঠিক যে দুই বস্তু, স্বর ও কবিতার মিশ্রণে এক হচ্ছে। কিন্তু এক মুহূর্তে ঠিক এক হচ্ছে না। প্রথমে হয় কবিতা না হয় স্বর। রবীন্দ্রনাথের বেলায়, অনেক ক্ষেত্রে, সামান্য কিছু আগে ও পরে। তাই যেন মনে হয়, ব্যাপারটা ক্যাটালিটিক এজেণ্ট-এর মতন। অর্থাৎ প্রথমে দুই, পরে মিশ্রণ;—যেটা আমরা বেশি জানিনা, তবু খানিকটা জানি, এবং সেই মিশ্রণের পরে এক। অর্থাৎ খানিক অংশে কবিতা, খানিক অংশে স্বর। কবিতা স্বরের আকার নিল, আবার স্বর কবিতার আকার নিল। কবিতায় যদি আংশিক ছন্দ জন্মায়, তবে নিশ্চয় তার অংশতঃ আঙ্গিক আছে। স্বরে যদি আংশিক ছন্দ থাকে, তবে তারও আংশিক ছন্দ থাকবেই।

কবিতায় খানিকটা তা হলে আসবে কথা,—কথার অক্ষর, কথা অক্ষর-অনুসারে সাজানো, তার স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাস, তার গতি ও ছন্দ। স্বরের বেলায়ও তাই। তারও পরে আসছে সঙ্গীত। দুয়ের মিলনে একটা সাঙ্গীতিক ভাব, 'মূড'। অনেকগুলি 'মূড' ঠিক জমে না, আবার অনেকগুলি জমে। 'ভুলতে দিতে' গানে প্রথমে বাউল, পরে ভৈরবী—দুটো যেন এক 'মূড' হয় নি। আবার বহু গানে 'মূড' খুব ভালো বসেছে।

এখন যদি বিশেষ 'মুড' বা ভাব জন্মায়, তখন সেখানে এক প্রকার চিত্র-সঙ্গতি আসে। 'মুড'-কে পৃথক করে দেখলে অর্থাৎ কবিতা ও স্বর ভিন্ন করলে, চিত্র ফুটে ওঠে। আবার কেবল কবিতা, কেবল স্বর থাকলেও তাই। (দুটোর মধ্যে তফাৎ করলে দুটো ভিন্ন চিত্র আসতে পারে, সন্দেহ হয়।) কবিতার কথা যদি ভুলে গিয়ে আ-আ করে স্বর গাই, তবে সেখানে গোটা কয়েক 'কার্ভ', বক্রগতি আসে এবং সেই স্বরের বক্রতায় ছবি মনে হয়।

স্বরের রাগরূপ অবশ্য ভোলা কঠিন। কিন্তু যদি তা হয়, তবে কবিতা কেবল চিত্রধর্মীই হবে। সে যাই হোক, বিশেষ সাঙ্গীতিক রূপে চিত্র জন্মায়। এই বিষয় নিয়ে আমি কিছু আলোচনা করেছি। চিত্র পেয়েছি, কিন্তু সেটি নিতান্ত রেখাগত, যদিও রেখাগত সাঙ্গীতিক রূপ থেকে চিত্রই বেশি পেয়েছি। এই নিয়ে পরীক্ষা করা উচিত। সোয়াইটজারের 'বাখ্' গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে তার ইঙ্গিত আছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নাটকত্বও এইভাবে দেখানো যায়। এমন কি সেখানে শুদ্ধ নাটকত্বও বোধ হয় পাওয়া যাবে।

আমার বক্তব্য নিতান্ত সোজা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের মিশ্রণ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে করাই ভালো। অর্থাৎ তার আঙ্গিকটা ভালো করে দেখা উচিত। তাকে অব্যক্ত বললেই চলেনা। সঙ্গীতের আঙ্গিকটাই সব; তার শেষে অব্যক্তটা দেখা যাবে। কাজটা করা শক্ত, কেননা সেখানে স্বর ও কবিতা জুড়ে রয়েছে। তারও পরে চিত্র নাটক ইত্যাদি। ব্যাপারটা হ'ল কার্বাঙ্কল-এর মতন। তার প্রতিফলন দুই, এমন কি হয়তো দুয়েরও বেশি।

# দর্শন

[ "বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয়—একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব—আমার সুখ-দুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আচরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শাস্ত্রে যা লেখে তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারিনে; কিন্তু সে-সমস্ত সত্য অনেকসময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব সেই আমার চরম সত্য।" —রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রসাহিত্যে দর্শন-প্রতীতির স্বরূপটি ঠিক যে কী, তা নিয়ে বহুতর অভিমত এযাবৎকাল পাওয়া গেছে। তার মধ্যে বেশ কিছু একদেশদর্শী মতামত থাকায় সাধারণ জিজ্ঞাসুর পক্ষে অনেকসময় জ্ঞানের আগ্রহ এক বিড়ম্বনা হ'য়ে দাঁড়ায়।

প্রচলিত অর্থে দর্শনশাস্ত্র যাকে বলা হয়, তার লক্ষ্য নিঃসন্দেহে কোনো একটি বিশেষ জিজ্ঞাসার মীমাংসা করা অথবা সেই জিজ্ঞাসার পরিণাম-সত্যে উপনীত হওয়া। এবং এই মীমাংসার পথটি হ'ল বুদ্ধি বা জ্ঞানগ্রাহ্য বিচার-বিশ্লেষণের পথ। শাস্ত্র হিসাবে দর্শনের ক্ষেত্রে অনুভূতি বা উপলব্ধিজাত সিদ্ধান্ত অচল। দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় যুক্তি ও তর্কের স্থান সবচেয়ে উপরে। কবির ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত। কবি যে-সত্যের প্রচার করেন তার প্রতিষ্ঠা অনুভূতি আর উপলব্ধির ভিত্তিভূমিতে। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের মধ্যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি যা-কিছু আছে, তার উৎসও তাঁর উপলব্ধি-কেন্দ্রিক মননশীলতার মধ্যে নিহিত। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-দর্শনের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ভাষ্যকার শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

"... দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি বা দার্শনিকের অনুসন্ধান-মার্গ কবির দৃষ্টিভঙ্গি বা অনুসন্ধান-মার্গ হতে বিভিন্ন। কবি কল্পনাপ্রবণ, কবির মনে অনুভূতির বিকাশের পূর্ণতম সুযোগ মেলে। কবির আবেগ, কবির কল্পনা, কবির অনুভূতি, কবির ভাল লাগা না লাগা, এ সবই তাঁর মত কোন্ ধরনের হবে তা নির্ধারণ করে দেয়। যুক্তিতর্ক সেখানে মুখ্য জিনিস নয়, গৌণ জিনিসও নয়, তা সেখানে সম্পূর্ণ নির্বাসিত। আমার এই মতকে ভাল লাগে, এই মত মনকে আমার আনন্দ দেয়, অতএব তার গলায়ই আমি বরমাল্য দেব। কবির যদি যুক্তি কিছু থাকে তা অনেকটা এই ধরনের। কবির মার্গ অনুভূতি, দার্শনিকের মার্গ যুক্তি।

ঠিক সেই কারণে তাঁর মনে কবি-ভাবের প্রাধান্য হেতু, আমরা দেখব যে তিনি দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্জন করে কবির দৃষ্টিভঙ্গিকে বরণ করেছেন। ... তিনি বিচারমার্গকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অনুভূতিকেই সত্যের একমাত্র মানদণ্ড বলে গ্রহণ করেছেন।"

রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশিষ্ট দর্শনশাস্ত্র রচনা করেননি। সুদীর্ঘ জীবনের যাত্রাপথে তাঁর উপলব্ধিতে যা সত্য-স্বরূপ হয়ে ধরা দিয়েছে, তাকেই তিনি রচনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। কাব্যের ক্ষেত্রে যেমন তাঁর মানস-বিবর্তনের একটি সুনির্দিষ্ট ধারা আছে, দার্শনিক উপলব্ধির ক্ষেত্রেও তেমনি একটি স্বচ্ছ ক্রম-পরিণতির ইতিহাস আছে। সে উপলব্ধির রাজ্যে আনন্দচেতনা, সৌন্দর্যবোধ, বিশ্বলীলা-রহস্য, গতিবাদ প্রভৃতি ভাবগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত। নানা খণ্ড উপলব্ধির সমন্বয়ে পরিণত এক অখণ্ড জীবন-সত্য। দর্শনমার্গের কঠিন যুক্তি-তর্কের জালে পড়ে কবির অনুভূতিজাত সে 'দার্শনিক সত্য' হয়তো বা ভ্রান্তও প্রমাণিত হতে পারে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু কবির অনুভূতির রাজ্যে যেখানে চিত্ত চিরকালের রাজা সেখানে ওই উপলব্ধির সত্যটুকু অবশ্যই চরম সত্য। জ্ঞানমার্গী দার্শনিকের কূট যুক্তিজাল মনের একান্ত-করে-অনুভব-করা সেই সত্যকে কখনো অসত্য বলে প্রমাণ করতে পারে না। কারণ তার সে-রাজ্যে প্রবেশাধিকার নেই।

রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্তর্নিহিত সেই সত্য বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এই কারণেই দর্শন-প্রতীতি বলে অভিহিত করা হল। উপনিষদ, সুফীদর্শন বা অন্য যে-কোনো বিশেষ দর্শনতত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রদর্শনের সমধর্মিতা কিম্বা সাদৃশ্যের আলোচনাকালে কবির অনুভূতিজগতের মৌল বৈশিষ্ট্য অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও, এ দুটি ঠিক এক বস্তু নয়। 'ধর্ম' শব্দটির অসংখ্য ব্যাখ্যা আছে। সে কূট বিচার-বিশ্লেষণের অবতারণা না ক'রে, ধর্মের প্রচলিত অর্থটিকেই এখানে গ্রহণ করা হচ্ছে। ধর্ম হ'ল চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ ও পূর্ণতালাভের উদ্দেশ্যে আচরণীয় আধ্যাত্মিক বিষয়। বলা বাহুল্য, তার ভিত্তিটা প্রায় পুরোপুরি বিশ্বাসের উপর। দর্শন তা থেকে স্বতন্ত্র। দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য, এ বিশ্বপ্রকৃতির মূল অনুসন্ধান। উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে বিজ্ঞানের, বিশেষত পদার্থবিদ্যার ( যদিও পদার্থবিদ্যা এই শব্দটি উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ দ্যোতক নয় ) সঙ্গে দর্শনের সাদৃশ্য বেশী। কিন্তু দু'য়ের পথ ভিন্ন। দর্শনের যাত্রা 'সাব্‌জেক্ট' বা মন থেকে 'অব্‌জেক্ট' বা বস্তুপুঞ্জের দিকে, আর পদার্থবিদ্যার যাত্রাপথ অব্‌জেক্ট থেকে সুরু ক'রে সাব্‌জেক্টের দিকে। দর্শনের সহায় যুক্তি ও তর্ক, পদার্থবিদ্যার সহায় পরীক্ষা-প্রমাণিত তথ্য বা সত্য। কিন্তু অতি প্রাচীনকাল থেকেই দর্শন ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে। যার ফলে ধর্ম ও দর্শনকে আমরা পৃথকভাবে গ্রহণ করতে শিখিনি। এর মূলে আছে ঈশ্বরতত্ত্ব। প্রাচীন ভাববাদী দর্শন যে মুহূর্তে ঐশ্বরিক-অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছে, সেই মুহূর্তেই দর্শন ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। দার্শনিক চিন্তাধারার বিবর্তন যতই ঘটুক না কেন, আচরণগত ধর্ম কখনো তার সঙ্গছাড়া হয়নি। সারা পৃথিবীতে দুটি-একটি ধর্মমতের কথা বাদ দিলে, আর প্রায় সব ধর্মমতেরই উৎস একটি ক'রে দর্শন। উপনিষদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পরিণামে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বর-কেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাস। বৌদ্ধদর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। বৌদ্ধধর্মমতও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কপিলের মতো 'ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ' এই ঘোষণা সামনে রেখে। দর্শনের সঙ্গে ধর্মমতের এই পারস্পরিক সম্পর্ক সভ্যতার আদিযুগ থেকেই স্থাপিত হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রদর্শনের উপর ধর্মের প্রভাব সবচেয়ে বেশী, এ কথা কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন। এবং সে ধর্ম উপনিষদের ধর্ম—আনন্দস্বরূপ শান্ত শিব ও অদ্বৈতচেতনা যার মূলের কথা। 'ধর্ম', 'মানুষের ধর্ম', শান্তিনিকেতন' ইত্যাদি গ্রন্থে তার অজস্র প্রমাণ আছে, তাতে সন্দেহ নেই। বিশ্বরহস্যের মর্মস্থলে আনন্দস্বরূপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন,

> "আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। তাঁহার আনন্দরূপ অমৃতরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে আনন্দিত, তিনি যে রসস্বরূপ, ইহাই আমাদের নিকট প্রকাশমান।

কোথায় প্রকাশমান, এ প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? যাহা অপ্রকাশিত তাহার সম্বন্ধেই প্রশ্ন চলিতে পারে, কিন্তু যাহা প্রকাশিত তাহাকে 'কোথায়' বলিয়া কে সন্ধান করিয়া বেড়ায়?

প্রকাশ কোন্‌খানে? এই-যে চারিদিকে যাহা দেখিতেছি তাহাই যে প্রকাশ। এই-যে সম্মুখে, এই-যে পার্শ্বে, এই-যে অধোতে, এই-যে ঊর্ধ্বে—এই-যে কিছুই গুপ্ত নাই। এ-যে সমস্তই সুস্পষ্ট। এ-যে আমার ইন্দ্রিয়মনকে অহোরাত্রি অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ
স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ

এই তো প্রকাশ্, এ ছাড়া আর প্রকাশ কোথায়?"

এই সর্বব্যাপী আনন্দস্বরূপকে রবীন্দ্রনাথ যখন অনুভব করেছেন, তখন তিনি দর্শন-বেত্তা তাতে সন্দেহ নেই। ঈশ্বরের সর্বময় অস্তিত্বের উপলব্ধিতে তাঁর চিত্ত যখন বিভোর, তখন তিনি অবশ্যই দার্শনিক। কিন্তু সে দর্শন ধর্মবোধ-নিরপেক্ষ নয়। আবার এই আনন্দরূপই কখনো কখনো কবির অনুভূতিতে এক প্রলয়ংকর মূর্তি নিয়ে ধরা দিয়েছে।

"আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর, তাহার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া দেখা দেয়। ··· তখন কত সুখমিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়। ··· হায় শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বামপদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ··· পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্‌ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ নৃত্য করো। ···"

বিশ্বরহস্যের মধ্যে একদিকে এই পরিপূর্ণ আনন্দরূপের উপলব্ধি, অন্যদিকে রুদ্রের এই প্রচণ্ডতায় আত্মহারা অনুভূতি দুই-ই কবির মানসরাজ্যে সত্য। এর পশ্চাতে দার্শনিক যুক্তি খুঁজতে গেলে, ভুল হবে। এ কেবলই অনুভূতির প্রকাশ। বিপরীতধর্মী শান্ত ও রুদ্রের সমন্বয়ের নিদর্শন রবীন্দ্র-কাব্যে এবং প্রবন্ধসাহিত্যে অজস্র মিলবে। একে উপলব্ধির পরিবর্তে তত্ত্বপ্রচার বলতে গেলে ভুল করা হবে ব'লেই মনে হয়। তিনি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,

"আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তো তবে সে হচ্ছে

এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ-উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আর-এক দিকে অদ্বৈত ; একদিকে বিচ্ছেদ, আর-এক দিকে মিলন ; একদিকে বন্ধন, আর-এক দিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে ; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, ... যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে। ..."

দ্বৈত অদ্বৈত, আনন্দ ও দুঃখ, শিব ও রুদ্রের এই সমন্বিত উপলব্ধিই রবীন্দ্র-দর্শন-প্রতীতির মর্মকথা। কাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধসাহিত্যে রবীন্দ্রদর্শনের অদ্বৈতবাদ এই অনুভূতির নিয়মেই চলেছে। জাগতিক জীবনের মধ্যে তাঁর সৌন্দর্যপিপাসা এই অনুভূতির সাহায্যেই মিটেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ কাব্য-পরিধির বাইরে যখন চলমান জীবনস্রোতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন, সেখানেও এই উপলব্ধির প্রকাশ। রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজচিন্তা প্রভৃতির মধ্যেও রবীন্দ্রমানসের সেই একই পরিচয়। তবে এ-কথাও মনে রাখতে হবে—অনুভূতিজাত এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে একেবারে ছকে ফেলে, সংজ্ঞা দিয়ে তার জাতি-গোত্র নির্ণয় করে দেওয়া সম্ভব নয়। কবির আর একটি উক্তি—

"আমার ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে পারিনে—অনুশাসন-আকারে তত্ত্ব-আকারে কোনো পুঁথিতে-লেখা ধর্ম সে তো নয়। সেই ধর্মকে জীবনের মর্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উদ্‌ঘাটিত করে স্থির করে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু অলস শান্তি ও সৌন্দর্যরসসম্ভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ-কথা নিশ্চয় জানি।"

রবীন্দ্র-দর্শন প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিক বের্গসঁর দর্শনের 'elan vital' বা 'vital impulse' অভিধেয় প্রাণশক্তিবেগের কথা কোনো কোনো ভাষ্যকার তুলেছেন। বিশেষ করে কবির বলাকা কাব্যের 'গতিবাদ' প্রসঙ্গেই এই আলোচনার সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ ও বের্গসঁ উভয়েরই দার্শনিক প্রতীতিতে বিশ্বপ্রকৃতির ঐক্যের মধ্যে বহুবৈচিত্র্য ও গতিময়তা অথবা বিপরীতপক্ষে বহুবৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রকাশ বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বের্গসঁর 'vital impulse' এবং 'বলাকা'র 'গতিবাদ'-এর বহিরঙ্গে সাদৃশ্য যথেষ্ট থাকলেও, পরিণতিতে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

কবি তাঁর প্রেমের দৃষ্টিতে এই জগৎকে দেখেছেন। জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, নদনদী,

পাহাড়পর্বত সব-কিছুকে নিয়ে যে জীবন, যে বিশ্বপ্রকৃতি তারই অন্তরের বাণীটি তিনি শোনবার চেষ্টা করেছেন কান পেতে। মর্ত্যভূমির আনন্দবেদনা, সুখদুঃখ তাঁর উপলব্ধির রাজ্যে নতুন নতুন রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের দর্শন ততখানি তত্ত্ব নয়, যতখানি জীবন-সত্যের প্রকাশ। তত্ত্বকে তিনি এড়াতে পারেননি, কিন্তু তাই ব'লে তত্ত্বসর্বস্ব হতেও চাননি কোনোদিন। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থখানিকে রবীন্দ্র-দর্শনের সারসংকলন বলা যেতে পারে। সে-গ্রন্থেও তিনি বলেছেন,

> "বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্র-তারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি *Religion of Man* বক্তৃতাগুলিতে। সেগুলিকে দর্শনের কোঠায় ফেললে ভুল হবে। তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েছে, কিন্তু বস্তুত সে কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা। এই আন্তরিক অভিজ্ঞতা অনেককাল থেকে ভিতরে ভিতরে আমার মধ্যে প্রবাহিত ; তাকে আমার ব্যক্তিগত চিত্তপ্রকৃতির একটা বিশেষত্ব বললে তাই আমাকে মেনে নিতে হবে।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যের দার্শনিক বিষয়গুলিকে দর্শনশাস্ত্রের ছকবাঁধা রীতির ছাঁচে না ফেলে, কবির জীবনদর্শনের অনুভূতি-পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, সে-বিচার ভ্রান্ত বা একদেশদর্শী হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।

কবির আর একটি মন্তব্য দিয়েই আলোচনা শেষ করা যাক। একজায়গায় তিনি বলেছেন,

> "আমি আমার তত্ত্বকে তেমন করে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখিনি। সেই তত্ত্বটি গড়ে উঠতে উঠতে বেড়ে চলতে চলতে নানা রচনায় নিজের যে-সমস্ত চিহ্ন রেখে গেছে সেইগুলিই হচ্ছে তার পরিচয়ের উপকরণ। এমন অবস্থায় মুশকিল এই যে, এই উপকরণগুলিকে সমগ্র করে তোলবার সময় কে কোন্‌গুলিকে মুড়োর দিকে বা ল্যাজার দিকে কেমন করে সাজাবেন সে তাঁর নিজের সংস্কারের উপর নির্ভর করে।"

নিজের নিজের সংস্কারের দ্বারা যেন আমরা সমগ্রের বিচারকে খণ্ড বা বিক্ষিপ্ত না করে তুলি।]

# "মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে"

## হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্তার স্বরূপ কি? এটি দর্শনের একটি মূল প্রশ্ন। রবীন্দ্রদর্শনে এই প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে। ফলে যে উত্তরটি আত্মপ্রকাশ করেছে তার একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তথা দর্শন পরিবর্তনশীল। তা বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়ে বিকাশ লাভ ক'রে অবশেষে সমগ্র রূপটি ধারণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের দর্শনে বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্তা সম্বন্ধে যে চিত্রটি তাঁর সাহিত্যের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছে তার ইতিহাস এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সে ইতিহাসটি বড় বিচিত্র। যে প্রকৃতির আকর্ষণ তাঁর বাল্যজীবনে নীরস বর্ণমালা-চর্চায় আনন্দ জুগিয়েছিল, সেই প্রকৃতিই এখানে প্রথম পথ নির্দেশ ক'রে দিয়েছিল। প্রকৃতির মধ্যে নানা শক্তির, নানা সৌন্দর্যের আবির্ভাব তাঁর মনকে এই পথে টেনে নিয়ে গেছে, যেমন বৈদিক যুগের ঋষির মন আকৃষ্ট হয়েছিল পরম সত্তার সন্ধানে এই একই পথে। তাঁর সাহিত্যের বিকাশ যে এই পথেই ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে স্বয়ং অবহিত। নিজের রচনাতেই তিনি সে কথার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন :

"এই দিনগুলির কথা যখন স্মরণ করি, আমার মনে হয় অজানিত ভাবে আমার বৈদিক পূর্বপুরুষের নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করেছি এবং আমার প্রেরণা এসেছে গ্রীষ্মের আকাশে অঙ্কিত এক অতিদূরের সত্তার সঙ্কেত হতে।"

[ 'মানুষের ধর্ম' ]

বৈদিক যুগের ঋষি পরম সত্তার অনুসন্ধান করেছিলেন প্রকৃতির বক্ষে। প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি সৌন্দর্যগুণে হক, বীর্যে হক যখন তাঁর মনকে মুগ্ধ করেছে, তখনই তাঁকে দেবতা বলে স্বীকার ক'রে তাঁর জন্য তিনি প্রশস্তি রচনা করেছেন। এই ভাবে অগ্নি, বায়ু, দ্যৌ দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রভাতের আকাশের রাঙিমার মধ্যে ঋষি উষাকে আবিষ্কার ক'রে তাঁর জন্যও প্রশস্তি রচনা করেছেন। পরিণত অবস্থায় বেদের যুগে একটি নূতন লক্ষণ দেখা গেল। বহু দেবতার মধ্যে এক অতিদেবতার সন্ধানে বৈদিক ঋষির মন আকৃষ্ট হল। এই অনুসন্ধানের ফলে, প্রকৃতির বক্ষে বিকশিত নানা শক্তির মধ্যে একটি একত্বের সূত্র আবিষ্কার হল। কোনো কোনো বিশেষ শক্তির মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হল যা তাঁর অধিষ্ঠিত দেবতাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ক'রে তোলে। আকাশের অধিষ্ঠাতৃ শক্তি ইন্দ্র এমন একটি বিশিষ্ট দেবতা। সর্বশেষে এমন কয়েকটি গুণ একটি বিশেষ দেবতার মধ্যে আবিষ্কৃত হল, যা সত্যই তাঁকে বিশিষ্ট দেবতার আসনে অধিকার দেয়। তিনি হলেন জলের দেবতা বরুণ। তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন। তাই তিনি 'ধৃতব্রত'। তিনি ধর্ম সংরক্ষণ করেন। তাই তাঁর আর এক নাম হল 'ধর্মস্য গোপ্তা'। এই ভাবে বহু দেবের মধ্য হতে একটি বিশিষ্ট দেবতা আবিষ্কৃত হলেন। তার পরে সমগ্র প্রকৃতি জুড়ে যে একটি মাত্র শক্তির লীলা চলেছে, এই উপলব্ধির পথ সহজ হয়ে গেল। তাই দেখা যায় ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে প্রশস্তি রচনা হয়েছে এমন এক বিরাট পুরুষের উদ্দেশ্যে যিনি 'ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা ত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্'। প্রকৃতির সকল দেবতা, সকল শক্তিকে জড়িয়ে নিয়ে তিনি বিরাজমান, বিশ্ব জুড়ে তাঁর অবস্থিতি। এই ভাবে প্রকৃতির বক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেবতার উপলব্ধি হতে বৈদিক ঋষির মনে এক সর্বব্যাপী একক সত্তার উপলব্ধি অধিষ্ঠান নিয়েছিল।

রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাসেও একটি অনুরূপ তত্ত্বের ক্রমবিকাশের সন্ধান আমরা পাই। প্রকৃতির বক্ষে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে সৌন্দর্যের সমাবেশ তাঁর মনকে আকৃষ্ট করেছিল। তাদের প্রশস্তি রচনা ক'রে বিশ্লিষ্ট ভাবে তাদের তিনি বরমাল্য অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাদের বিভিন্নতাকে খণ্ডন করে, এমন এক ব্যাপক সত্তার সংযোগসূত্র তিনি আবিষ্কার করলেন। এই নূতন উপলব্ধি সুস্পষ্ট আকারে আত্মপ্রকাশ করবার পূর্বে ও, বিভিন্নক্ষেত্রে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের বর্ণনায় এক অন্তর্নিহিত সত্তার

ইঙ্গিতও তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। বহুবিশ্লিষ্ট সৌন্দর্যের বিকাশের মধ্যে যেন একই অন্তর্নিহিত শক্তির হস্তের সংস্পর্শ রয়ে গিয়েছে। তার দু'একটি উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

তাঁর শারদোৎসবের গানগুলির সহিত আমরা পরিচিত। তাদের মধ্যে এই গানটির সহিত আমরা বিশেষভাবে পরিচিত ঃ

"আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা ?" [ 'শারদোৎসব' ]

প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের সমাবেশের মধ্যে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন কে যে সাদা মেঘের ভেলা ভাসালেন তাঁকে খুঁজছে।

সেই শক্তির লীলা তিনি প্রকৃতির বাহিরে অগণিত গ্রহনক্ষত্রখচিত আকাশের মধ্যেও আবিষ্কার করেছেন ঃ

"এই তো তোমার আলোকধেনু
সূর্য তারা দলে দলে
কোথায় বসে বাজাও বেণু,
চরাও মহা গগনতলে।" [ 'সঞ্চয়িতা' ]

অবশেষে তিনি বৈদিক যুগের ঋষির মতোই একদিন এই উপলব্ধি লাভ করলেন যে প্রকৃতি এবং বিশ্ব, সব কিছু জড়িয়ে এক ব্যাপক সত্তা বিরাজমান। এই উপলব্ধি তাঁর কাব্যে রূপ নিয়েছে নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে। একটি উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 'মদনভস্মের পর' কবিতায় তিনি আকাশ ও তৃণে, সূর্যালোক ও চন্দ্রকিরণে, এমনকি পুষ্পের সুবাসে একই সর্বব্যাপী সত্তার অবস্থিতি অনুভব করেছেন ঃ

"বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত
নয়ন কার নীরব নীল গগনে।
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে।
পরশ কার পুষ্পবাসে পরাণ মন উল্লসি
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে।" [ 'কল্পনা' ]

এই ভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশ্বের রূপ সম্বন্ধে ধারণাটি পরিস্ফুট রূপ গ্রহণ করল। প্রকৃতির বিচিত্র লীলার মধ্যে যে অপ্রকট শক্তির পরিচয় আভাসে পাওয়া গিয়েছিল, তা সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিরাজমান এক বিরাট সত্তার রূপ নিল। সেই সত্তা সব কিছুকে জড়িয়ে নিয়ে আছেন। প্রকৃতি আকাশ বিশ্ব সবই তাঁর লীলাক্ষেত্র। বিশেষ একস্থানে বিচ্ছিন্নরূপে প্রকাশ তাঁর কোথাও নাই। সব কিছু জড়িয়ে, সব কিছু নিয়ে তাঁর অবস্থিতি, সবার মাঝেই তাঁর প্রকাশ। স্বতন্ত্র প্রকাশ তাঁর নাই। বিশ্বের মধ্যেই অপ্রকটভাবে তিনি বিরাজমান।

এই সর্বব্যাপী সত্তার রূপটি কেমন তা নিজের ভাষাতেই এক জায়গায় তিনি গুছিয়ে বলেছেন ঃ

"দেবতা দূরে নাই, গির্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, মিলন-বিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁর চিরন্তন মন্দির। এই সজীব সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোনো কালে নূতন নহে, কোনো কালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্তমান ; অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না, কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্য সত্য প্রকাশ পাইতেছেন।" [ রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড ঃ 'ভারতবর্ষ' ]

এই পরম সত্তা জীবন-মরণকে ব্যাপ্ত ক'রে, সমগ্র বিশ্বকে জুড়ে অপ্রকটরূপে বিরাজমান। তাঁর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি বহুবিচিত্র, তবু তিনি এক। তিনি চিরন্তন, অথচ চিরচঞ্চল। তিনি নিত্য পরিবর্তনশীল অথচ তাঁর একত্ব বিনষ্ট হয় না। তাঁর বিভিন্ন কবিতায় এই বৈশিষ্ট্যগুলি অপরূপ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল চরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী।" [ 'চিত্রা' ]

এই বিরাট সত্তার সমগ্র বিশ্ব জুড়ে অবস্থিতি, ভূলোক এবং দ্যুলোক, দুই লোকই তাঁর বিলাসক্ষেত্র। তিনি চঞ্চল, তিনি বহুবিচিত্র, তবু তিনি এক। এই চিরন্তন সত্তার কেন এই চঞ্চলতা, কেন এই বিচিত্র বেশে বার বার রূপ-পরিবর্তন ?

তার উত্তর তিনি দিয়েছেন। ভাঙা ও গড়ার খেলায় এই পরম শক্তির তীব্র আকর্ষণ। সৃষ্টির শৃঙ্খল রচনা ক'রে তাতে আপনি স্বেচ্ছায় তিনি বদ্ধ হন, আবার তার বিলোপ সাধন ক'রে আপনাকে তিনি মুক্তি দেন। তখন তিনি 'শিশু ভোলানাথ'। তাঁর তাণ্ডবে সমগ্র সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। তিনি হেলাভরে আপন বিভব আপনি নষ্ট করেন। তিনি দস্যুর মতো সব ভেঙে-চুরে দেন। প্রাচীন সঞ্চিত ধনে তাঁর উদ্ধত অবহেলা।

কিন্তু কেন সঞ্চিত ধনে এই অবহেলা? কেন হেলাভরে আপন বিভব তিনি নষ্ট করেন? তার কারণ, তিনি অনন্ত শক্তিমান, তিনি অক্ষয় ভাণ্ডারের অধিকারী। তাঁর সেই ক্ষমতা আছে যা মূল্যহীনকে সোনায় পরিণত করতে পারে। তাঁর ভাণ্ডার চিরকালই পরিপূর্ণ। আত্মশক্তিতে এই অটল বিশ্বাস নিয়েই তিনি প্রাচীনকে ভাঙেন তাকে নূতন ক'রে গড়তে—

"বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার
সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মতো ভেঙে-চুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশপাথর রয়েছে তাহার,
তাইত প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা।" [ 'মহুয়া' ]

সেই কারণেই তিনি শীতের শেষে গাছের জীর্ণ পাতা ঝরিয়ে দেন। আবার বসন্তে তাকে নূতন মঞ্জরী ও পুষ্প দিয়ে ভূষিত করেন। তখন নগ্ন শিমুলকে তাঁরই ভাণ্ডার রক্তদুকূল উপহার দেয়। তাই কবি সেই পরম শক্তিকে 'নিত্যকালের মায়াবী' বলে অভিহিত করেছেন।

এই 'নিত্যকালের মায়াবী' তাঁর রচনায় অন্যত্র 'নটরাজ' বেশে আবির্ভাব হয়েছেন। এই নটরাজ লীলাভরে নৃত্য করেন। সেই নৃত্যের তাল রাখে

দুটি বিপরীত বৃত্তি। একই শ্লোকের দুটি পদের মতো তারা। ভাঙা ও গড়া, জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ সেই নৃত্যের তাল, সেই শ্লোকের পদ। তারা নটরাজের নৃত্যের পদক্ষেপ। সেই পদক্ষেপের ধ্বনি কবির চিত্তে ধরা পড়েছে। তিনি অনুভব করেছেন,

"মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।

* * *

হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে
কাঁপে ছন্দ ভালো মন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।"

[ 'অরূপরতন' ]

নটরাজের নৃত্যের ছন্দে যে আনন্দ উদ্বেল হয়ে ওঠে তার উন্মাদনা প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। তখন ছয় ঋতু তাঁর নৃত্যের সঙ্গী হয়ে সেই নৃত্যে যোগ দেয়। তাদের নৃত্যের মধ্যে যে ছন্দ রূপ নেয় তারও ভাঙা ও গড়া হল উপাদান। নীরস বিবাগী গ্রীষ্মের পরে আসে সরস বর্ষা। তার পর আসে অরুণ-আলোর অঞ্জলি-ভরা শরৎ। পশ্চাতে আসেন কুয়াসার অবগুণ্ঠনে বদন ঢেকে হেমন্ত লক্ষ্মী। এক পর্ব ভাঙার পরে গড়া এইখানে শেষ। তার পর আসে শীত মার্জনাহীন হস্তে জীর্ণ পুরাতনের আবর্জনাকে সরিয়ে দিতে। শেষে আসে বসন্ত তার নানা রঙের ডালি নিয়ে। তার ফলে সমগ্র ধরণীর বক্ষ জুড়ে বর্ণ, গীত ও গন্ধের প্লাবন বয়ে যায়।

"সেই আনন্দ চরণ পাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে
প্লাবন বহে যার ধরাতে
বরণ গীতে গন্ধে রে।"

[ 'গীতাঞ্জলি' ]

এক দিকে পরম সত্তা যেমন এই ভাবে বহুবিচিত্র, অপর দিকে তিনি সেইরূপ নিত্য চঞ্চল ও গতিশীল। তাই মহুয়ার 'নিত্যকালের মায়াবী' ও অরূপরতন ও ঋতুরঙ্গশালার 'নটরাজ' বলাকায় 'চঞ্চলা' নদীর রূপ গ্রহণ করেছে। সত্তার

নিত্য গতিশীলতাকে এখানে একটি প্রবাহিণী নদীর সহিত কবি তুলনা করেছেন। নদীর একটি স্থায়ী রূপ আছে, কিন্তু যে অসংখ্য জলকণার সমষ্টি নিয়ে তার রূপ, তা নিত্য গতিশীল, নিত্য চঞ্চল। তাদের পরস্পরের সংঘাতে কত তরঙ্গ মথিত হয়ে ওঠে, কত আবর্ত সৃষ্টি হয়, কত বুদ্‌বুদ ভেসে ওঠে। আবার সেই নদীর বক্ষেই তারা বিলীন হয়ে যায়।

বিশ্বের আপাত দৃষ্টিতে যে স্থির রূপ চোখে পড়ে তার মধ্যেওঅনন্ত প্রবাহের ধারা চলেছে। এই প্রবাহের মধ্যে যে তরঙ্গ-বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তার সংঘাতেই বস্তুময় সত্তার উদ্ভব। সেই বিক্ষোভে যে আবর্ত সৃষ্টি হয়, তারই মধ্যে জন্মলাভ করে গ্রহনক্ষত্রের পুঞ্জ, বুদ্‌বুদের মতো।

"হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে ;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেণা উঠে জেগে,
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে ;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য চন্দ্র তারা যত
বুদ্‌বুদের মতো।" [ 'বলাকা' ]

এই বিরামহীন গতি শুধু অভিসারিকার খেয়াল নয়, বা পথের আনন্দবেগে পথ চলার নেশাও নয়, এই গতির এক তাৎপর্য আছে। সঞ্চয়ের বন্ধন আছে, পুরাতনের মলিনতা আছে, অতীতের আবর্জনা আছে। সৃষ্টিপ্রবাহকে তা হতে মুক্ত রাখতে অবিরাম গতির প্রয়োজন আছে। প্রাচীনকে ধ্বংস ক'রে নূতনের বিকাশের পথকে সুগম করবার প্রয়োজন আছে। মৃত্যুই জীবনকে কলুষমুক্ত ক'রে নূতন প্রাণে অধিষ্ঠিত করতে পারে। সেই কারণেই বিরাট চঞ্চল সত্তা কেবল নিত্য গতিশীল নয়, নিত্য পরিবর্তনশীলও বটে। চঞ্চলা নদী তাই কবির

নয়নে একই কবিতায় চঞ্চলা নটীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর নৃত্যপ্রবাহই যেন মন্দাকিনীধারার ন্যায় সমগ্র বিশ্বকে মৃত্যুস্নানে কলুষমুক্ত ক'রে নূতন প্রাণে উদ্ভাসিত করছে।

"ওগো নটী চঞ্চলা অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি' ঝরি'
তুলিতেছে শুচি করি'
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।"
[ 'বলাকা' ]

এই ভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশ্বের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে অপ্রকাশ সত্তা বিরাজমান তা অভিব্যক্তি পেয়েছে। কোথাও তা কবির নয়নে প্রকাশ নিয়েছে 'ভোলানাথ'রূপে, যিনি আপন বিভব হেলাভরে আপনি নষ্ট করেন। কোথাও তা প্রকাশ নিয়েছে 'নিত্যকালের মায়াবী'-রূপে, যিনি নব বরবেশে প্রকৃতিকে নূতন ক'রে জয় ক'রে নিতে চান। কোথাও তা রূপ নিয়েছে নৃত্যপরায়ণ 'নটরাজের' বেশে, যাঁর নৃত্যের উন্মাদনার সংস্পর্শ ধরণীর বক্ষে বর্ণ গীত ও গন্ধে বিচিত্রিত ঋতুর প্লাবন এনে দেয়। কোথাও তার তীব্র বিরামহীন গতি তাকে কবির নয়নে প্রতিভাত করে চঞ্চলা তরঙ্গিণী রূপে, যার আবর্তে গ্রহনক্ষত্র বুদ্‌বুদের মতো ভেসে ওঠে। সবগুলি দিক মিলিয়ে বিশ্বের রূপের তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ ক'রে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তা হল তার বহুবিচিত্র রূপে প্রকাশ, তার নিত্য পরিবর্তনশীলতা এবং সর্বোপরি বৈচিত্র্য ও চাঞ্চল্য সত্ত্বেও একটি সর্বব্যাপী একত্বের অভিব্যক্তি। এই হল রবীন্দ্রদর্শনে বিশ্বের রূপ, যার সৃষ্টিপ্রবাহের ছন্দ নিত্য তাঁর চিত্তে প্রতিধ্বনিত হয়।

এই একত্বের মধ্যে বৈচিত্র্য ও নিত্যগতিশীলতা বের্গসঁর দর্শনের গতিশীলতার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনকি কোনো কোনো সমালোচক এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উভয়ের দর্শনকে পরস্পরের সহিত তুলনীয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বাস্তবিক আপাতদৃষ্টিতে বের্গসঁ-দর্শনের মূল তত্ত্ব 'elan vital' বা 'প্রাণশক্তির প্রেরণা' একটি অবিরামগতি স্রোতস্বিনীর সহিত সাদৃশ্য রাখে। এই প্রেরণাও প্রাণের অভিব্যক্তির পথে নিত্য চঞ্চল এবং নিত্য গতিশীল। কিন্তু তাদের এই সাদৃশ্য বাহিরের, অন্তরের নয়। তা গৌণ বিষয় সম্পর্কিত, মুখ্য বিষয়

সম্পর্কিত নয়। বিশ্বের রূপ সম্বন্ধে উভয়ের ধারণা বেশ স্বতন্ত্র। এই দুই দর্শনের পার্থক্য ভালোরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে বের্গসঁর দর্শনে বিশ্বের রূপ কেমনটি চিত্রিত হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বের্গসঁ-দর্শনে আমরা দুটি বিভিন্নধর্মী সত্তার সমাবেশ পাই। তাদের একটি সক্রিয় ও অপরটি অক্রিয়। যেটি অক্রিয় সত্তা তা সক্রিয় সত্তাটির খানিকটা অনুকূল এবং খানিকটা প্রতিকূল। এই সক্রিয় সত্তাটি এই আংশিক অনুকূল সত্তাটিকে নিজের ব্যবহারে লাগিয়ে আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত ক'রে নেয়। তিনি এই সক্রিয় সত্তাটির নাম দিয়েছেন 'elan vital'। আমরা তাকে জৈব সত্তা বলতে পারি। অক্রিয় সত্তাটি হল জড় বস্তু। এই জৈব সত্তা জড় বস্তুকে আত্মবিকাশের বাহনরূপে ব্যবহার ক'রে বিশ্বে প্রাণধারার বিস্তার ঘটায়। জড় ও প্রাণ খানিকটা বিভিন্ন ধর্মী। জড় সক্রিয় নয়, জড়ে স্মরণশক্তি নাই এবং জড়ের মধ্যে বহুকে একত্বের সূত্রে গ্রথিত করবার সামর্থ্য নাই। অপরপক্ষে প্রাণশক্তি বা চেতনাশক্তি স্বভাবতই মুক্ত এবং সক্রিয়। তার স্মরণশক্তি আছে। তার আত্মবিস্তারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাকে বিকাশের পথে নিত্য গতিশীল ক'রে তোলে। এই চৈতন্যশক্তি নিত্য গতিশীল এবং পরিবর্ত্তনশীল হলেও তার স্মরণ-শক্তি অতীতকে কৃপণের সঞ্চয়ের মতো সঙ্গে গুটিয়ে নিয়ে চলে। ভবিষ্যতে যা নূতন সৃষ্টি করবে তাকেও তার স্মৃতির পটে অঙ্কিত ক'রে রাখবে নিজের স্বভাব-গুণেই। এই বিষয় প্রাণশক্তি বা চৈতন্যশক্তি ক্রমশ পরিবর্ধমান চলন্ত বরফের বলের সঙ্গে বা পাকানো সুতার পিণ্ডের সঙ্গে তুলনীয়। যত তারা পাক খাবে ততই তারা আকারে বড় হয়ে উঠবে।

এই দুই বিপরীতধর্মী সত্তার সংযোগেই বিশ্বের রূপটি ফুটে ওঠে। তাদের মধ্যে প্রাণশক্তি সক্রিয় এবং জড় অক্রিয়। তবু জড়ের মধ্যে যেটুকু অনুকূল পরিবেশ আছে তার ব্যবহার ক'রে প্রাণশক্তি তার বিকাশের পথে প্রবাহিত হয়। জড় যে পরিমাণে প্রাণশক্তির অনুকূল সেই পরিমাণে তা প্রাণপ্রবাহের বিকাশের সহায়ক। যে পরিমাণে তা প্রাণশক্তির প্রতিকূল, সেই পরিমাণে তা প্রাণশক্তির প্রতিবন্ধক হয়ে পড়ে। এই প্রাণশক্তি ও জড়শক্তির পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতেই বিশ্বপ্রবাহ রচিত হয়।

সুতরাং বের্গসঁ-দর্শনে দুটি তত্ত্ব পাই। জড়তত্ত্ব ও প্রাণতত্ত্ব। সৃষ্টিপ্রবাহ যেন তাদের দ্বৈত সঙ্গীত। বের্গসঁ-দর্শনকে সেই কারণে দ্বৈতবাদী বলা যেতে পারে। সেখানে অক্রিয় জড়কে সঙ্গী ক'রে সক্রিয় প্রাণের খেলা আছে। তার

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল তা অতীতকেও সঙ্গে টেনে নিয়ে চলে স্মৃতির ভাণ্ডারে। সুতরাং তার যে নূতন সৃষ্টি তা সম্পূর্ণ নূতন নয়। তার মধ্যে অতীতও একটি উপাদান হিসাবে রয়ে যায়।

এই দুই বিষয়েই রবীন্দ্রদর্শনের সহিত বের্গসঁ-দর্শনের পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রদর্শনে বিশ্বের মধ্যে কেবল একটি শক্তি বিরাজমান। তা জড় ও চেতন বস্তু দুইকেই ব্যাপ্ত ক'রে আছে। তা সর্বেশ্বরবাদী। সুতরাং বের্গসঁ যদি হন দ্বৈতবাদী, রবীন্দ্রনাথ হবেন অদ্বৈতবাদী।

দ্বিতীয়, বের্গসঁ-দর্শনে চাঞ্চল্য ও গতিশীলতা ততখানি জড়ের ধর্ম নয় যতখানি প্রাণের ধর্ম। প্রাণশক্তি সক্রিয় এবং নিত্য বিকাশে উন্মুখ। জড়কে যতখানি-সম্ভব ব্যবহার ক'রে তা প্রাণশক্তিকে বিকাশের পথে প্রবাহিত করে। এই প্রাণশক্তি স্মৃতিধর্মী এবং অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে টেনে নিয়ে চলে। রবীন্দ্রদর্শনে বিশ্বের যে রূপটি চিত্রিত হয়েছে তাতে অতীতকে নূতন সৃষ্টির অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করা হয়নি। তা বলে দুটি তালের কথা। প্রথমটি ধ্বংস, দ্বিতীয়টি সৃষ্টি। যা অতীত তা সম্পূর্ণ যায়। যা নূতন সৃষ্টি হয় তা সম্পূর্ণ নূতন। অতীতকে রবীন্দ্রনাথ আবর্জনা বলেছেন। মৃত্যু সেই আবর্জনাকে ধ্বংস ক'রে নূতন সৃষ্টিকে শুচিতা দান করে। যে সত্তা সৃষ্টিপ্রবাহে অপ্রকট ভাবে বিরাজমান তিনি প্রাচীনকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করেন। কারণ তিনি সম্পূর্ণ ভাবে নূতন ক'রে সৃষ্টি করবার ক্ষমতা রাখেন ঃ

> "ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে ভরিতে নূতন করি,
> অপব্যয়ের ভয় নাহি তার পূর্ণের দান স্মরি।" ['মহুয়া']

রবীন্দ্রদর্শনে সৃষ্টির প্রবাহের মধ্যে দুটি ছেদ আছে। একটি সম্পূর্ণ ধ্বংস, অপরটি সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। তারা নৃত্যের দুটি তালের মতো। সৃষ্টি তাঁর ধারণায় ততটা প্রবাহিণী নয় যতটা নৃত্যপরা নটী। বের্গসঁর দর্শনে অপরপক্ষে সৃষ্টি সত্যই প্রবাহিণী, সৃষ্টি নটী নহে। এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এসে পড়ে। বের্গসঁ বরমাল্য দিয়েছেন প্রবাহিণীর গলায়, রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন নটরাজের গলায়।

# রবীন্দ্রকাব্যে 'আমি ও তুমি'

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

॥ ১ ॥

সত্যানুভূতির ক্ষেত্রে উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের গভীর মিল একটি সর্বাত্মক অদ্বয়বোধে; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আবার রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য অদ্বয়বোধের মধ্যেই একটি সুস্পষ্ট দ্বয়বোধে। তাঁহার এই দ্বৈতবোধ কোথায়ওই তাঁহার অদ্বৈতবোধের পরিপন্থী হইয়া দেখা দেয় নাই—কারণ দ্বয়ের যাত্রা শুরুও হইয়াছে অদ্বয় হইতে—দ্বয়ের পর্যবসানের আদর্শও অদ্বয়ের মধ্যে আবার দ্বয়রূপে যাহা কিছু অবস্থিত তাহার সকল অর্থ—সকল মূল্যও নিহিত এক অদ্বয়ের মধ্যে। দ্বয়ের কখন্ যে কি করিয়া অদ্বয় হইতে যাত্রা শুরু হইল—কখন্ কিভাবে যে আবার অদ্বয়ের মধ্যে তাহার পর্যবসান হইবে এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট করিয়া কথা বলেন নাই; এ-সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট করিয়া কথা বলিবার দায়ও রবীন্দ্রনাথের নহে। তিনি দার্শনিকের ন্যায় প্রতিপাদ্য নির্দেশ করিয়া সিদ্ধান্ত অভিমুখে তথ্য-তর্কের সমাবেশ করিতে বসেন নাই, তিনি কবি—জীবনব্যাপী অনুভূতিই তাঁহার তথ্য—সেই অনুভূতিই তাঁহার একমাত্র যুক্তি। কখনও তিনি অনুভব করিয়াছেন—

যাত্রী আমি ওরে—<br>
বাহির হলেম না জানি কোন্ ভোরে।

যেদিন প্রথম ভোরে যাত্রা করিলেন সেদিন সেই প্রথম যাত্রাক্ষণে—

নিমেষহারা শুধু একটি আঁখি<br>
জেগেছিল অন্ধকারের পরে।

এই অন্ধকার হইল প্রাক্‌সৃষ্টির একের মধ্যে সর্ববিলীনতার অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের প্রথম যাত্রাক্ষণে যে নিমেষহারা আঁখিটি জাগিয়াছিল এবং পরমৌৎসুক্যে লক্ষ্য করিতেছিল 'ব্যক্তি'র জীবনপ্রবাহে যাত্রা—সে আঁখিটি হইল অদ্বয় 'একে'র। এখানে কবির বিশ্বাস—

যাত্রী আমি ওরে—
কোন্ দিনান্তে পৌঁছাব কোন্ ঘরে।

'ব্যক্তি'কে কবি অনন্তপথের যাত্রী বলিয়াই বর্ণনা করিলেও একটা গোপন আশ্বাস লক্ষ্য করিতে পারি—'কোন্ দিনান্তে পৌঁছাব কোন্ ঘরে'। 'কোন্ দিনান্তে' তাহাও ঠিক জানেন না, 'কোন্ ঘরে' তাহাও ঠিক জানেন না,—তবু যেন মর্মের গভীরে একটা 'পৌঁছবার' আশ্বাস ; এবং যেদিন পৌঁছানো যাইবে সেদিন দেখা যাইবে—

কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দু-নয়ানে
অনাদিকাল চাহে আমার তরে।

প্রথম যাত্রাক্ষণে যে-আঁখি নিমেষহারা চাহিয়াছিল তাহাও যে অদ্বয় 'একে'র আঁখি, পৌঁছবার দিনের জন্য অনাদিকাল স্নিগ্ধ দু'নয়নে যে এই 'ব্যক্তি'র জন্য তাকাইয়া আছে সেও সেই অদ্বয় 'এক'ই। কখনও আবার কবির অনুভূতি চলিয়াছে অন্য পথে—অদ্বয়ের ভিতরে এই দ্বয়ের লীলা—পরম একের সহিত অনন্ত 'ব্যক্তি'র যে লীলা—সে যেন অনাদি অনন্ত—সে লীলা তাই আত্মরতির নিত্যলীলা।

এই দ্বয়বোধের মধ্যেই লুক্কায়িত ব্যক্ত জগৎ এবং ব্যক্ত জীবনের সকল তাৎপর্য এবং মহিমা। রবীন্দ্রনাথ কবি—জন্মক্ষণ হইতে মৃত্যুক্ষণ পর্যন্তই তিনি কবি ; কবিরূপে মনে-প্রাণে তিনি ভালোবাসিয়াছেন এই জগৎকে—এই জীবনকে, বিশ্বপ্রকৃতিকে আর মানুষকে। জগদতীত এবং মানবাতীতের কথা তিনি যে বার বার এতরকম করিয়া বলিয়াছেন তাহার মুখ্য কারণ, যে-জগৎকে যে-মানুষকে এত করিয়া ভালোবাসিয়াছেন সেই ভালোবাসার সত্যমূল্য চাই ; ভালোবাসার সত্যমূল্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না যদি যাহাকে ভালোবাসি তাহার সত্যমূল্য খুঁজিয়া না পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে নিরন্তর তাই তাগিদ—জগতের মূল্য—মানুষের মূল্য খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, মিথ্যাকে ভালোবাসিয়া আমার এত ভালোবাসা যেন মিথ্যা না হইয়া যায়। অদ্বয় এককে

কেবলই আবিষ্কার করিতে হইয়াছে—অনুভব করিতে হইয়াছে এই দ্বয়ের জগৎ —এই দ্বয়ের মানুষ—ইহার সত্যমূল্য লাভ করিবার জন্য—সকল দ্বয়ের প্রতিভূ আমার মধ্যে যে 'আমি' সেই আমি বা বিশেষ 'ব্যক্তি'র মূল্য লাভ করিবার জন্য। জীবন ভরিয়া তাই কেবল উপলব্ধির চেষ্টা, উপরের তলায় এই যে অজস্র ব্যক্তি—অনন্ত প্রকাশ—সে 'আনন্দরূপম্'—ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, সুখ-দুঃখ—সকলের ভিতর দিয়াই 'আনন্দরূপম্'। কিন্তু এই 'আনন্দরূপম্'-এর জন্য যখন এমন অত্যাসক্তি তখন অতি স্বাভাবিকভাবেই ভিতর হইতে আর একটি তাগিদ ; এই 'আনন্দরূপম্'ই যে 'অমৃতম্' সেই কথাটির আশ্বাস না পাইলে মন কোথায় লাভ করিবে তাহার প্রতিষ্ঠা ? যাহা 'আনন্দরূপম্' তাহা যদি 'অমৃতম্' না হইবে—তাহার ভিতরে কোথাও যদি একটা মৃত্যুর অতীত শাশ্বত সত্য না থাকিবে তবে সব কিছুই যে একটা অসহ্য ফাঁকি। অতএব অনুভব করা চাই, এই যে 'আনন্দরূপম্' সে 'অমৃতম্' হইয়া উঠিয়াছে এই কারণে যে, এই চিরচঞ্চল 'আনন্দরূপম্' যে ব্যক্তি বা প্রকাশ তাহার নীচে স্থির হইয়া আছে 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্'। ঐ 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্'-এর উপরেই হইল সকল 'আনন্দরূপম্'-এর শাশ্বত প্রতিষ্ঠা।

কবি তাঁহার ব্যক্তি-সত্তাকে যেখানেই খুব গভীর করিয়া অনুভব করিলেন সেখানেই অনুভব করিলেন, ব্যক্তি-সত্তা ঘনীভূত হইয়া দেখা দিতেছে একটি 'আমি'র মধ্যে। কবি আরও অনুভব করিলেন, এই আমি ত শুধু আমার ভিতরকার আমি নই, বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এই 'আমি'ই হইলাম সকল 'আনন্দরূপম্ অমৃতম্'-এর প্রতিভূ ; কবি তখন খুঁজিয়া পাইলেন নীচেকার 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্'-এর ভিতরে একটি 'তুমি'কে ; এই 'আমি' ও 'তুমি'র আনন্দলীলার মধ্যেই নিহিত বিশ্বসৃষ্টির সকল তাৎপর্য। একদিকে 'যদ্ বিভাতি'—যাহা কিছু বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছে ; একের সেই বহিঃপ্রকাশই 'আমি' ; এমনই করিয়া আনন্দরূপ গ্রহণ করিয়া প্রকাশ পাইতেছি যে 'আমি' সেই 'আমি'র সকল সত্য আবার শান্ত অদ্বৈতের সহিত আনন্দযোগে ; এই আনন্দযোগটাই হইল লীলা-রহস্য।

রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের মধ্যে এই যে আমরা অদ্বৈতের মধ্যে একটা দ্বৈতবোধ দেখিতে পাইতেছি, ভারতীয় চিন্তা বা উপলব্ধির ক্ষেত্রে ইহা কিছু অভিনব নহে। সকল সম্প্রদায়ের দ্বৈতবাদী বেদান্তিগণ নানা ভাবে এই মতকেই স্বীকার করিয়াছেন। রামানুজ জগৎ এবং জীব বা অচিৎ এবং চিৎকে

ব্রহ্মের বিলাসবিভূতি বলিয়াছেন এবং এই অর্থে তিনি জগৎ এবং জীবের পৃথক্ সত্য স্বীকার করিয়াছেন। অন্যান্য দ্বৈতবাদিগণও জীবকে নিত্য চিৎকণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, চিৎকণরূপে পরম ভগবদ্-ধামেও জীব তাহার নিত্য পৃথক্ সত্তা রক্ষা করিয়া নিত্য ভগবৎ-সান্নিধ্য ও ভগবৎ-প্রেম আস্বাদন করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতবোধ এই সকল দ্বৈতবাদিগণের দ্বৈতবোধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কি করিয়া পৃথক্ সে-কথা আমাদের পরবর্তী আলোচনার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের অনুভূত 'তুমি' ও 'আমি'র পরিচয় লাভ করিলেই আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। এখানে সংক্ষেপে এই পার্থক্যের মূল কথাটার প্রতি ইঙ্গিত করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের 'তুমি'র ধারণাও কোনও একটি স্থৈতিক (static) পরম সত্যের ধারণা নয়, 'আমি'র ধারণাও কোনও স্থৈতিক ধারণা নয়। 'আমি'ও নিত্যপ্রবাহে নিত্য নূতন করিয়া হইয়া উঠিয়া একটি চিরপ্রসার্যমাণ ব্যক্তিসত্য লাভ করিতেছে; আবার এই চিরবিকাশমান 'আমি'র যোগে 'তুমি'ও নিত্যকালে সত্য হইয়া উঠিতেছে। আমরা পরে লক্ষ্য করিতে পারিব, এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যে চিত্তপ্রবণতা তাহা ভারতবর্ষের দ্বৈতাদ্বৈতবাদী সাধকগণের সঙ্গে খানিকটা মিল সত্ত্বেও পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেল এবং হেগেলীয়গণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। যাহা মূলে নিহিত 'ভাবে'র (idea) মধ্যে তাহাই দেশ-কালে ব্যক্তীকৃত 'ভবে'র (existence) মধ্যে; এই 'ভাব' এবং 'ভব' ইহার মধ্যে কোথাও মুহূর্তের ছাড়াছাড়ি নাই; উভয়ের যোগেই উভয়ে সত্য—উভয়ের ভিতর দিয়াই পরমসত্যের নিরন্তর হইয়া উঠিবার লীলা।

উপনিষদের মধ্যে ব্রহ্মের দুইটি রূপের কথা বলা হইয়াছে,—দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ মর্ত্যং চামর্ত্যং চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ। একটি হইল মূর্ত রূপ একটি হইল অমূর্ত, একটি হইল মর্ত্য ( মরণশীল পরিবর্তনশীল ) রূপ অপরটি হইল অমর্ত্য, একটি হইল স্থিতরূপ অপরটি হইল গমনশীল রূপ, একটি হইল সৎরূপ ( ব্যক্তরূপ ) অপরটি হইল 'ত্যৎ'রূপ বা অব্যক্তর রূপ। [ বৃহদারণ্যক, ২।৩।১ ]। ঈশ উপনিষদের ভিতরে যেখানে বলা হইয়াছে, 'তদ্ এজতি তন্নৈজতি'—তাহা চলে আবার তাহা চলে না—তখনও ব্রহ্মের এই দুই রূপের কথাই বলা হইয়াছে। একদিকে সত্য নির্বিশেষ এক (Absolute), অন্যদিকে পরম সত্য হইল পরম পুরুষ (Person)। রবীন্দ্রনাথ পরম সত্যের এই দুই রূপকে স্বীকার করিলেও তিনি উপাসক ছিলেন এই পরম পুরুষের—যিনি 'পুরুষম্ মহান্তম্'—যিনি অকায় অব্রণ অস্নাবির শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হইয়াও

যাথাতথ্যতঃ ( যথাযথরূপে ) নিত্যকালে বিধান করিতেছেন, যিনি এক অবর্ণ হইয়াও নিহিতার্থ ( নিহিত হইয়াছে সকল অর্থ যাঁহাতে )—তাই বহুধা শক্তিযোগে অনেক বর্ণের বিধান করিতেছেন, যিনি শান্ত অদ্বৈত হইয়াও আনন্দরূপে অমৃতরূপে বিশেষ প্রকাশ লাভ করিতেছেন। সেই পরম সত্য পরম পুরুষ বলিয়াই 'আমি পুরুষে'র সহিত সেই 'পরম পুরুষে'র নিত্যসম্বন্ধ, এবং সেই 'আমি'র সহিত নিত্যসম্বন্ধেই সেই পরমপুরুষও রবীন্দ্রনাথের নিকটে নিত্য 'তুমি' বলিয়াই ধরা দিয়াছেন। এই পরমপুরুষ এই 'আমি'টিকে বাদ দিয়া আপনাতে আপনি পূর্ণই নন,—'আমি'র যোগেই তাঁহার পূর্ণতা—যেমন পূর্ণতা সুরের যোগে সঙ্গীতের। সুর ছাড়া—গানের মধ্যে বিকাশ ছাড়া—সঙ্গীতের বিশুদ্ধ আপনাতে আপনি সমাহিত কোনও রূপ নাই সত্য নাই। সুরের মধ্যে সে যতখানি আপনাকে নিঃশেষে ছড়াইয়া দেয় সঙ্গীত ততখানি সত্য হইয়া ওঠে। 'আমি'টি হইলাম সেইরূপ সুরের বিস্তার—আমির বিস্তারেই 'তুমি'র বিস্তার—আমির সত্যেই 'তুমি'র সত্য। এই কথাই বলিয়াছেন কবি তাহার *Personality*-র ভিতরকার একটি ভাষণে—

"The infinite and the finite are one as song and singing are one. The singing is incomplete ; by a continual process of death it gives up the song which is complete. The absolute infinite is like a music which is devoid of all definite tunes and therefore meaningless.

The absolute eternal is timelessness, and that has no meaning at all,—it is merely a word. The reality of the eternal is there, where it contains all times in itself." [ পৃঃ ৫৭ ]

নির্বিশেষ পরম যেন রাগ-রাগিণীহীন সুরহীন একটি সঙ্গীত—সে-জাতীয় নির্বিশেষ সত্য একটি অর্থহীন সত্য। আমরা যে পরম সত্যকে নিত্য বলি সেই নিত্যত্বেরই বা অর্থ কি? সে নিত্য যদি কালহীন নিত্য হয়—তবে সে নিত্য ত অর্থহীন নিত্য—একটা শব্দমাত্রে পর্যবসিত নিত্য ; নিত্য সত্য হইয়া ওঠে সেখানেই যেখানে নিত্য সর্বকালকে আপনার ভিতরে ধারণ করিয়া আছে।

তাহা হইলে দেখিতেছি, রবীন্দ্রনাথের উপাস্য যিনি পরমপুরুষ তিনি দেশহীন কালহীন সর্বহীন সত্য নন, তিনি নিরন্তর আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়াই পরম সত্য। এইখানেই হেগেলের সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুরের ঘনিষ্ঠ মিল দেখিতেছি। হেগেলও যে পরম দেবতার কথা বলিয়াছেন তিনি সৃষ্টিপ্রবাহ

হইতে বিমুক্ত কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ দেবতা কখনই নহেন; তিনি কখনও হইয়া বসিয়া নাই, তিনি সর্বদাই বিশ্বপ্রবাহের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিতেছেন। একদিকে রহিয়াছে নিত্যকালের 'ভাব', অপরদিকে সেই 'ভাবে'র 'ভব' বা অস্তিত্ব-প্রবাহ বিশ্বমূর্তিতে; এই 'ভাব' এবং 'ভবে'র ভিতর দিয়া পরম সত্য কেবলই পরম হইয়া উঠিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও সঙ্গীতে এই 'ভাবে'র অংশটা লইয়াই নানা ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে 'তুমি', 'ভব'-প্রবাহের চরম মূর্তি 'আমি'র মধ্যে।

এই যে একটি 'তুমি-আমি'র ভাবদৃষ্টি—অদ্বয়ের মধ্যে একটা দ্বয়বোধ লইয়াই যে একটা লীলাবোধ এবং তাহাকে লইয়া একটা প্রেম-ভক্তির সুর ইহা আমরা সমস্ত ব্রাহ্মধর্মের মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারি। ব্রাহ্মধর্ম নিরাকারের উপাসনার কথা বলিল বটে, কিন্তু সে নিরাকার সর্বশূন্য নিরাকার নহেন; ব্রহ্মে নরত্বারোপের প্রবণতা লইয়া রূপ-কল্পনায় বাধা দিয়া প্রাধান্য দেওয়া হইল তাঁহার বিশ্বরূপের বা বিশ্বমূর্তির। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠার মধ্যেই লীলার্থ-কল্পিত একটি 'তুমি-আমি'র ভাব দেখিতে পাই; এই 'তুমি-আমি'কে অবলম্বন করিয়া যে প্রেম-ভক্তির সুর রবীন্দ্রনাথের গানে জাগিয়া উঠিয়াছে ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে তাহার প্রস্তুতি ছিল এ-কথা অস্বীকার করিতে পারি না। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই চিত্তপ্রবণতার মধ্যে কবি-অনুভূতি ও ধর্মানুভূতির যে অপরিচ্ছেদ্য যোগ আবিষ্কার করিতে পারিলেন সেই যোগের সঙ্গে গভীর মিল অনুভব করিতে পারিলেন বাঙলার বাউল গানের এবং উত্তর-মধ্য ও পশ্চিম ভারতের সন্ত-সম্প্রদায়ের গানের মধ্যে। বাউলগণ অভেদের সাধক—আবার প্রেমে পাগল—যিনি অভেদ তাঁহার মানস-সরোবরের মধ্যেই প্রত্যেক ব্যক্তির একটি হৃদয়-কমল ফুটিয়া উঠিতেছে; বাউল বলিতেছেন—

> হৃদয়-কমল চল্‌তেছে ফুটি
> কত যুগ ধরি'।
> তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা
> উপায় কি করি।

অদ্বয়ের মানস-সরোবরে একটি একটি করিয়া 'ব্যক্তি'র হৃদয়কমল ফুটিয়া উঠিতেছে; 'ব্যক্তি'র সেই বিশেষ প্রকাশের মধ্যেই বাঁধা পড়িয়াছে পরমপুরুষও—

ব্যক্তিপুরুষও। উভয়ের মিলন-বিরহ সব কিছু এই কমলের বিকাশকে অবলম্বন করিয়া। আবার প্রত্যেক ব্যক্তি-কমল লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে বিশ্বকমল—পরমগুরু সাঁই বসিয়া বসিয়া যুগ-যুগান্তে এই বিশ্বকমল ফুটাইয়া তুলিতেছেন; বিশ্বকমলও ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সকল ঐশ্বর্যে মাধুর্যে সৌন্দর্যে প্রেমে নিজেও বিকশিত হইতেছেন—আত্মচৈতন্যের দ্বারা আত্মসত্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন।

কবীর দাদূ প্রভৃতি সাধক-সম্প্রদায়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের এইজাতীয় মনোভাবের স্থানে স্থানে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে পারি। এইজন্য পরিণত-বয়সে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের এই সাধক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে কবির যখন পরিচয় হইল তখন তিনি যেন বহুমূল্য সম্পদ্ লাভ করিলেন। সাধক কবি দাদূর একটি কবিতায় পাই—

বাস কহৈ হৌঁ ফুল কো পাউঁ ফুল কহৈ হৌঁ বাস।
ভাস কহৈ হৌঁ ভাব কো পাউঁ ভাব কহৈ হৌঁ ভাস॥
রূপ কহৈ হৌঁ সত কো পাউ সত কহৈ হৌঁ রূপ।
আপস মে দউ পূজন চাহৈ পূজা অগাধ অনূপ॥

কবিতাটি বাঙলায় অনুবাদ করিলে দাঁড়ায় এই—

গন্ধ কহিছে, আমি পেতে চাই ফুল,
ফুল কহে আমি পেতে চাই শুধু বাস,
প্রকাশ কহিছে, ভাবকেই যেন পাই,—
ভাব কহে আমি পেতে চাই পরকাশ।
রূপ কহে আমি সত্যেরে পেতে চাই—
সত্য কহিছে, আমি পেতে চাই রূপ;
আপসে দু'জনে চাহে দু'জনার পূজা—
এ দু'য়ের পূজা অগাধ ও অপরূপ!

ইহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'উৎসর্গে'র অতি প্রসিদ্ধ কবিতা—

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চায় ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

ইহার আশ্চর্য মিল লক্ষিত হইবে। এ মিল প্রভাবজনিত মিল নয়, এ মিল সাধর্ম্যগত মিল। এই সাধর্ম্যগত মিল যে কত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে দাদূর আর একটি গানের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই। দাদূ বলিতেছেন—

সেবক সাঈঁকা ভয়া তব সেবক কা সব কোই।
সেবক সাঈঁকা মিলা সাঈঁ সরীখা হোই॥

সেবক যখন স্বামীর হইয়া যাইতে পারিল তখন সব কিছুই সেবকের হইয়া গেল ; অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে যোগেই হইল সেবকের সকল ঐশ্বর্য ও মহিমা। সেবক আর স্বামীর এই যে মিলন এই মিলনের মধ্যে একে দেখা দিল অপরের 'সরিক' হইয়া। এই কথাতেই রবীন্দ্রনাথেরও মনের গভীর সায়। ভক্তরূপে দাদূ যাঁহাদিগকে বলিয়াছেন স্বামী ও সেবক, কবিরূপে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে অমনভাবে স্পষ্ট ধর্ম-গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না করিয়া গ্রহণ করিলেন 'তুমি' ও 'আমি' করিয়া। এই 'আমি'র সব সত্য নিহিত 'তুমি'র মধ্যে এ-কথা যেমনতর সত্য, আবার 'আমি' যে 'তুমি'র সরিক—পরম সত্যের ক্ষেত্রে 'আমি' যে 'তুমি'র সঙ্গে সমান অংশীদার, 'আমি' না হইলে 'তুমি' যে একেবারে অর্থহীন শূন্য হইয়া যাইত—এ-কথাটাও তেমনতরই সত্য। এইখানেই কবির পরম মূল্যবোধ—পরম আত্মানুভূতির আনন্দ—পরম গর্ব।

॥ ২ ॥

কিন্তু এই 'আমি'কে লইয়া প্রথমেই প্রকাণ্ড একটা খট্‌কা লাগিবার কথা। আমরা দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা গান ভাষণ-প্রবন্ধ রহিয়াছে

যেখানে তিনি নানা ভাবে এই 'আমি'র হাত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছেন। বার বার করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি বলিয়াছেন, এই 'আমি'র সীমা ঘুচিয়া না গেলে আমার ভিতরকার যে সত্যরূপ তাহাকেও আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, বিশ্বসৃষ্টির অনন্তর্নিহিত যে পরম সত্য তাহার স্পর্শও আমরা লাভ করিতে পারি না। 'আমি'র অহঙ্কারকে কবি কোথাও মলিন বস্ত্র বলিয়াছেন, কোথাও আত্মার আবরণ বলিয়াছেন, কোথাও সত্যের মুখের উপরে ঢাকা-দেওয়া হিরণ্ময়-পাত্র বলিয়াছেন। এই আবরণকে দূরে সরাইয়া ফেলিয়াই যে নিজেব ভিতরকার সত্য এবং বিশ্ব-জীবনের ভিতরকার সত্যের পরিচয় লাভ করিতে হইবে এ-কথা ত কবি গানে কবিতায় ভাষণে অসংখ্যবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ যে আবরণ সত্যকে গ্রহণ করিতে সর্বদা বাধা দিতেছে সেই আমির আবরণকে দূরে সরাইয়া ফেলাই ত কবির মুক্তি-সাধনার প্রধান অঙ্গ হইয়া দেখা দিয়াছে। তবে আবার 'আমি'র এতখানি মহিমা কেন? ইহা কি কবিচিত্তে পরস্পরবিরোধী দুইটি ভাবধারা?

কবি-মানসে এখানে সত্যকার কোনও বিরোধ নাই। যে আমিকে কবি আবরণ বলিয়াছেন—সত্যোপলব্ধির বাধাস্বরূপ বলিয়াছেন, সে আমি—কোন্ আমি? সে আমি হইল দেশ-কাল-পাত্রে বিশেষভাবে অবচ্ছিন্ন আমি—প্রাত্যহিকতার আবরণের দ্বারা প্রতিমুহূর্তের মধ্যে খণ্ডিত আমি। এ-আমির সর্বরতি জৈব অস্তিত্বের আস্বাদনের দিকেই কেন্দ্রীভূত—সুতরাং জৈব প্রয়োজনের জালে এ-আমি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। এই 'আমি'কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন আমাদের ভিতরকার 'ছোট আমি'; কিন্তু আমাদের মধ্যে আর একটি আমি রহিয়াছে সে 'অত্যন্ত বড়ো'। 'শান্তিনিকেতনে' 'জাগরণ' নামক ভাষণটিতে কবি বলিয়াছেন,—"যে-দিকটাতে আমি কেবলমাত্রই আমি—সকল কথাতেই ঘুরে ফিরে কেবলি আমি—কেবল আমার সুখ দুঃখ, আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা—যেদিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই, সেদিকটাতে আমি তো একটি বিন্দুমাত্র, সেদিকটাতে আমার মতো ছোটো আর কে আছে। আর যেদিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা, যেদিকে সমস্ত জগৎ আমাকে প্রার্থনা করে, আমার সেবা করে, তার শতসহস্র তেজ ও আলোকের নাড়ীর সূত্রে আমার সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে,—আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত লোকলোকান্তর পরম আদরে এই কথা বলে যে, 'তুমি

আমার যেমনটি এমনটি কোথাও আর-কেউ নেই, অনন্তের মধ্যে তুমিই কেবল তুমি' ; সেইখানে আমার চেয়ে বড় আর কে আছে ?"

এখানে তাহা হইলে বোঝা যাইতেছে, দার্শনিক যাহাকে জীবাত্মা বলেন, সর্বতোভাবে পরিহার্য আমি সেই জীবাত্মা নহেন। দার্শনিকগণ যাহাকে জীবাত্মা বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাহাকে অন্যভাবে দেখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বলিয়াছেন তাঁহার ভিতরকার বিশেষ 'ব্যক্তি'। পরমপুরুষের মধ্যে নিহিত অসীম ভাবরাশির একটি বিশেষ ভাব সৃষ্টিপ্রবাহের ভিতর দিয়া বিশেষ রূপে ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছিল ; রবীন্দ্রনাথের জীবন হইল সেই বিশেষ প্রকাশ-স্পন্দনের যুগ যুগ ধরিয়া জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ব্যক্তীভবন—সেই ব্যক্তীভবনের সমগ্রতা জুড়িয়াই রবীন্দ্রনাথের ক্রমবিবর্ধমান ক্রমপ্রসার্যমাণ একটি বিশেষ ব্যক্তিপুরুষ। এই ব্যক্তিপুরুষের সত্যকে যদি তিনি অস্বীকার করিতেন তবে ত আমিত্ব ঘুচাইতে গিয়া তিনি একেবারে মায়াবাদী বৈদান্তিক হইয়া উঠিতেন। বিশ্বপ্রবাহের মধ্যে এই আমির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, কারণ এই বিশেষ আমির ভিতর দিয়া পরমপুরুষের একটি বিশেষ ইচ্ছার একটি বিশেষ 'ভাবে'র (idea) বিশেষ প্রকাশ, সে-প্রকাশ আর কোথাও কোনও দিন নাই বলিয়া একটি বিশেষ অর্থ লইয়া এই বিশেষ আমি স্বতন্ত্র ; সেই সকল স্বাতন্ত্র্য জুড়িয়া পরমপুরুষের একতন্ত্র—এইখানেই সকল দ্বয়ের মধ্যেই আবার অদ্বয়যোগ। এই সত্যে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াই কবি বলিয়াছেন,—"জগতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা বিশেষ স্থান আছে। আমরা প্রত্যেকেই একটি বিশেষ আমি। সেই বিশেষত্ব একেবারে অটল অটুট ; অনন্ত কালে অনন্ত বিশ্বে আমি যা আর-কেউ তা নয়।" [ শান্তিনিকেতন, জাগরণ ]। ইহার কারণ, এই একটি বিশিষ্ট 'আমি'র জীবন-ধারাকে অবলম্বন করিয়া পরমপুরুষের একটি বিশিষ্ট ইচ্ছাই যে দেশে কালে অবিচ্ছিন্ন রূপে তরঙ্গিত হইতেছে। অদ্বয়-অনুভূতির মধ্যে যেখানে মানুষের মুক্তি সেই মুক্তির ভিতরেও এই 'আমি'র সম্পূর্ণ বিলোপ নয়। ভারতীয় বৈদান্তিকগণ বলিবেন, এই 'আমি' অদ্বয় সত্যের ভিতরে নিঃশেষে আপনাকে বিলীন করিয়া দেয় ; কিন্তু দ্বৈতবাদিগণ বলেন, পরমপুরুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও এই জীবাত্মা চিৎকণরূপে নিত্য স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে। রবীন্দ্রনাথের মানস-প্রবণতাও সেই দিকে। তিনি বলিবেন,—"এই আমার দ্বন্দ্বনিকেতন আমিকে আমার ভগবান নিজের মধ্যে লোপ করে ফেলতে চান না ; একে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে চান। এই আমি তাঁর প্রেমের সামগ্রী ;

একে তিনি অসীম বিচ্ছেদের দ্বারা চিরকাল পর করে অসীম প্রেমের দ্বারা চিরকাল আপন করে নিচ্ছেন।” এইভাবেই ত ‘আমি’র সঙ্গে তাঁহার নিত্যলীলা।

মানুষের সহস্র সহস্র বর্ষের ইতিহাস জুড়িয়া চলিতেছে এইরূপ অনন্ত ‘আমি’র বিবর্তন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেকটি আমিই একটি বিশেষ অর্থ বা পরম-পুরুষের ইচ্ছা-তরঙ্গ লইয়া স্বতন্ত্র। সমস্তের যোগে চলিতেছে সেই অনন্তস্বরূপ ‘পরম একে’র পুরুষত্বের বা ব্যক্তিত্বের বিবর্তন। কিন্তু এই নিখিলপ্রবাহের মধ্যে আমার ‘আমি’টির যে একটি স্বতন্ত্র মূল্য রহিয়াছে এবং সে-মূল্য যে পরমপুরুষের হইয়া ওঠার লীলার সঙ্গে অপরিহার্যরূপে জড়িত—ইহাই হইল প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানবের পরম গর্ব। “এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই এক পরম-আমির অনন্ত আনন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত হয়ে উঠছে। অথচ এই অন্তহীন আমি-মণ্ডলীর প্রত্যেক আমির মধ্যেই তাঁর এমন একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ যা জগতে আর কোনোখানেই নেই। সেইজন্যে আমি যত ক্ষুদ্রই হই, আমার মতো তাঁর আর দ্বিতীয় কিছুই নেই; আমি যদি হারাই তবে লোকলোকান্তরের সমস্ত হিসাব গরমিল হয়ে যাবে। এইজন্যেই আমাকে নইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নয়, সেইজন্যেই সমস্ত জগতের ভগবান্ বিশেষ-রূপেই আমার ভগবান্, সেইজন্যেই আমি আছি এবং অনন্ত প্রেমের বাঁধনে চিরকালই থাকব।” [ শান্তিনিকেতন, জাগরণ ]।

এই যে একটি বিশেষ আমিকে অবলম্বন করিয়া একটি বিশেষ ব্যক্তি-প্রবাহ ইহাকে জীবনের কোনও অংশে—বা একটি জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে যাওয়াই মিথ্যাদৃষ্টি। এই ব্যক্তি-প্রবাহের মধ্যেই একটা অখণ্ডতা রহিয়াছে—একটি বিশেষ অর্থের একটি বিশেষ প্রকাশকে লইয়া এই অখণ্ড প্রবাহ। আমার ভিতরকার যে সত্য সে ত শুধু জীবরূপে একদিন এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ যে আমি সেখান হইতেই যাত্রা করে নাই—তাহার কত অগণিত বর্ষ আগে প্রাক্‌পৃথিবীর নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে সে অর্থ প্রকাশের অধীর উন্মুখতা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল—আমার মধ্যে নিহিত সে সত্য ধূলিতৃণের ভিতর দিয়া কত ভাবে প্রকাশ লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার পরে জড়ত্বের বন্ধন ঘুচাইয়া একদিন প্রাণ আসিয়াছে, সে প্রাণের কত অফুরন্ত প্রৈতি! সেই প্রাণপ্রৈতির আবেগের ভিতর দিয়া জাগিয়াছে চেতনা—চেতনার ঘনীভবনে জাগিয়াছে প্রেম—সে কি একদিনের কথা, সে কি একজন্মের কথা?

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ঝরনা যেমন বাহিরে যায়,
জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি করে ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

[ গীতাঞ্জলি ]

এই কথাটাকেই কবি তাঁহার ভাষণের মধ্য দিয়া অন্যভাবে বলিয়াছেন—

"এই রকম আঘাতের পর আঘাত লেগে আমরা যে কত শত জানার মধ্য দিয়ে জাগতে জাগতে এসেছি, তা কি আমরা জানি। প্রত্যেক জাগার সম্মুখে কত নব নব অপূর্ব আনন্দ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা কি আমাদের স্মরণ আছে। জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্য থেকে আনন্দের মাঝখানে স্তরে স্তরে কত ঘুমের পর্দা একটি একটি করে খুলে গিয়েছে, তা অতীত যুগযুগান্তরের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে—মহাকালের দপ্তরের সেই বই কে আজ খুলে পড়তে পারবে। অনন্তের মধ্যে আমাদের এই-যে জাগরণ, এই-যে নানাদিকের জাগরণ—গভীর থেকে গভীরে, উদার থেকে উদারে জাগরণ, এই জাগরণের পালা তো এখনো শেষ হয় নি। সেই চিরজাগ্রত পুরুষ যিনি কালে কালে আমাদের চিরদিন জাগিয়ে এসেছেন—তিনি তাঁর হাজারমহল বিশ্বভবনের মধ্যে আজ এই মনুষ্যত্বের সিংহদ্বারটা খুলে আমাদের ডাক দিয়েছেন—এই মনুষ্যত্বের মুক্তদ্বারে অনন্তের সঙ্গে মিলনের জাগরণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে— ...।"

'তুমি-আমি'কে লইয়া রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যজীবনে যে আনন্দ-লীলা আস্বাদনের চেষ্টা তাহার পিছনে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে কতকগুলি প্রবল প্রবণতা ছিল। বিশেষ কোনও দার্শনিক তত্ত্বদৃষ্টির দ্বারা এ-বোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত নয়—কবি-অনুভূতির ভিতর দিয়া এ-কথা কোথাও ভাবপ্রাবল্যে কোথাও আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়াছে। এ কথা কবি নিজেই স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন—

এ কথা মানিব আমি, এক হতে দুই
কেমনে যে হতে পারে জানি না কিছুই

[ নৈবেদ্য, ৮৮ ]

তথাপি কবির এ-বিষয়ে কতকগুলি সহজাত প্রবণতা ছিল; সেই প্রবণতা তাঁহাকে অনুভূতির পথে চালিত করিয়াছে, অনুভূতি আবার প্রবণতাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। পরস্পরের এইজাতীয় অনুপূরণে গড়িয়া উঠিল দৃঢ় বিশ্বাস—'তুমি' সম্বন্ধে—'আমি' সম্বন্ধে—জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে। এই বিশ্বাসের মূল কথা এই, বিশ্বসৃষ্টির পশ্চাতে একটি অনাদি 'এক' রহিয়াছেন; সেই একের মধ্যে ছিল 'মহাস্বপ্ন'। এই মহাস্বপ্নের তাৎপর্য হইল বস্তুর বিশুদ্ধভাবরূপে অবস্থিতি। যাহা এক পরমপুরুষের মধ্যে বা কবির ভাষায় 'মহাদেবে'র মধ্যে ভাবরূপে ছিল মহাস্বপ্নে বিধৃত—তাহারই প্রকাশ হইল বিশ্বসৃষ্টির ভিতর দিয়া। এখানে দার্শনিক কূটতর্ক তোলা যাইতে পারে, এই যে প্রকাশ তাহা কি কালগতভাবে মহাস্বপ্নের বা বিশুদ্ধভাবরূপে অবস্থিতির পরবর্তী কোনও সঙ্ঘটন? অথবা ভাব ও প্রকাশ (idea and manifestation) অন্যোন্যাশ্রয়ী হইয়া নিত্যকালে সমভাবে অবস্থিত? রবীন্দ্রনাথ এই দার্শনিক জিজ্ঞাসার বিশুদ্ধ দার্শনিক উত্তর দিবার চেষ্টা কোনোখানেই করেন নাই। কোথাও দেখি, সৃষ্টির পূর্বকার এক মহাদেব বিরাজমান—তাঁহার অনন্ত ধ্যানের মধ্যে ভাবরূপে এবং সম্ভাবনারূপে নিহিত বিশ্বসৃষ্টি—তাহার মধ্যে 'আমি'ও বিধৃত একটি বিশেষ ভাবকণারূপে, সেই ধ্যানের প্রকাশ এই বিশ্বপ্রবাহে। কোথাও আবার দেখি, প্রকাশহীন দেবতা কোথাও কিছু নাই—ভাবে আর প্রকাশে নিত্যলীলা—সেই ভাবের নিধান হইলেন যে এক পরম পুরুষ, তিনিই নিত্যকালের 'তুমি'; আর প্রকাশের সারভূত বিগ্রহ নিত্যকালের 'আমি'; এই 'তুমি-আমি'র নিত্যলীলাতেই উভয়ই সত্য হইয়া উঠিতেছে।

বিশ্বপ্রবাহের পিছনকার যে প্রেরণা যে শক্তি তাহা হইল পরম একের আত্মানুভূতির আত্মানন্দের আবেগ, এই আবেগই কালধারায় প্রবাহিত সৃজ্যমান বিশ্বচরাচরের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসে কবে কেহ জানে না, বিশ্বদেবের একটি বিশেষ ভাবকণা লইয়া একটি বিশেষ আমি এই সৃজ্যমান বিশ্বের সহিতই সৃজ্যমান হইয়া চলিয়াছি। বিশ্ববিবর্তন ধারায় এই 'আমি'টি বহুকাল জড়ের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়াই আবর্তিত হইয়াছে, জড় তাহার সকল

আবর্তনের ভিতর দিয়া চেষ্টা করিয়াছে এই 'আমি'টিকে বিকশিত করিয়া তুলিবার। তাহার পরে আসিল প্রাণের পালা; বিশ্বপ্রাণের নিরন্তর প্রেরণার ভিতর দিয়া চলিয়াছে এই 'আমি'র প্রাণযাত্রা, তাহার পরে প্রাণে হইল চৈতন্যের আধান,—চেতনা ঘনীভূত হইয়া রূপ ধরিল ব্যক্তি-পুরুষে, সেই ব্যক্তি-পুরুষ নিজেকে একদিন স্পষ্ট করিয়া চিনিতে পারিল 'আমি'রূপে; সেই আপনাকে চেনার পালা লইয়াই মানুষের জীবন, আর 'আমি'কে চেনার ভিতর দিয়াই চলে 'তুমি'কেও চেনা; সারা জীবনে এই 'আমি'কে জানারও আর শেষ নাই—'আমি'কে জানার মধ্য দিয়া 'তুমি'র রহস্যানুভূতিরও শেষ নাই। তাই—

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।
… … …
আমারে যে নামতে হবে
ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের
হাটে হাটে।
ব্যাবসা মোর তোমার সাথে
চলবে বেড়ে দিনে রাতে
আপনা নিয়ে করব যতই
বেচা কেনা॥

[ গীতবিতান, ৭৫ ]

সৃজ্যমান বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে নিজের 'আমি'টিও যে সৃজ্যমান হইয়া উঠিতেছে এই বোধ বহুদিন হইতেই কবিমনকে অধিকার করিয়াছিল। একখানি পত্রে এ বোধ প্রকাশ পাইয়াছে এইভাবে,—"এদিকে আমার জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইট নিয়ে গড়ে তুলছে। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে দেখি, তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্তসৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে—প্রত্যেক পদটা বানান করে পড়তে

হলে যেমন সমস্ত বাক্যটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না সেই রকম। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনব্যাপারের অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি, বুঝতে পারি যেমন গ্রহনক্ষত্র চন্দ্রসূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি একটা সৃজন চলছে—আমার সুখ দুঃখ বাসনা বেদনা তার মধ্যে আপনার স্থান গ্রহণ করছে।"

কবির নিজের ভিতরকার 'আমি' পুরুষটি যে ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারের ভিতর দিয়াই তাহার ব্যক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া চলিতেছে এই বোধটি কখনও কখনও কবির মধ্যে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তিনি অনেক সময় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মগ্ন হইয়া গিয়া সর্বত্র একটি নিরবচ্ছিন্ন 'আমি'কেই উপলব্ধি করিয়াছেন। এইজাতীয় একটি গভীর অনুভূতি লইয়াই রচিত 'কল্পনা'র 'অনবচ্ছিন্ন আমি' কবিতাটি।—

আজি মগ্ন হয়েছিনু ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে ;
যখন মেলিনু আঁখি, হেরিনু আমারে।
ধরণীর বস্ত্রাঞ্চল দেখিলাম তুলি,
আমার নাড়ীর কম্পে কম্পমান ধূলি।
অনন্ত-আকাশ-তলে দেখিলাম নামি,
আলোক-দোলায় বসি দুলিতেছি আমি।
আজি গিয়াছিনু চলি মৃত্যুপরপারে,
সেথা বৃদ্ধ পুরাতন হেরিনু আমারে।
অবিচ্ছিন্ন আপনারে নিরখি ভুবনে
শিহরি উঠিনু কাঁপি আপনার মনে।
জলে স্থলে শূন্যে আমি যত দূরে চাই
আপনারে হারাবার নাই কোনো ঠাঁই।
জলস্থল দূর করি ব্রহ্ম অন্তর্যামী,
হেরিলাম তাঁর মাঝে স্পন্দমান আমি।

রবীন্দ্রনাথের বর্ণিত এই সর্বব্যাপী অনবচ্ছিন্ন 'আমি'র তাৎপর্য কি? রবীন্দ্রনাথের নিজের ব্যক্তি-সত্তার ভিতরে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষণ, শুধু এক

জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষণ নয়—তাঁহার সকল অতীত বর্তমান ও অনাগত জুড়িয়া যে একটি অখণ্ড ধারা আছে এবং সেই ব্যক্তি-জীবনের ধারাটি যে বিশ্ব-জীবনের ধারার সঙ্গেই একযোগে আবর্তিত ইহাই এখানকার একমাত্র কথা নহে। এখানকার বোধ বা অনুভূতির মধ্যে আর একটি ব্যাপক ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। তাহা হইল এই যে, দ্রষ্টা একটি 'আমি' ব্যতীত নিখিলদৃশ্যের কোনই অর্থ নাই, —দ্রষ্টার দৃষ্টির মধ্যেই দৃশ্যের সকল তাৎপর্য নিহিত। দ্রষ্টা হিসাবে মানুষের অনন্ত-রহস্যময় চৈতন্যের মধ্যেই সকল দৃশ্য তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিশ্বটা সম্পূর্ণভাবেই মানুষের বিশ্ব। চৈতন্যের পরম বিকাশ মানুষের পুরুষচৈতন্যের (personality) ভিতরে; মানুষের সেই যে পুরুষচৈতন্য তাহাই হইল 'অনবচ্ছিন্ন আমি'; সেই পুরুষচৈতন্যের যোগেই ত জল-স্থল-শূন্য সকলের অস্তিত্ব; কারণ পুরুষচৈতন্যে—এই 'আমি'র মধ্যে যদি জল-স্থল-শূন্য অর্থ লাভ না করিত তবে নৈরার্থক্যেই ত এই সকল 'নাস্তি' হইয়া উঠিত। রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনা যখন ব্রহ্মাণ্ডকে লইয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তখন তিনি অনুভব করিয়াছেন তাঁহার ভিতরকার যে 'আমি' তাহা তাঁহার কাছে এই নিখিল পুরুষচৈতন্যের প্রতিভূ; তখনই তিনি অনুভব করিয়াছেন, এই 'আমি' পরিব্যাপ্ত সমস্ত কালে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে। শুধু এক ছাড়া আর যে রহিয়াছে নিখিল 'অস্তিত্বরহস্যরাশি' তাহার কেন্দ্রবিন্দুটিতে তাই রহিয়াছে এই আমি। 'আছি' না থাকিলে 'আছে' থাকে কি করিয়া? আগে 'আছি'-রূপে 'আমি'—তবে ত 'আছে'-রূপে আর সব। তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত যাঁহারা তাঁহারা এই 'আছি আর আছে'র অন্তহীন আদি প্রহেলিকা বুঝিতে পারেন না, তাই স্বীকারও করেন না।

তত্ত্ববিদ্ তাই  
কহিতেছে, 'এ নিখিলে আর কিছু নাই,  
শুধু এক আছে।' করে তারা একাকার  
অস্তিত্বরহস্যরাশি করি অস্বীকার।

কিন্তু কবি চাহেন সমস্ত মন-প্রাণ লইয়া এই 'অস্তিত্বরহস্যরাশি'কে স্বীকার করিতে, তাই তিনি আবিষ্কার করেন—

আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী,  
আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে। 'আছি আমি'

এ কথা স্মরিলে মনে মহান্ বিস্ময়
আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ এ হৃদয়
প্রকাণ্ড রহস্যভারে। [ উৎসর্গ, ২২ সং ]

কবি শুধু এইখানেই থামিবেন না। 'আমি' দেখি বলিয়াই বিশ্বের যাহা কিছু সকলের সার্থকতা এই অহংকারের সঙ্গে কবির যুক্ত হইয়া আছে আর একটি বৃহত্তর অহংকার, তাহা হইল এই, সৃষ্টির সকলের পিছনে এবং সৃষ্টির সকল জুড়িয়া যে 'পরম এক' রহিয়াছেন তিনিও যাহা কিছু দেখেন—এই 'আমি'র চোখ দিয়াই দেখেন। তিনি যে বিশ্বকে দেখিতেছেন আর তাহার ভিতর দিয়া নিজেকে দেখিতেছেন তাহা ত এই 'আমি'-কেন্দ্রটিকে অবলম্বন করিয়াই। এই 'আমি'-কেন্দ্রে প্রতিফলিত যে তাঁহার বিশেষ চেতনা, সে-চেতনার অন্তরালবর্তী তাঁহার যে একচেতনা তাহা ত নির্বিশেষ চেতনা, সেই নির্বিশেষ নিস্তরঙ্গ চেতনার মধ্যে যে বিশ্বকেও দেখা নাই, নিজেকেও দেখা নাই। কেবল নিস্তরঙ্গ চেতনা লইয়া আপনার মধ্যে সমাহিত আপনার যে সন্মাত্রে অবস্থিত 'পরম এক' রূপ তাহাকে তাঁহার 'সৎ'রূপও বলিতে পারি, আবার অসৎ রূপও বলিতে পারি—কিছু না দেখার মধ্যে নিজেই অসৎ। তাহার পরে যখন সেই 'তৎ' নিজেকে ঈক্ষণ করিতে চাহিলেন তখন এক বহু হইলেন, বহুর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 'আমি'তে। নিজেকে তিনি মানুষের ব্যক্তিচৈতন্যের ভিতর দিয়া অনন্ত ঐশ্বর্যে, অনন্ত মহিমায়—অনন্ত সৌন্দর্যে অবলোকন এবং আস্বাদন করিতেছেন; 'আমি' না হইলে এই দেখা যে তাঁহার সম্পূর্ণ হইত না তাহা নয়—সম্ভবত হইত না। এইখানেই 'আমি' হইলাম 'তুমি'র অপরিহার্য নিত্যদোসর, 'তুমি'র আত্মাবলোকন এবং তজ্জনিত আনন্দোপলব্ধির অবলম্বন বা সরিক। 'আমি'র এই অহংকারই হইল সর্বাপেক্ষা বড় অহংকার। এই 'আমি'রই পরিচয় দিয়াছেন কবি তাঁহার 'শ্যামলী'র 'আমি' কবিতায়। কবিতার মধ্যেই এখানে চলিয়াছে উত্তরপক্ষ এবং পূর্বপক্ষের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

আমারি চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।

গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে।

ইহার পরে কবি নিজেই পূর্বপক্ষ তুলিয়াছেন—

তুমি বলবে, এ যে তত্ত্ব-কথা,
এ কবির বাণী নয়।

কিন্তু কবির উত্তর—

আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।

এই কথাটি এখানে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে ; কবির যে অহংকার তাহা শুধু তাঁহার নিজেকে লইয়া নয়, এ অহংকার হইল 'সমস্ত মানুষের হয়ে' ; কারণ মানুষের ভিতরে ব্যক্তিচৈতন্যের নিত্যবিচিত্র বিকাশ যে 'অহংকার-পট' সৃষ্টি করিয়াছে সেই 'অহংকার-পট' না থাকিলে বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্পের কোনও মূল্যই থাকিত না।—

তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
না, না, না,—
না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ,
না-আমি, না-তুমি।
ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলি 'আমি'।

লক্ষ্য করিতে হইবে, অসীম যিনি তিনি যে সাধনা করিতেছেন আত্মাবলোকনের সে সাধনা হইল 'মানুষের সীমানায়'—মানুষের ব্যক্তিচৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া বা মানুষের ব্যক্তিচৈতন্যের ভিতর দিয়া নানা ভাবে 'মিত' হইয়া। তত্ত্বদর্শী যদি এই সৃষ্টির পরে আবার প্রলয়ের কথা তোলেন, যদি বলেন যে গ্রহ-গ্রহান্তরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিপর্যয়ে একদিন—

মর্ত্যলোকে মহাকালের মহাখাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,
গিলে ফেলবে দিনরাতের জমাখরচ ;
মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালি।

... ... ...

সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।

এই 'ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্ব'কেই কবি বলিবেন অনস্তিত্বের সামিল। মানুষের ব্যক্তিত্ব ব্যতীত বিধাতার এই ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না, তাই কবির ধারণা—

বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগযুগান্তর ধ'রে।
প্রলয়সন্ধ্যায় জপ করবেন—
"কথা কও, কথা কও",
বলবেন "বলো, তুমি সুন্দর",
বলবেন "বলো, আমি ভালোবাসি" ?

ইহা কবির প্রশ্ন নয়, ইহাই কবির মনঃপ্রাণের বিশ্বাস। সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্য দিয়া মানুষ জাগিয়া উঠিয়া আবার যে পর্যন্ত কথা না বলিবে সে পর্যন্ত আত্ম-অচৈতন্যের বিলুপ্তি হইতে বিধাতাও জাগিয়া উঠিতে পারিবেন না ; মানুষ যে পর্যন্ত তাহার চেতনার সমৃদ্ধি লইয়া আবার বলিয়া না উঠিবে 'তুমি সুন্দর' সে পর্যন্ত 'তুমি' বিধাতা কেমন করিয়া জানিবেন যে তিনি সুন্দর ; মানুষ চেতনায় ঘনীভূত হইয়া 'আমি'-রূপে যে পর্যন্ত ডাকিয়া না বলিবে 'আমি ভালোবাসি' সে পর্যন্ত 'তুমি' কি করিয়া জানিবেন তাঁহার নিজের প্রেমময়ত্বের সন্ধান ? তাই আবার আত্মজাগরণ আত্ম-অবলোকনের সাধনা করিতে হইবে 'মানুষের সীমানায়' আসিয়া মানুষের চৈতন্যে। মানুষের অনন্ত প্রাণপ্রেতিময় জীবনে এবং তাহার চৈতন্যের অনন্ত উল্লাসময় প্রস্ফুরণে সীমা ও অসীমের মিলন ঘটিয়াছে। অসীম

যিনি তিনি সীমার স্পর্শে স্পর্শে ব্যক্তিত্বহারা অনস্তিত্বের নৈঃশব্দ্য হইতে আত্মপরিচয়ের কলমুখরতায় নিত্যনূতন হইয়া জাগিয়া উঠিতেছেন,—অপর দিকে সীমা অসীমের স্পর্শ লাভ করিয়া করিয়া আপন সার্থকতা লাভ করিতেছে। উভয়তঃই রহিয়াছে একটা পূর্ণতার আদর্শ। 'পরম ব্যক্তিত্বে'র পূর্ণতা মানব-ব্যক্তিত্বের পূর্ণতায়, মানব-ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা আবার পরম ব্যক্তিত্বের স্পর্শে, যেখানে মানুষ অনুভব করিতে পারে—

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের 'পরে।

অনন্ত দেশ এবং অনন্ত কালকে অবলম্বন করিয়া এই যে এক বিশ্বপুরুষ এবং আর এক আমি-পুরুষের লীলা ইহার রহস্যই পরম বিস্ময়ে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে কবির মন। সেই বিস্ময়ের প্রকাশ দেখি তাঁহার গানে—

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে॥
তুমি আছ বিশ্বনাথ, অসীম রহস্য-মাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমানিলয়ে॥
অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি—আমি চাহি তোমা-পানে।
স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর—
এক তুমি, তোমা-মাঝে আমি একা নির্ভয়ে॥

নিমন্ত্রণ

[“… সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেরানিগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শ পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় নাই। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে।

… এইরূপ আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি ‘বিশ্বভারতী’ নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।

বৈশাখ ১৩২৬ রবীন্দ্রনাথ”

শিক্ষাসংস্কারের উদ্দেশ্যে এ দেশের শিক্ষাধারা পর্যালোচনার জন্যে ১৯১৭ সালে ‘কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন’ গঠিত হয়। এই কমিশন ‘স্যাড্‌লার কমিশন’ নামেই পরিচিত। কমিশনের তরফ থেকে সেই সময় দেশের বিভিন্ন মনীষী ও শিক্ষাবিদের কাছে এক সুদীর্ঘ প্রশ্নমালা পাঠানো হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এইসময়ে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত ব্যঙ্গরচনা ‘তোতাকাহিনী’ লেখেন। এবং ‘তোতাকাহিনী’র ইংরেজি অনুবাদ পৌঁছেছিল কমিশনের সভাপতি স্যার মাইকেল স্যাড্‌লারের কাছে।

যে যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর মনের সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রকৃত যোগ ঘটবার অবকাশ আদৌ মেলে না, সে শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই

সমর্থন করেননি। শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। এবং বিকশিত সে মনুষ্যত্ববোধ কোনোমতেই সমাজচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। মানুষের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সমাজজীবনের সমন্বয়, চিত্তশক্তির ভিতরে বাইরে যথার্থ মুক্তি এবং জড়তাবর্জিত প্রজ্ঞার সার্থক বিকাশই হল মনুষ্যত্বের সেই পূর্ণ বিকাশ। এ প্রধান উদ্দেশ্যকে একপাশে সরিয়ে রেখে যে যান্ত্রিক শিক্ষাবিধি বহুকাল ধরে ভারতের চিত্তবৃত্তিকে ক্রমাগত অসার্থকতার পথে টেনে নিয়ে চলেছে, তার বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভের অন্ত ছিল না। আদর্শ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এবং কর্মপন্থার মধ্যে এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা আগাগোড়া অকৃত্রিম ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শান্তিনিকেতন এবং বিশ্বভারতীর পরিকল্পনায় তারই প্রকাশ। আর, চূড়ান্ত অশিক্ষায় আচ্ছন্ন অগণিত পল্লীবাসীর সম্মুখে যথার্থ শিক্ষার আলোটি পৌঁছে দেবার যে সাগ্রহ চেতনাটি প্রথম যৌবন থেকেই তাঁর মনের মধ্যে ছিল তার প্রকাশ শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনায়।

> "শিলাইদা পতিসর এই সব পল্লীতে যখন বাস করতুম, তখন আমি প্রথম পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করি। তখন আমার ব্যবসায় ছিল জমিদারি। প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখদুঃখ নালিশ-আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। ··· তখন আমি যে জমিদারি ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিকবৃত্তি ক'রে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তারপর থেকে চেষ্টা করতুম, কী করলে এদের মনের উদ্বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে।
>
> এই সব কথাই যখন ভেবে দেখলুম, তখন এর কোনো উপায় ভেবে পেলুম না। যারা বহুযুগ থেকে এইরকম দুর্বলতার চর্চা করে এসেছে, যারা আত্মনির্ভরে একেবারেই অভ্যস্ত নয় তাদের উপকার করা বড়ই কঠিন। তবুও আরম্ভ করেছিলুম কাজ। ···
>
> আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া ক'রে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না। পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। ···"

* * *

"সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেকগুলি ব্যাপারের সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের একটাকে পৃথক করে নিলে ফল পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ-ভালো হয়ে ওঠে। স্বদেশের সেই ভালোর রূপটি আমরা চোখে দেখতে চাই।"

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতাবোধের সঙ্গে যে মৌল চেতনাটি জড়িয়ে আছে, তাতেও এরই সমধর্মী চিন্তাধারার অস্তিত্বকে গভীরভাবে অনুভব করা যায়। মূলতঃ, চিত্তবৃত্তির যে সর্বাঙ্গীণ বিকাশটির কথা তিনি বারবার বলেছেন, তারও গোড়ার কথা এই ভিতর থেকে গড়ে তোলার বিষয়টি। আমাদের দেশে যথার্থ শিক্ষার অভাবে দিনের পর দিন মানুষের প্রাণশক্তির শোচনীয় অপচয় কবির মনকে প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। সোভিয়েত রাশিয়া পরিদর্শন করে তিনি তাই সবচেয়ে বেশী অভিভূত হয়েছিলেন সেখানে মানবশক্তির অবাধ প্রকাশ দেখে।

"রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আটবছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তারা সমাজের অন্ধকুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এতকালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। ..."

রাশিয়ায় সমাজবিপ্লবকে কবি বিপুল উচ্ছ্বাসে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সে-দেশ দেখার পর। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হল, রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তনের ফলেই সে-দেশে এই মানসবিপ্লব সম্ভব হলেও, কবির মনে তার ফলাফলটিই বেশী করে স্থান পেয়েছে—উপলক্ষ্যটা নয়। বহুকালের অক্ষম অসহায় ভাগ্যনির্ভর মূঢ় মানুষের এত দ্রুত এমন ভাবান্তরই তাঁর মনে গভীরভাবে সাড়া জাগিয়েছে। আর তারই পাশাপাশি ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করে কবি গভীর মর্মবেদনায় বলেছেন,

"আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যতকিছু দুঃখ আজ

অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য—সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। সাইমন কমিশনে ভারতবর্ষের সমস্ত অপরাধের তালিকা শেষ করে ব্রিটিশ শাসনের কেবল একটিমাত্র অপরাধ কবুল করেছে। সে হচ্ছে, যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা-বিধানের ত্রুটি।"

আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার চূড়ান্ত অসারতার কথা বহু ভাবে কবি প্রকাশ করেছেন। যে চিত্তবৃত্তির বিকাশের জন্যেই শিক্ষা, সেই চিত্তবৃত্তিই যদি বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে এসে জড়তা এবং মূঢ়তার অন্ধকারে হারিয়ে যায়, তবে তার চেয়ে বিড়ম্বনা আর নেই। কৃত্রিম এবং যান্ত্রিক সেই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তিনি আপোষ করেননি। এর 'কলে-ছাঁটা' পুঁথিগত বিদ্যাকে তিনি যথার্থ জ্ঞানের মর্যাদা দেননি।

"ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে।"

এই কলে-ছাঁটা বিদ্যায় উকিল মোক্তার ডাক্তার হাকিম তৈরী হওয়া কঠিন নয়। এদেশে তা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটি বারে বারে ব্যর্থ হয়েছে। মনের গ্রহণীবৃত্তিটিই যখন বন্ধনদশায় ছটফট করছে তখন গ্রহণ করবার প্রশ্নই আসে না। শিক্ষার্থীর কাছে বিদ্যালয় এক দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা হয়ে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শৈশবকালে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার তিক্ততাও বড় কম নয়। 'বিশ্বভারতী' গ্রন্থের একস্থানে কবি বলেছেন,

"... পূর্বে সমাজ থেকে দূরে কোণে মানুষ হয়েছি, আমি যে পরিবারে মানুষ হয়েছিলাম, লোকসমাজের সঙ্গে সংযোগ ছিল তার অল্প। যখন সাহিত্যে প্রবৃত্ত হলাম সে সময়ও নিভৃতে নদীতীরে কাটিয়েছি। এমন সময় এই বিদ্যালয়ের আহ্বান এল। এই কথাটা অনুভব করেছিলাম, শহরের খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে মানবশিশু নির্বাসনদণ্ড ভোগ করে, তার শিক্ষাও বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ। গুরুর শাসনে তারা অনেক দুঃখ পায়, এ সম্বন্ধে আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা আছে।"

শিশু রবীন্দ্রনাথের মনের উপর বিদ্যালয়ের পরিবেশ কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, জীবনস্মৃতি গ্রন্থে তার বর্ণনা আছে।[১] কবি সারাজীবনেও সে-বিভীষিকাকে ভুলতে পারেননি। নর্মাল স্কুলের 'শিক্ষকদের মধ্যে একজনের' কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি হরনাথ পণ্ডিত। এই ভীতিপ্রদ শিক্ষক-মহাশয়ের কথা বহুকাল আগে 'সখা ও সাথী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। জীবনস্মৃতিতেও উল্লেখ করেছেন কবি নিজে। ইস্কুলের পরিবেশ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা তাঁর শৈশব থেকেই সুরু। পরবর্তীকালে পুত্র রথীন্দ্রনাথের শিক্ষার ব্যবস্থা করবার সময় তিনি পুত্রকে কোনো স্কুলে না দিয়ে কলকাতা থেকে শিলাইদহে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। পুত্রের শিক্ষার ভার নিজেই নিয়েছিলেন।

শিক্ষার মধ্যে যথার্থ মুক্তির আনন্দ না থাকলে তা একটা দুর্বহ বোঝা হয়ে

[১] "ক্রমশ নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থা পার হইয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে। ··· অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে, ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তার দিকের এক জানালার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। মনে মনে হিসাব করিতাম, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর—আরও কত বৎসর এমন করিয়া কাটাইতে হইবে। শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিৎ ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সম্বৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম। ···

··· এমনি করিয়া সেই ক্লাসে এক বছর যখন কাটিয়া গেল তখন মধুসূদন বাচস্পতির নিকট আমাদের বাংলার বাৎসরিক পরীক্ষা হইল। সকল ছেলের চেয়ে আমি বেশী নম্বর পাইলাম। আমাদের ক্লাসের শিক্ষক কর্তৃপুরুষদের কাছে জানাইলেন যে, পরীক্ষক আমার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার আমার পরীক্ষা হইল। এবার স্বয়ং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ পরীক্ষকের পাশে চৌকি লইয়া বসিলেন। এবারেও ভাগ্যক্রমে আমি উচ্চস্থান পাইলাম।" [ জীবনস্মৃতি ]

* * *

"কান্নার জোরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে অকালে ভর্তি হইলাম। সেখানে কী শিক্ষালাভ করিলাম মনে নাই কিন্তু একটা শাসনপ্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি স্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত। এরূপে ধারণাশক্তির অভ্যাস বাহির হইতে অন্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে কিনা তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচ্য।" [ জীবনস্মৃতি ]

* * *

"পাঠশালায় মূর্খতার জন্যে ছাত্রদের 'পরে যে নির্যাতন ঘটে তার বারো আনা অংশ গুরুমশায়ের নিজেরই প্রাপ্য। ··· আজ পর্যন্ত মনে আছে চরম শাসন থেকে এমন অনেক ছাত্রকে রক্ষা করেছি যার জন্যে অনুতাপ করতে হয়নি। রাষ্ট্রতন্ত্রেই কী আর শিক্ষাতন্ত্রেই কী, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ।" [ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ]

উঠতে বাধ্য। শৈশবকাল থেকে মানবপ্রকৃতির বিকাশের প্রতিটি স্তরে প্রকৃতির সান্নিধ্য এবং সাহচর্যকে কবি অপরিহার্য ব'লে বিশ্বাস করতেন। বাঁধাধরা নিয়মের শুষ্কতার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত জ্ঞানের সাধনা হয় না। মস্তিষ্ক এবং হৃদয়বৃত্তির বিকাশের পক্ষে আমাদের দেশের শিক্ষাবিধিকে সবচেয়ে বড়ো বাধা ব'লে অনুভব করেছিলেন ব'লেই শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীর মাধ্যমে শিক্ষার যথার্থ আদর্শকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর এক ভাষণে তিনি বলেছেন,

> "আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকেই এর আরম্ভ-কালের অবস্থাটা দেখেননি। তখন আর যাই হোক, এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। এখানে যে আহ্বানটি সবচেয়ে বড়ো ছিল সে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বান, ইস্কুল মাস্টারের আহ্বান নয়। ··· এখানে বালকেরা যতদূর সম্ভব মুক্তির স্বাদ পায়। আমাদের বাহ্যমুক্তির লীলাক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি, সেই ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত। ···"

* * *

> "এখানকার কাজে প্রথমে যে উৎসাহ এসেছিল সেটা সৃষ্টির আনন্দ; শিক্ষাকে লোকহিতের দিক থেকে জনসেবার অঙ্গ করে দেখা যায়—সেদিক থেকে আমি এখানে কাজ আরম্ভ করিনি। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষ হয়ে এখানকার ছেলেদের মন বিকশিত হবে, আবরণ ঘুচে যাবে, কল্পনায় এই রূপ দেখতে পেতাম। ···"

রবীন্দ্রনাথের এই কল্পনা যে শান্তিনিকেতন-আশ্রম-বিদ্যালয়ে প্রথম থেকেই বাস্তব রূপ নিয়েছিল তার প্রমাণ আছে স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্টে। কমিশনের সভাপতি স্যাড্‌লার সাহেব শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করে লিখেছিলেন, "বাংলাদেশে বিদ্যালয়কে খুব সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাদানের স্থান ব'লে মনে করা হয়। বিদ্যালয়ের সামাজিক গুরুত্বের দিকটা এতে অবহেলিত হয়। ··· পাঠশালায় এসে কোনো ছাত্র কখনও মনে করবে না যে বাঁধাধরা নিয়মে নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে এসে কিছুটা লেখাপড়া করেই তার কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। বরঞ্চ পাঠশালাকে একটি সমাজের প্রতীক মনে করে সেই সমাজটির প্রতি সে তার দায়িত্বের আনুগত্য অনুভব করবে এবং তার বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তার সঙ্গে নানা ভাবে সক্রিয় সংযোগ স্থাপন করে আগ্রহ ও দায়িত্ববোধের ভিতর দিয়ে যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ করবে। ভারতে এইজাতীয় শিক্ষাবিধির কল্পনা একেবারে অবাস্তব নয়। কারণ, বোলপুরে

(শান্তিনিকেতনে) এই শিক্ষাব্যবস্থার অতি সার্থক একটি রূপের নিদর্শন দেখা যাচ্ছে।"[২]

স্যাড্‌লার কমিশনের এই রিপোর্টের সময়ে শান্তিনিকেতনের শৈশবকাল চলছে। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা এর বছর চারেক পরে (ডিসেম্বর, ১৯২১)।

বহুকালের প্রচলিত রীতিনীতির সম্পর্কে মানুষের একটা সংস্কারগত মোহ থাকে। তা ভালো কি মন্দ সে-বিচারের কথাটা ভাবতেও তার প্রবৃত্তি থাকে না। প্রচলিত নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হলেই কল্পিত সর্বনাশের আতঙ্কে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সমাজমানসের এই অবস্থাটি সমস্তরকম বিড়ম্বনার মূলে। অথচ সমাজজীবনের সৃষ্টি মানুষের এগিয়ে চলবার পথটি বন্ধ করবার জন্যে নয়, বরঞ্চ তার বিপরীত। মাটির সঙ্গে উদ্ভিদের যে সম্পর্ক, সমাজের সঙ্গে সেই সম্পর্ক মানুষের। কিন্তু সমাজচেতনার মধ্যে সুস্থতার বালাই যখন থাকে না, তখন যে-কোনো অগ্রগতির প্রচেষ্টার উপরেই অজস্র আঘাত এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এর কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন,

> "··· সমাজ যেখানে জীবনপ্রবাহের সহিত আপন স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্যের পথ একেবারেই খোলা রাখে নাই, সুতরাং পুরাতন কালের ব্যবস্থা যেখানে পদে পদে বাধাস্বরূপ হইয়া তাহাকে বদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, সেখানে মানুষের যে শিক্ষাশালা সকলের চেয়ে স্বাভাবিক ও প্রশস্ত সেটা যে আমাদের পক্ষে নাই তাহা নহে—তাহা তদপেক্ষা ভয়ংকর, তাহা আছে অথচ নাই, তাহা সত্যকে পথ ছাড়িয়া দেয় না এবং মিথ্যাকে জমাইয়া রাখে। এ সমাজ গতিকে একেবারেই স্বীকার করিতে চায় না বলিয়া স্থিতিকে কলুষিত করিয়া তোলে।"

একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলে-ছাঁটা' বিদ্যা, অন্যদিকে সমাজচেতনায় এই শোচনীয় দৈন্য, এ দু'য়ের আমূল সংস্কার মাত্র নয়, একেবারে পুরোপুরি পরিবর্তনকেই তিনি প্রয়োজন ব'লে দৃঢ় ঘোষণা করেছেন। অন্য কোনো বিকল্প নেই।

[২] In Bengal a school is thought of too narrowly a place of instruction. Its possibilities as a society is overlooked. ... At school he (a student) ought to feel himself not a mere unit who has to learn things at an appointed time and place ; ... but a member of a community, responsible for service to it, an active participant in its various occupations attached to it, by a network of interests and responsibilities. It cannot be said that this side of education is impracticable in India. To give one example alone, it is highly developed at Bolpur.

রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় 'নেশন'-ভিত্তিক মানসিক গোঁড়ামিকে রবীন্দ্রনাথ আদৌ সমর্থন করেননি। দেশ-কালের অতীত চিরন্তন মানবসত্যকে তিনি নেশন-চিন্তার বহু উপরে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতা অর্থাৎ জাতীয়-ভাব-পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন সবচেয়ে বেশী। কারণ বৃহত্তর মানবতাবোধের মানসিক ভিত্তিভূমিটি সুদৃঢ় হওয়ার প্রয়োজনেই যে-কোনো দেশের বা জাতির শিশুর পক্ষে তার নিজের দেশেকে, দেশের ইতিহাসকে, সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে জানা অপরিহার্য। আপাতবিচারে এ দুটিকে স্ববিরোধী মনে হতে পারে। কবি নিজেই সে প্রসঙ্গ তুলে তার উত্তর দিয়েছেন,

> "এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। তাই যে কথাটা একবার আভাসে বলেছি সেইটে আর একবার স্পষ্ট বলা ভালো। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি ; গিলে খাওয়াকেই সে এক করা ব'লে প্রচার করে। ··· মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হয়। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে ; আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতিবিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।"

রবীন্দ্রনাথের 'জাতীয়-ভাব-পুষ্ট' শিক্ষার আদর্শকে 'ন্যাশনাল' শব্দটির দ্বারা চিহ্নিত করতে গেলে একটা ভুল হবার আশংকা আছে। কারণ, 'নেশন' চিন্তার উদ্ভব সামগ্রিক মানবতাবোধ থেকে নয়। ধনতন্ত্রী এবং সাম্রাজ্যতন্ত্রী য়ুরোপের রাজনীতিতে বিভিন্ন স্বার্থের অস্তিত্বরক্ষার চেষ্টায় মূলত রাজনৈতিক 'নেশনবাদ' জন্ম নিয়েছিল। ভৌগোলিক বিভাগটাই এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু 'যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই'। শিক্ষা ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে বহু রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেই বৃহত্তর মানবসত্যের কথাকে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন।

আগে নিজের ঘরকে যথার্থভাবে না জানলে বাইরের কথাকে জানা যায় না। আমাদের দেশে সেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিরাট অসংগতিটা

রবীন্দ্রনাথের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল, তার বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদ তাঁর কণ্ঠে বহুবার ধ্বনিত হয়েছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব তিনি দিয়েছিলেন। ক্ষুব্ধচিত্ত রবীন্দ্রনাথ বললেন,

> "আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।"

* * *

> "... যারা বাংলা জানে, ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না। এত বড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথায় আছে?"

শিক্ষার্থীর মন যাকে সবচেয়ে সহজভাবে গ্রহণ ক'রে সবচেয়ে গভীরভাবে আত্মস্থ করতে পারবে সেই জ্ঞানের বিষয়কে একটা কৃত্রিম উপায়ে কোনোমতেই তার মনে অনুপ্রবিষ্ট করানো যায় না। মাতৃভাষার বাহন এক্ষেত্রে সবচেয়ে অকৃত্রিম।

প্রাচীন ভারতের আশ্রম বা তপোবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রবণতা ছিল, এ-কথা সত্য। শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীর পরিকল্পনায় কবির সেই প্রবণতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে যেখানে চিত্তোন্মেষের সঙ্গে ধর্মব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা তাঁর চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান বিষয়, কেবলমাত্র সেইটুকুর দ্বারা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সম্পর্কিত বক্তব্যের মূল্যায়ন করতে গেলে তা একদেশদর্শী হয়ে পড়বার আশংকা আছে। যথার্থ শিক্ষা এবং চেতনার অভাবে যেখানে মানবাত্মার নিরন্তর অবমাননা চলছে, যেখানে "ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না"-- দেশের সেই মর্মকেন্দ্র পল্লীগ্রামে যে অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য কবির চিত্তকে বিপুল বেদনায় ভারী করে তুলেছিল, তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তন সেখান থেকেই সুরু করবার বাসনা কবি আন্তরিকভাবে ঘোষণা করেছেন। গভীর ব্যথিত চিত্তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"সকল রকম শক্তির কাছেই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রকৃতি উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধরে যে-সকল উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না।"

তিনি উপলব্ধি করেছেন, "ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা।" এই অশিক্ষা যে নিছক 'আধ্যাত্মিকতার অভাব'—এমন একটা ধারণা করে নেওয়া সংগত মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, ধর্মের বৃহত্তর উপলব্ধি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঊর্ধ্বে চিলেকুঠুরিতে রেখে দেওয়া বাস্তববহির্ভূত স্বতন্ত্র একটা কিছু নয়। 'মনুষ্যত্ববিকাশ' বা 'চিত্তের মুক্তি' বলতেই তার একটা অধ্যাত্মতত্ত্বগত ব্যাখ্যা না হলেই নয়, এমন কোনো অনুশাসন অন্তত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক মতবাদে একান্ত করে বলা নেই। দেশের অগণিত নিরক্ষর নিরন্ন অদৃষ্টবাদী মানুষ থেকে সুরু ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত প্রয়োজনমতো ব্যবহারিক ও মানসিক উভয়বিধ জ্ঞানের প্রসারকেই তিনি চেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন—পাশাপাশি এই দুটি শিক্ষাশালার ভিতর দিয়ে তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ ঘটেছে। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের বা প্রচেষ্টার বাস্তব পটভূমিকে যথার্থ মর্যাদায় না দেখা একটা প্রকাণ্ড ভুল। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে এই কথাটিই সবচেয়ে বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েছিল, দেশব্যাপী সার্থক শিক্ষা চাই, যে শিক্ষায় মানুষ জড়তার দাসত্ব থেকে যথার্থ মুক্তি পায়।]

# জাতীয় শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের স্থান

## প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

দেড়শো বছর হয়ে গেছে—আমরা ইংরেজিভাষাকে আমাদের মনের মুক্তি ও জীবিকার সহায় বলে মেনে নিই। 'ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত' এক রাষ্ট্র একআত্ম হয়েছে এই ইংরেজিভাষার গুণে। আজ সেই ভাষাকে অপসারিত করবাব প্রস্তাবেই দেশমধ্যে ভাষা-বিভীষিকা দেখা দিয়েছে—সেটা আদৌ শুভলক্ষণ নয়। রবীন্দ্রনাথের বাংলাপ্রীতি সুবিদিত; তবুও তিনি জানতেন বাংলার সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও ভারতের সঙ্গে বিশ্বের যোগসাধন করেছে ইংরেজিভাষা। ১৯১৭ সালের শেষে স্যাডলার কমিশন আসেন বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তদারক করবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্যাডলার যখন দেখা করতে আসেন তখন তিনি বলেন যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান বিতরণ করবার ব্যবস্থা করা উচিত; কিন্তু ইংরেজি থাকবে আবশ্যিক ভাষা। ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বিশ বৎসর শান্তিনিকেতনের যাবতীয় কাজকর্ম, দপ্তরখানার হিসাবপত্র—বাংলার মাধ্যমেই করা ছিল রীতি। কিন্তু বিশ্বভারতী স্থাপন করে, যখন তিনি ভারতের ও পরে ভারতের বাহির থেকে পণ্ডিত ও বিদ্যার্থীদের আহ্বান করলেন, তখন থেকে বিশ্বভারতীর যাবতীয় কাজে ইংরেজিভাষাই গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তববোধের উপর তাঁর আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই তিনি ইংরেজিকে মেনে নিয়েছিলেন।

ইংরেজিভাষা শেখাবার দিকে ইংরেজ কোম্পানির শাসকগোষ্ঠীর মন যায়নি প্রথমদিকে; বাঙালি স্বেচ্ছায় সেটা আরম্ভ করে। রামমোহন রায় লর্ড

আমহার্স্টকে ইংরেজিভাষা প্রচলিত করবার জন্য যে আবেদনপত্র পেশ করেন, তা সরকারীভাবে স্থপারিশ পায় লর্ড মেকলের ডেস্প্যাচে। ১৮৩৫ থেকে ইংরেজি রাজভাষা বলে চালু হলো। তার দশ বৎসর পর পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বিভাগ সরকার স্থাপন করলেন ;—উড্ সাহেব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর ডেস্প্যাচে লিখে পাঠালেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই।

পলাশীর যুদ্ধ ও সিপাহী-বিদ্রোহের মধ্যে একশ' বৎসরের ব্যবধান—এর মধ্যে বাংলাদেশে 'মধ্যবিত্ত' নামে একটা সমাজ গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশের সংস্কারাবদ্ধ সমাজভাবনায় ছিল দুটো জাত্—ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, আদিম যুগের আর্য-অনার্য শব্দদ্বয়ের বিকৃত রূপ। শূদ্রের মধ্যে শাস্ত্রকারগণ নানা স্তর সৃষ্টি করে দেন। সমাজের এই তথাকথিত দুটো 'বর্ণের' মধ্যে ব্রাহ্মণরা সংস্কৃত পড়তেন ; যজন যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা নিয়ে থাকবার শাস্ত্রীয় নির্দেশ ছিল তাঁদের উপর। তারপর এই এক শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় সমাজের যুগান্তর হয়ে গেল। তাঁদের শিক্ষাদীক্ষার মান ও মূল্যের ( ভ্যালু ) এমন বদল হয়ে গেল যে প্রাচীন ও নতুনের ভাষা ও ভাবনার মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া গেল না ; পূর্বকালে উচ্চনীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ধর্মবিশ্বাস, সমাজ-ভাবনা, বিদ্যা ও জ্ঞানবুদ্ধির মধ্যে গুণগত ভেদ ছিল না—কেউ বেশি জানতেন, কেউ কম জানতো। নতুন যুগের শিক্ষায় সেই ব্যবধানটা হলো গুণগত—মুষ্টিমেয় লোক জানলো আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে—অবশিষ্টরা থাকলো পুরাতনের জীর্ণ সংস্কারের মধ্যে। ফলে যথার্থ class বা শ্রেণীগত ভেদ স্থরু হলো এই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পর থেকে। ছিল জাত্ বা বর্ণের ভেদ—তার উপর এখন হলো জ্ঞানগত ভেদ।

এই মানসিক সংগ্রাম ও বিপ্লবের পাশাপাশি সমাজে চলছে অনেক বস্তুগত সমস্যা। শিল্পজগতে ও ভূমিবণ্টন বিভাগে বিপ্লব ঘটেছে কোম্পানির শাসনকালে। ফলে সমাজগঠনের মূলে পড়েছে আঘাত। ব্রাহ্মণ শূদ্র দুই বর্ণের লোকেরাই এই অর্থনৈতিক বিপ্লবের সম্মুখে জীবিকা অর্জনে অবতীর্ণ হলো। এই প্রতিঘাতে বর্ণহিন্দু সংস্কৃত ছেড়ে ইংরেজিশিক্ষা স্থরু করতে গিয়ে দেখে, ভাষার রাজ্য থেকে তারা কখন ভাবের রাজ্যে উপনীত হয়ে গেছে। সেই ভাবের উন্মাদনায় সে ইংরেজিভাষার সঙ্গে পেলো ইংরেজিয়ানা ; প্রাচ্য খৃষ্টধর্মের সঙ্গে সন্ন্যাসী খৃষ্টকে পেলো না—পেলো ইংরেজ মিশনারীদের ঐতিহাসিক খৃষ্টানী ও

বিলাতিয়ানা। ডিরোজিও, আলেকজাণ্ডার ডাফ্, হেয়ারের প্রভাব—নানাভাবে দেখা দিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন-মাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণেতর তথাকথিত শূদ্র সমাজের অর্থনীতিক জীবনে এসেছে নিদারুণ দারিদ্র্য। সেখানেও লোকে পিতৃ-পিতামহের সংস্কারগত বৃত্তির বাঁধাপথ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, ইংরেজের নতুন শহরে এসে ভিড় জমাচ্ছে। অর্থ এলো তাদের ঘরে—তারাও ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণীভুক্ত হলো। এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা হয়েছে বাংলাদেশের মেরুদণ্ড। এদের মধ্য থেকে নূতন আভিজাত্য গড়ে উঠলো টাকার জোরে—আগে সেখানে বংশমর্যাদা বা ব্রহ্মণ্যত্বের গৌরবে সমাজের 'অভিজাত' দলভুক্ত ছিল লোকে—তারা হটতে সুরু করছে—নতুন শিক্ষা ও নতুন অর্থনীতির চাপ ও প্রসারের ফলে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে যখন বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে এখানে বিদ্যাপীঠ গড়ে উঠলো না—এনে বসানো হলো বিদেশের অনুকরণে, এদেশের শাসক ও শোষকদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজে সহায়তা করবার জন্য। বিদ্যাটা হলো পথ্য। জ্ঞান অপেক্ষা বল এবং মানের জন্যই তার প্রতি টান। তখন থেকে দেশে শিক্ষার তিনটা স্তর বেশ স্পষ্ট করে ফুটে উঠলো। প্রাচীনপন্থীরা বা পুরাতন সমাজনীতিতে যাঁরা ব্রাহ্মণবংশীয়—তাঁরা তাঁদের টোল, চতুষ্পাঠীর সীমানা পার হলেন না ; পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও সমাজচেতনাকে ঠেকিয়ে রাখলেন স্পর্শ থেকে। মধ্যবিত্তরা জীবিকার জন্য ইংরেজি শিখতে গিয়ে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে পেলো য়ুরোপীয় সংস্কৃতির চাবিকাঠি। তাঁদের মনের জানলা গেল খুলে—ঘরের আব্রু গেল চলে। মনটা হলো ইংরেজ-ঘেঁষা—বুদ্ধি-বিবেচনাও হলো তাদেরই অনুকরণে গড়া। মেকলের সময় থেকে সুরু হয় বাঙালি মধ্যবিত্তের মনের রং বদলানো। মেকলের বিশ বৎসর পর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেখানে ভারতীয় সংস্কৃতি পাঠ্য হলো না। লণ্ডনের হুবহু অনুকরণে তোতাপাখীর শিক্ষা সুরু হলো। স্কুলে শেষপরীক্ষায় বাংলা পড়তে হয় না—স্কুলে, কলেজে, অপিসে আদালতে ইংরেজিভাষা ও ইংরেজিয়ানা হলো কায়েম। দেখতে দেখতে সমাজে তিনটি স্তর স্পষ্ট হয়ে উঠলো—প্রাচীন সংস্কৃতপন্থী, মধ্যবিত্ত ইংরেজিপন্থী ও নিরক্ষর বা স্বল্প-বাংলা-শিক্ষিত জনতা। মুসলমান রাজদরবারে পার্সি জেনে যাঁরা ধনমান পেয়েছেন—তাঁদেরই বংশধারায় এখন ইংরেজিনবীশ হয়েছে। এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের অবস্থাই শোচনীয়—তারা না ঘরকা, না ঘাটকা। প্রাচীনের

প্রতি অন্ধবিশ্বাস শাস্ত্রভয়ে ছাড়তে পারেনি—পাশ্চাত্ত্য ভাবনা পুরোপুরি গ্রহণ করেও সার্থক হতে পারেনি। মানসিক সংগ্রাম এদেরই বেশি। এর উপর আছে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা এদের মানসিক উদ্‌ভ্রান্তির জন্য দায়ী।

এখন চিন্তাশীলদের মনে এই প্রশ্ন উঠলো—এই যে আমরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পিছু পিছু ছুটছি—এ সবই কি আমাদের জীবনে সর্বকল্যাণকর হয়েছে? এতদিন আমরা যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা—তার পাঠক্রম, তার পদ্ধতি অন্ধভাবে মেনে এসেছিলাম—তার প্রতি সন্দেহ হলো। এতকাল ইংরেজি পড়ে, ইংরেজিয়ানা করে—আমরা তো ইংরেজের মতো দক্ষ ও বলশালী—বিজ্ঞানী ও শিল্পী কিছুই হতে পারলাম না। তাহলে এই শিক্ষা কি অবিমিশ্র মঙ্গলপ্রদ—এই সন্দেহ জাগতে সুরু করলো কয়েকটি ভাবুক হৃদয়ে।

জাতীয় চিত্ত-উদ্বোধন-ইতিহাসের সঙ্গে এই জাতীয় শিক্ষাভাবনা অঙ্গাঙ্গী-ভাবে যুক্ত। উনবিংশ শতকের শেষ পনেরো বৎসর আমাদের দেশে ব্রিটিশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতির সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। এই পর্বে কনগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়—মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ভারতের অর্থনীতির নতুন বুনিয়াদ পত্তন করেন; মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে হিন্দুজাতীয়তার চেতনা জাগ্রত হয়। মোট কথা, এতকাল ইংরেজের শাসনকে যে অবিমিশ্র শান্তি ও সমৃদ্ধির উৎস বলে লোকে মনে করে আসছিলো—তাতে এসেছে সন্দেহ—প্রশ্ন জাগছে। লোকে মুখর হয়ে সমালোচনায় প্রবৃত্ত। জীবনের সকল কোঠায় এই সমালোচনা। এই সমালোচনার ধারা নানা রূপে দেখা দিল। রাজনীতি কনগ্রেস-ধারায়, হিন্দুধর্ম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধারায়, ধর্ম ও দর্শনতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য মাধ্যমে চললো। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমালোচনায় প্রথম স্পষ্ট ভাষণ শোনা গেল রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে ( ১৮৯৬ )।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ, ভারতীয়দের জীবনে তা ব্যর্থ হয়েছে—এ ভাবনা ভারতের নানা স্থানে দেখা দিল উনবিংশ শতকের শেষে। বিংশ শতকের প্রত্যূষে তা রূপ নিল নানা স্থানে বিপ্লববাদ মন্ত্রের সঙ্গে। আসলে প্রাচীন সংস্কৃতি মূল্যায়নের জন্য এই শিক্ষা সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ বোলপুর-শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম, লালা মুন্সীরাম ( স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ) হরিদ্বারে গুরুকুল ও গঙ্গার তীরে বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দ মঠ স্থাপন করলেন। প্রথম দুটি প্রতিষ্ঠান ঔপনিষদিক ও বৈদিক সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়নের (revalution of old values) জন্য স্থাপিত হলো। বেলুড় মঠ মধ্যযুগীয় মঠের আদর্শে গড়া

হলো—বিদ্যায়তন গড়া হয়েছে খুব আধুনিক কালে মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বা লালা মুন্সীরাম যে বিদ্যাশ্রম স্থাপন করলেন, তাদের ঠিক 'জাতীয় শিক্ষা' বলা যায় না; তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ধর্মমত অনুসারে শিক্ষা প্রবর্তন করেন বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মুখপাত্র রূপে। এগুলিকে ধর্মশিক্ষায়তন বলতে পারা যায়; জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বলা যেতে পারে না। বরং ঊনবিংশ শতকে যে ধর্মহীন শিক্ষা দেশমধ্যে প্রচার ও প্রসারের ফলে হিন্দুর যে ধর্মবোধ অসাড় হয়ে আসছিলো—এসব তারই পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা মাত্র বলবো। প্রসঙ্গক্রমে বলতে চাই যে এই ধর্মশিক্ষা দেবার চেষ্টা হিন্দুর (ব্রাহ্ম, আর্য, সনাতনী) মধ্যেই সীমিত ছিল না; মুসলমান সমাজে ইসলামী শিক্ষা পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার সঙ্গে মিশিয়ে প্রসারের চেষ্টা সুরু করেন স্যর সৈয়দ আহমদ—আলীগড়ে এংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজ স্থাপন করেন এই একই উদ্দেশ্যে—ধর্মের পুনর্মূল্যায়ন। সকলেরই আন্তরিক মনোভাব, শিক্ষার বুনিয়াদ হবে ধর্মনিষ্ঠ। বলা বাহুল্য, এসব আন্দোলনের দ্বারা শিক্ষা 'জাতীয়' রূপ গ্রহণ করতে পারতো না। এইসব প্রতিষ্ঠানই স্থাপিত হয় ইংরেজিশিক্ষা ইতিহাসের তৃতীয় পাদে—অর্থাৎ সমালোচনা পর্বের পর—রবীন্দ্রনাথ ও লালা মুন্সীরাম অগ্রণী হয়েছিলেন।

কিন্তু জাতীয় শিক্ষার ফল্গুধারা চলছে বাংলাদেশের মধ্যে—যা রূপ নিল 'জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ'(National Council of Education) রূপে। রাজনৈতিক কারণ এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রত্যক্ষ কারণ হলেও, এর পটভূমে ছিল ডন্ সোসাইটির (Dawn Society) ভাবুকদের শিক্ষাজিজ্ঞাসা। ভারতে সামুদায়িক জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনার তাঁরাই প্রথম ছক কাটেন; রবীন্দ্রনাথ এই পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু সামুদায়িক পরিকল্পনা রূপ দেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ডন্ সোসাইটির স্রষ্টা। কিন্তু সেখানেও পরিকল্পনার সঙ্গে কল্পনার মিশ হয়েছিলো বেশি করে; আর বিশেষ একটা রাজনৈতিক মতবাদের বাহনরূপে তার আবির্ভাব হয় বলে সেই রাজনৈতিক আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাপরিকল্পনার উপর যবনিকাপতন হলো। এই 'জাতীয়' আন্দোলনের মুখে বাস্তববাদী দল বলেছিলেন, ভারতের ভাবীশিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবে বিজ্ঞান ও প্রয়োগশিল্প এবং যন্ত্র-বিজ্ঞানের উপর। তারক পালিত, নীলরতন সরকার প্রভৃতি ছিলেন এই মতের। তাঁদের চেষ্টায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপিত হলো—আজ যেখানে বিরাট বিজ্ঞান কলেজ খাড়া হয়েছে—সেইখানে। কালে এও ঝিমিয়ে এলো—জাতীয় শিক্ষা-পরিষদেরই মতো। দুটো মিলে গেল

একদিন—তারপর টিঁকে গেল ইনজিনিয়ারিং ও টেকনিক্যাল বিভাগ—যাদবপুরে যা সুনাম অর্জন করলো একদিন। কিন্তু 'জাতীয়' শিক্ষা আদর্শ তখন সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। এইরকম রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখে নানা স্থানে বিদ্যাপীঠ, মাদ্রাজে National University গজিয়ে ওঠে। সে সবই উঠে গিয়েছে। রাজনীতিকরা শিক্ষার্থীদের তাঁদের আন্দোলনের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিলেন। সেইসব রাজনৈতিক আন্দোলন যখন আপন থেকে নিবে এলো —না-হয় অন্যতর প্রকৃষ্ট পথ পেলো—তখন শিক্ষার্থীদের জীবিকার পথ কেউ বাৎলাতে পারেনি। শিক্ষায় অসহযোগ এসেছিল ফিরে ফিরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যায়তনকে রাজনীতির বাহন করেননি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ক্ষুদ্র বিদ্যালয়কে এইসব আকস্মিক উত্তেজনা থেকে সামলিয়ে দূরে রাখতেন। তিনি জানতেন তিল তিল করে উত্তমকে তাল পাকালে তিলোত্তমা হতে পারে—কিন্তু তা জৈব হয় না। একটা বনস্পতিকে উপড়ে এনে বসানো যায়, কিন্তু অচিরকালের মধ্যে তা শুকিয়ে নষ্ট হবে। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ—বনস্পতি রোপণ করেন—তারপর তার যা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তাই ফলেছিল। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ শিক্ষাদর্শে নূতন অনেক জিনিস আনলেন—বহু উত্তম প্রস্তাবের তিল সংগ্রহ করে। কিন্তু তা স্বর্গের তিলোত্তমার মতো সাময়িকভাবে নয়ন ধাঁধানো মাত্র—হৃদয় গলানো নয়—মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারে তা কাজে লাগালো না।

রবীন্দ্রনাথ বাস্তববাদী ; তিনি জানতেন প্রতিষ্ঠিত শাসনসংস্থার পাশাপাশি সমান্তরালে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপনের সময় হয়নি। কতবার ভেবেছিলেন সরকার-নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থাই শান্তিনিকেতনে চাপাবেন—ব্যবহারিক জীবনে তার বাধা কোথায় কবি জানতেন বলেই, মনের সাময়িক এই আবেগকে সংহত করেছিলেন। আপন আপন ধর্মসম্প্রদায়ের সেবার জন্য লোক প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেওয়ার বড়ো বড়ো বিদ্যালয় আছে ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ধর্ম বা মতের মিশনারী তৈরীর জন্য শিক্ষাকে ব্যবহার করতে চাননি। তিনি জানতেন বিদ্যালয় গড়ে ওঠে আপনার অন্তর্নিহিত তেজে ও সমাজের চাহিদা বা প্রয়োজনের প্রেরণায়। তাই একদিন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পুরাতন উত্তরীয় তার খুলে গেল—যা ছিল বিশেষভাবে বাঙালির—তা হলো সর্বভারতীয় ; যা ছিল বিশেষভাবে হিন্দুর আশ্রয়স্থল—তা হলো সর্বধর্মের মিলনকেন্দ্র। মুসলমান ছাত্র অধ্যাপক এলো, এলো খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন। তারপর এলো অবাঙালীরা—

গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দুস্থানী, অসমিয়া, তামিল, অন্ধ্র, মালায়ালী, নেপালী ;—এখানেই দাঁড়ি পড়লো না। একদিন বিশ্বভারতীর নিমন্ত্রণসভায় ডাক পড়লো বহির্বিশ্বের—ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসী, জারমান, ইতালীয়, চেক্, হাংগেরিয়ান, মার্কিনী নিগ্রো, আফ্রিকান নিগ্রো, মিশরের মুসলমান, ইসরেইলের ইহুদী, ইরাণের পারসিক, চীনা, জাপানী, বর্মী, সিয়ামী, সিংহলী—বিচিত্র জাতির। বিবিধ ধর্মের লোক এলো। বিশ্ব এসে একত্রে নীড় বাঁধলো শান্তিনিকেতনের প্রান্তরমাঝে—যেখানে একদিন ক্ষুদ্র একটি চারা রোপণ করেছিলেন বিংশ শতকের গোড়ায়।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, যে-কাজ আমি করতে পারিনে, সে-কাজ অন্যকে করতে বলতে পারিনে। তাই শিক্ষা সম্বন্ধে সমালোচনা করেই তিনি নিরস্ত হননি—তাকে প্রথম মূর্তি দিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম রূপে। কিন্তু তাঁর প্রগতিপরায়ণ মন, তাঁর 'সর্বাস্তিবাদী' ভাবনা কথনো একই স্থানে স্তব্ধ থাকতে পারেনি। তাঁর নিজের ধর্মভাবনা থেকে যে প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি, তাঁর মনের ব্যাপ্তি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা বিচিত্র পথে চলেছিল—তা না হলে বিচিত্র এবং বিরুদ্ধ স্বভাবের বিভিন্ন মানুষকে একটি নীড়ে বাঁধবার জন্য চেষ্টা করতেন না। বিশ্বভারতী গড়ে উঠেছে তাঁর সঙ্গে—এবং তিনিও গড়ে উঠেছিলেন এর সঙ্গে—এই বিচিত্র সমাবেশের মধ্যে, বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে।

শান্তিনিকেতন সম্পূর্ণ (perfect) নয়—তার অনেক দোষত্রুটি—কাগজপত্রে তা যথেষ্ট প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু মানুষ কি সম্পূর্ণ? কোন্ প্রতিষ্ঠান দোষশূন্য? বিধাতার সৃষ্টি আদিম যুগের প্রাণী, আদিকালের মানব—তারাই কি সম্পূর্ণ ছিল? ভগবানও কি নিজেকে সৃষ্টি করে চলছেন না? তাঁর সৃষ্টি মানব যদি অসম্পূর্ণ হয়—তবে সেই মানবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানে কি করে সম্পূর্ণতার দাবি করতে পারি। একটা জিনিস দেখতে পেয়েছি গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ—সেটা হচ্ছে এটি চলছে—স্তব্ধ হয়ে নেই—আর দেখেছি যা অন্যায়, যা পাপ—তা হয়তো কিছুকাল টিঁকে গেছে—তারপর তাদের সরে গিয়ে মঙ্গলের স্থান করে দিতেই হয়েছে। তাই এখনো বিশ্বাস রাখি—দেবেন্দ্রনাথের সাধনপীঠস্থলে রবীন্দ্রনাথের এই বিদ্যাশ্রম আপনার মঙ্গলপথ আপনিই কেটে চলবে।

# শ্রীনিকেতন ও প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ

সমীরণ চট্টোপাধ্যায়

বিদেশীদের হাত থেকে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ভারতের (ও পাকিস্তানের) উপর এসে যাওয়ার পর দেশ-গঠন নিয়ে, বিশেষ করে গ্রামের উন্নয়ন নিয়ে, চারিদিকে খুব সাড়া পড়ে গেছে। দেশ যে কেবল মাটি নয়, মাটির অধিবাসী মানুষকে নিয়েই দেশ, এ-কথাটি সরকারের দপ্তরখানাতেও স্বীকৃত হচ্ছে এবং রাজনৈতিক নেতাদের মনেও অনুভূত হচ্ছে। মাটির মানুষ যে ভারতের মতো গ্রাম-ধর্মী দেশে গ্রামেই প্রধানতঃ বাস করে, গ্রামের মাটিতেই জন্মে গ্রামের মাটিতেই মরে, এ-সত্যটিও সরকারী-বেসরকারী কর্মপ্রচেষ্টায় ক্রমশই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। 'ফিরে চল মাটির টানে', কবির এই গানটি কেবল উদাসীনভাবে কানে শোনবার নয়, এটা প্রাণে সাড়া জাগাবার মতো সত্যের আভাস বহন করছে, এখন আর তা কেউ তেমন অস্বীকার করছেন না। তাই এখন সিমেন্ট বাঁধানো পথে-প্রাঙ্গণে গগন-চুম্বী ইঁট-পাথরের ভিড়ের মধ্যে দেশের প্রয়াস আর সীমাবদ্ধ নেই, সুদূর পল্লী-প্রান্তে সরকারী প্রয়াসের প্রমাণ এসে পৌছুচ্ছে। সরকারী প্রয়াস স্বভাবতঃই সরব, ভারতের নবজাগরণে বরং একটু উচ্চরবই হ'বার কথা। হ'য়েছেও তাই। চারিদিকে সরকারী পর্যায়ে আলোচনা, প্রস্তাব, পরিকল্পনা, দপ্তরখানা, শিক্ষণ-ব্যবস্থা, অর্থ-মঞ্জুর, কর্মীদের নিয়োগ, পরীক্ষা-গবেষণা, ভ্রমণ, বিদেশে ছাত্র-কর্মী প্রেরণ, বিদেশ থেকে গ্রামের কাজের অভিজ্ঞতা আমদানী, কত প্রচণ্ড চেষ্টা আরম্ভ হ'য়েছে। প্রচণ্ড সাড়া জেগেছে গ্রামের কাজ নিয়ে সরকারের বড় বড় দপ্তরখানায়।

সরব হ'ক, উচ্চরব হ'ক, পূর্ণ সার্থকতা লাভ হ'ক বা নাই হ'ক, একটি সত্য প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে, যা ছিল এককালে নিঃসঙ্গ কবির গান, কাব্য বা মর্মবেদনা, তাই হ'য়ে উঠেছে সরকারী দপ্তরে এক বিশেষ কর্ম-প্রেরণা! জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সরকার অবলম্বন করেছেন মাটি, মানুষ আর তাদের গ্রাম।

সরকারী প্রচেষ্টা সরাসরি বহু অর্থব্যয় করছেন, বহু কর্মী নিয়োগ করছেন প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে গ্রামের পুনর্গঠনের জন্য। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় উত্তম সৃষ্টি করে বেসরকারী সংগঠনের মধ্যস্থতায় গ্রামের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি করার চেষ্টাও করছেন। অনেক স্থানে স্থানীয় উত্তম স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে উঠছে, অনেক সমিতি সঙ্ঘ ক্লাব গড়ে উঠেছে এবং সেগুলি অনেক থেকে অসংখ্য হ'য়ে উঠছে। সরকারী তহবিলের সরকারী প্রভাব-পরিচালনায় এগুলি টুকরো টুকরো কাজও করে যাচ্ছে। কাজের লক্ষ্য ও ক্ষেত্র হ'ল গ্রাম (শহরেও এই শ্রেণীর সঙ্ঘ-সমিতি কম নয়)। এই সব সঙ্ঘ সমিতি ক্লাবের ঐতিহ্য না থাক, আয়ু তাদের অনিশ্চিত হ'ক, কোনো স্থায়ী রূপ বা কর্ম বা প্রয়োগ তাদের নাই থাক, তবু সমগ্র দেশে গ্রাম-জীবনের অসামান্যতা স্পষ্ট করে তোলার পক্ষে তারা কম সহায়তা করছে না। সমস্ত দেশে কোনো বিষয়ে সাড়া জাগাবার কাজে এই অনিশ্চিত সঙ্ঘ-সমিতির দান অল্প নয়। সরকারী উত্তমে সৃষ্ট গ্রাম-উন্নয়নের কেন্দ্রগুলি এই সব সরকারী সাহায্যে পুষ্ট স্থানীয় প্রচেষ্টার সঙ্গে মিলে সরকারী প্রয়াসকে যথেষ্ট ব্যাপক ও বহুমুখী করে তুলছে। কতখানি সার্থক হ'য়ে উঠবে তা বিচার হবে দীর্ঘকালের ভূমিকায়। এখনো সেদিকে কিছু বলবার সময় আসেনি।

গ্রামের কাজ নিয়ে বহু স্থানে বহু ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে-সব কর্মকেন্দ্র, তাদের মধ্যে দু'চারটি আছে একটু অন্য জাতের। এই দু'চারটি কর্মকেন্দ্র নবজাতক নয়, এদের বয়স দু'চার মাস বা দু'চার বৎসর নয়। এগুলি ঐতিহ্যবান্, ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে দিনে দিনে নিরলস চেষ্টা আর অভিজ্ঞতার মধ্যে। কঠিন এদের প্রাণ, অটুট এদের সঙ্কল্প। বহু সন্দেহ-বিদ্রূপের মার খেয়েও এরা মরেনি, মরিয়া হ'য়ে উঠে ব্রতভ্রষ্টও হয়নি। অতি তুচ্ছ আয়োজনে অতি বড় দৈন্যেই এদের পল্লী-পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হ'য়েছিল, নীরবে কিন্তু জন-দরবারে এদের সাধনা চলে এসেছে আজ পর্যন্ত। সরকার এদের দিকে অবহেলায় পিছন ফিরে থাকতেন, শিক্ষিত সমাজ এগুলির প্রতি বিরূপ ছিলেন, নেতাদের সামনে থাকত রাজনীতি বা উচ্চরব তত্ত্ব বা দর্শন;

জনসাধারণ ধারণাই করতে পারতনা মাটির মানুষদের মধ্যে আবার কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে, তাদের কথা সত্য-সত্যই কেউ ভাবতে পারে আপন করতে পারে। তবু এই প্রচেষ্টা থামেনি, প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে দাঁড়াল। গ্রামের কাজের শত শত কর্মকেন্দ্রের মধ্যে এগুলি স্বপ্রতিষ্ঠ; বেসরকারীর পূর্ণ মূল্যে মূল্যবান্। এই প্রতিষ্ঠান দু'চারটিই থাকতে পারে, কারণ এদের প্রতিষ্ঠা সাময়িক প্রয়োজন বা উদ্দীপনার উপর নির্ভর করেনি, কতকগুলি গণ-কল্যাণের মৌলিক নীতির উপরই এদের গড়ে উঠতে হয়েছে। অনাড়ম্বর এদের কাজ, দিনে দিনে দীর্ঘকাল ধরে এ কাজ; আর হাতে হাতে যে ফল পাওয়া যাবে, তাও নয়। কাজেই এদের দান স্বল্প-পরিচিত ও নীরব।

বিশ্বভারতীর পল্লী-পুনর্গঠনের প্রয়াস এমনি ভাবেই তুচ্ছ আয়োজনে অতি বড় দৈন্যের মধ্যে আরম্ভ হ'য়েছিল। কত সন্দেহ, কত বিদ্রূপ প্রয়াসীদের মনে নিষ্ঠুর আঘাত হেনেছিল, কত আত্ম-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হ'য়েছিল প্রাথমিক কর্মীদের, কী অবজ্ঞা অবহেলা তাচ্ছিল্য সরকারী জ্ঞানী-গুণীদের এবং শিক্ষিত চিন্তানায়কদের। তবু পল্লী-পুনর্গঠনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল, পল্লীর জনচিত্তে মর্যাদা লাভ করল, পল্লীর শ্রী ফিরিয়ে আনবার ব্রতে স্বপ্রতিষ্ঠ হ'ল, এর প্রতিষ্ঠাতা কবি এর নাম দিলেন 'শ্রীনিকেতন'। শান্তিনিকেতন আর শ্রীনিকেতন উভয়ে মিলে সার্থক হ'য়ে উঠল যে আছে মাটির কাছাকাছি তাদের কাছে নিজেদের যথার্থ স্থান আবিষ্কার করে। পল্লীর ক্রোড়ে বিশ্বের নীড় বাঁধা হ'ল, কবির বহুদিনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ গ্রহণ করল।

বিশ্বভারতী এখন আইনের ভাষায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারী তহবিলের প্রভাব ও পরিচালনা মানতেই হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে, বিশ্বভারতী এখন সরকারী কায়দা-কানুন মানছেন, সরকারী ছাঁচে পড়বার আশঙ্কাও হ'য়েছে। তবু পল্লী-পুনর্গঠনের প্রতিষ্ঠানকে রীতিমতো স্বীকার করে নিতে হ'য়েছে সরকারকে, বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সাধারণ ধারণাটি পরিবর্ধিত করতে হ'য়েছে তাঁদের। পল্লীর প্রাণকে সঞ্জীবিত করার প্রয়াসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান-প্রয়াস থেকে বিচ্যুত বিচ্ছিন্ন তাঁরা করে দেননি। পল্লী-পুনর্গঠনের উদ্যম ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে পঠন-পাঠনের সঙ্গে স্বাঙ্গীকৃত করেছেন এবং জ্ঞান-সাধনার সঙ্গে পল্লী-কল্যাণের স্বাঙ্গীকরণে তাঁরা যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার্হ। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান পাছে পুঁথির আড়াল সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচলায়তনে পরিণত করে ফেলে, চারিপাশের প্রাণ-প্রবাহ থেকে

পাছে জ্ঞান-গৌরব বিশ্ববিদ্যালয়কে রসবিচ্ছিন্ন করে দেয়, সেই আশঙ্কা থেকে বিশ্বভারতীকে রক্ষা করা হ'য়েছে; এই সতর্কতাটুকু সরকারের পক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। পূর্বে শ্রীনিকেতন বললে বিশ্বভারতীর পল্লী-পুনর্গঠনের প্রতিষ্ঠানকেই বোঝাত; বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলে এর নাম হ'য়েছে 'পল্লীসংগঠন বিভাগ', আর শ্রীনিকেতন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে পল্লীসেবার শিক্ষা ও শিক্ষণ কেন্দ্রের সমাবেশ-ক্ষেত্র। পূর্বের শ্রীনিকেতনের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলে 'পল্লী-সংগঠন বিভাগ' হ'য়েছে বলে কোনো ক্ষোভ নেই, বরং পল্লী-পুনর্গঠনের প্রচেষ্টাকে 'বিভাগ' নাম দিয়ে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ মর্যাদার অংশীই করা হ'য়েছে এবং পল্লীসেবার শিক্ষা ও শিক্ষণের একাধিক কেন্দ্র শ্রীনিকেতনে অবস্থিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লী-পটভূমি আরো বিস্তৃত হ'য়ে উঠেছে। মোট কথা, সরকার বিশ্বভারতীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে গিয়ে পল্লী-পুনর্গঠনের চেষ্টা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবা সবদিক সমন্বিত করে নেওয়ায় ভারতের গ্রাম-ধর্মকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। গ্রামীণ ভূমিকায় জ্ঞান-চর্চাকে স্বীকার করায় যদি কবিরই উপলব্ধিকে গ্রহণ করা হ'য়ে থাকে তো সে কবির সৌভাগ্য। মহাপুরুষদের ভাগ্যে এত অল্প সময়ে এত বড় স্বীকৃতি মিলতে দেখা যায় না।

বিশ্বভারতী সংস্কৃতি ও শিক্ষার নীড় হ'লেও এর যোগ পল্লীর সঙ্গে কত নিবিড় হওয়া বাঞ্ছনীয় তা তাঁর এক লেখা থেকে অনুমান করা যেতে পারে। তিনি বলছেন, 'Our centre of culture should not only be the centre of the intellectual life of India, but the centre of her economic life also.' শুধু তাই নয়, তিনি আরো বললেন, 'Such an institution must group round it all the neighbouring villages and vitally unite them with itself in all its economic endeavours.' শিক্ষাকে পল্লীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত না করলে শিক্ষার পরিণতি শুভ হ'তে পারেনা, শিক্ষার প্রত্যক্ষ দান কিছু থাকবেনা ভারতের জীবনযাত্রায়। একটি উপমা দিয়ে বললেন কবি, 'Just as the beauty of a painting is clearly revealed only when it has the entire canvas as background, even so education cannot be real and effective unless it covers the whole country.' শিক্ষার সত্যরূপটি প্রত্যক্ষ করবার জন্য আবশ্যক সর্বভারতের প্রতীক-স্বরূপ পার্শ্ববর্তী পল্লীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সাধনার সংযুক্তি; গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সংযোগ সার্থক হ'লে তবেই

বিশ্বভারতীর শিক্ষা সত্য হ'য়ে উঠবে। শিক্ষাকে সত্য করে তুলবার জন্যেও গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে নিবিড় যোগ ও সংগতি প্রয়োজন।

শ্রীনিকেতন পল্লী-পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২; কিন্তু তার পূর্বেই বিশ্বভারতীর শিক্ষার প্রয়াসকে সত্য করে তুলবার জন্য পল্লীর জীবনে নিজেদের কর্মপ্রয়াস যুক্ত করবার আহ্বান জানিয়েছিলেন কবি। তখন শ্রীনিকেতন নেই, ছিল শ্রীনিকেতনের পূর্বাভাষ শান্তিনিকেতন জ্ঞান ও গীতের চর্চায়। শান্তিনিকেতনের কয়েকজন ছাত্র এবং অধ্যাপক মিলে নিকটবর্তী সাঁওতাল গ্রামে গেলেন, তাদের জীবনযাত্রা বুদ্ধি দিয়ে হৃদয় দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলেন। অভিজ্ঞতা তাঁদের কিছুই তখন ছিলনা, উপকার করবার কোনো স্পর্ধাও তাঁদের ছিলনা। সাঁওতালদের সঙ্গে মিলে তাদের অভাব কোন্ দিকে এবং কী সাহায্য পেলে তারা দাঁড়াতে পারবে অনুমান করলেন। এটি বোধ হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের প্রয়াস, আজ থেকে অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে! তারপর সেই সাঁওতাল পল্লীতে এলেন ধর্মপ্রাণ পিয়র্সন সাহেব —ইনি কলিকাতায় লণ্ডন মিশনারি কলেজের উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন, পরে দিল্লীতে কোনো ধনীর গৃহে গৃহশিক্ষক ছিলেন; রবীন্দ্রনাথের সাধনায় আকৃষ্ট হ'য়ে শান্তিনিকেতনে আসেন; তখন ১৯১৩ হবে। তিনি এসেই দেখলেন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার ভূমি হয়েছে গ্রামীণ জীবন, অন্ত্যজ বলে বিবেচিত সাঁওতালদের গ্রামেও শান্তিনিকেতনের শিক্ষার সাধনা চলছে। তখনকার কাজের মধ্যে সাঁওতালদের নিয়ে শুরু হয়েছে খেলাধুলা, নৈশ বিদ্যালয় এবং কিছু কিছু শিল্পশিক্ষা। পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনে গ্রামের যে-সব কাজ রীতিমতো কর্মসূচীর অন্তর্গত হ'য়েছিল, এই সাঁওতাল গ্রামে তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯১০-১৩ সালে। সাঁওতালদের সুখ-সুবিধা ক্রমশই বাড়বে এই সব কাজের মধ্যে, তারা ক্রমশ তাদের জীবন-মান দু'একটি দিকে উন্নীত করবে, এ আশা অধ্যাপক-ছাত্রদের মধ্যে ছিল; কিন্তু এই আশাটুকুই তাঁদের এই গ্রামীণ জীবন-যোগের সব কথা নয়। তাঁদের জ্ঞান-সাধনা, তাঁদের গীত-সাধনা এই গ্রামীণতার আশ্রয়ে পূর্ণতর হ'য়ে উঠবে, এই ছিল আশ্রমগুরুর উপলব্ধি। তাই তিনি তাঁর সংস্কৃতি ও জ্ঞানের কেন্দ্রকে পার্শ্ববর্তী জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত ও সংগত করতে চেয়েছিলেন। শ্রীনিকেতনের পল্লী-পুনর্গঠন এই সত্যই ঘোষণা করল যে শিক্ষা-প্রয়াসের ভূমিকা হওয়া চাই বাস্তব এবং জীবনধর্মী, পার্শ্ববর্তী জীবনধারার সঙ্গে চাই তার রস-সংযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবার সময়ে

বিশ্বভারতীর এই মূল অনুভূতিটি উপেক্ষিত হয়নি তার কারণ এটি কবির সত্যাভাষ, কবির আবেগ নয়।

শ্রীনিকেতনের একটি মূল সূত্র যেন বুঝতে পারা যাচ্ছে। অনেকের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে বলে নয়, বহু সেবকের সেবাপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য নয়, এমনকি গ্রামের সুখ-সুবিধা ও জীবন-মান উন্নয়নের জন্যও নয়; কিন্তু এই সবগুলির অল্পাধিক মিলনে যে মহৎ প্রয়াসের সৃষ্টি হচ্ছে, তার বিশিষ্ট স্থান আছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সামগ্রিক শিক্ষা-প্রস্তাবে, এই জন্যেই শ্রীনিকেতন বিশেষ মূল্যের অধিকারী, এই জন্যই শ্রীনিকেতন একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের, বিশ্বভারতীর,—বিশ্বভারতীর সাধনালব্ধ সত্য রয়েছে বলেই এর বিশেষ মর্যাদা। জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক, সরকারী বেসরকারী সঙ্ঘ সমিতি প্রভৃতি থেকে শ্রীনিকেতনের একটি মূলগত প্রভেদ এইখানে, শ্রীনিকেতন বিশ্বভারতীর সামগ্রিক শিক্ষা-প্রস্তাবের ভূমিকা সৃষ্টি করে চলেছে, শুধু গ্রামের কাজ করে চলেছে তা নয়। সরকারী দপ্তরে যে এই গূঢ় সত্যটি অনুভূত হ'য়েছে সেটি সরকারের গৌরবের কথা।

মানুষের সভ্যতা বড়ই জটিল হ'য়ে উঠেছে; জটিলতা মানুষেরই সৃষ্টি হ'লেও মানুষ তার নিজেরই জটে বিমূঢ়। এমন অবস্থায় কোনো সত্য ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠলে এবং ক্রমশ দেশ-মানসে গৃহীত হ'লে আশা জাগে, আনন্দ হয়। গ্রামধর্মী ভারতের সামগ্রিক শিক্ষা-প্রস্তাবে গ্রামীণ জীবনের যোগ ও সংগতির সত্যটুকু স্বীকৃত হওয়ায় যেমন আনন্দ হয়, তেমনি আনন্দ জাগে যখন বোঝা যায় গ্রাম-পুনর্গঠনের কতকগুলি মৌলিক ধারণা যা বহুদিন আগে নিঃসঙ্গ কবির চিত্তে উদ্ভাসিত হ'য়েছিল তা আজ প্রতিফলিত হ'য়েছে দেশের গ্রামের কাজে, সরকারী বেসরকারী প্রচেষ্টায়। পল্লীর প্রাণের পুনরুজ্জীবনে কতকগুলি মহৎ নীতি অনুসরণীয়। এগুলি কিছুদিন পূর্বেও প্রায় অজ্ঞাত বা অগ্রহণীয় ছিল, বিশেষ করে আমাদের দেশে। কবি-চিত্তে সেগুলি তথ্য-তত্ত্বের আশ্রয়ে অবগত চিন্তায় এসে পৌছয়নি মনে হয়, আলোর মতো আভাষে-উদ্ভাসে সেগুলি যেন পাওয়া। তবু যখন দেখা যায় দেশের সরকারী বেসরকারী কর্মকাণ্ডে অল্পই হ'ক আর অধিকই হ'ক সেই মৌলিক নীতিসমূহ স্বীকৃত হ'য়ে উঠছে, তখন সেগুলিকে সত্যের মর্যাদা দিতেই হয়। শ্রীনিকেতনে এবং তার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্বেও অন্যত্র কবি পল্লীর কাজে যখন হাত দিলেন এবং তাঁর স্বভাবানুযায়ী আহ্বান জানালেন সকলের মনের কাছে, তখনই সেই মূল ধারণাগুলির পরিচয়

মিলেছিল। দু'চারটি ইঙ্গিত দিলেই শ্রীনিকেতনের কর্মনীতি ও কর্মসূচীর প্রকৃতি বুঝতে পারা যাবে এবং সত্যমূল্য থাকলে আজ হ'ক কাল হ'ক গৃহীত হয়ই এ-কথাও প্রমাণিত হবে।

শ্রীনিকেতনের কর্মোদ্যমে আজ পর্যন্ত যে মহৎ নীতিটি ভুল হয়নি সেটি কবির উক্তি স্মরণ করেই বুঝে নেওয়া যাবে। কবি পল্লী-কর্মীদের বলেছেন, 'আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়।' কবিকে কড়া নজর রাখতে হ'য়েছিল তাঁর নিজেরই প্রতি, পাছে তিনি জমিদার 'রাজা' প্রজাদের দুঃখ দূর করতে গিয়ে নিজে হ'য়ে ওঠেন দাতা আর দুঃখীদের করে তোলেন ভিখারী। শিলাইদহে তাঁর প্রজাদের অনেকেরই দুঃখ তাঁকে কাতর করেছিল; কিন্তু পল্লীবাসীর ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখে, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করেছে লক্ষ্য করেও দান শুরু করেননি। শ্রীনিকেতনে তাঁর কর্মীদের এই সহজে কাজ চুকিয়ে দেওয়ার লোভ সম্বরণ করতে সাহায্যও করেছিলেন। এখানে ওখানে কূপ খনন করে দেওয়া, ওখানে একটু রাস্তা করার অর্থ যুগিয়ে দেওয়া, সেখানে একটি বিদ্যালয়-গৃহ করে দেওয়া, এগুলিই যদি পল্লীর কাজের লক্ষ্য হয়, তাহ'লে অদূর ভবিষ্যতে দাতার অর্থ ইচ্ছা দুই নিঃশেষ হবে, গ্রহীতার গ্রহণ-আকাঙ্ক্ষাই বাড়বে; তখন আসবে তীব্রতর হাহাকার। অতএব শ্রীনিকেতনের পল্লী-পুনর্গঠন ওদিকে নয়।

মিশনারীদের কার্য ছিল প্রধানতঃ এই ধরনের। তাঁদের অধিকাংশেরই হৃদয় করুণায় ভরা হয়তো, তাঁরা অনেকেই হয়তো ঈশ্বরের নির্দেশ বলেই অসহায়দের সাহায্য করতেন। তাঁদের কর্মোদ্যম সর্বদাই দান ও উপকারের মধ্যে ব্যয়িত হ'ত। মিশনারীদের কার্যনীতি সম্বন্ধে কবি সতর্ক ছিলেন এতই যে, তাঁর পল্লী-পুনর্গঠনের প্রধান সহায় Leonard Elmhirst-কেও তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন। Leonard Elmhirst ইংরেজ তরুণ, প্রথম যুদ্ধের পর চারিদিকে নৈরাশ্যের মধ্যে প্রাচ্যের কবি রবীন্দ্রনাথের বাণীতে নতুন আশার ধ্বনি শুনে তাঁর কর্মযোগে যুক্ত হয়ে পড়েন বিশ্বভারতীতে, ১৯২১-এর নভেম্বর মাসে এসে পৌঁছন শান্তিনিকেতনে। তাঁর উপরই শ্রীনিকেতনের কাজের প্রধান ও প্রারম্ভিক দায়িত্ব এসে পড়ে। পরে এই তরুণ ইংরেজ দেশে ফিরে গিয়েও বরাবর অর্থ যুগিয়ে চলেছিলেন শ্রীনিকেতনের পল্লী-প্রয়াসকে সার্থক

করবার জন্যে। অর্থসাহায্য পরে আমাদের দেশেই পাওয়া গেল সরকারী বেসরকারী সূত্রে, তখন তাঁর টাকার আর দরকার হ'লনা। এখন তিনি প্রৌঢ়, এখনো অকাতর বন্ধু বিশ্বভারতীর ও শ্রীনিকেতনের। এই বিশেষ সম্ভাবনা নিয়ে যখন Elmhirst তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনে এসে দাঁড়ালেন, দেরী হ'লনা কবির তাঁর মন ও কর্মক্ষমতাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে। প্রধান ভারই অর্পিত হ'ল এই তরুণের উপর। কিন্তু তাঁকেও কবি সতর্ক করে দিলেন যাতে তিনি মিশনারীদের মতো ভুল না করেন। তরুণ Elmhirst তাড়াতাড়ি বাংলাভাষা শিখে নিয়ে গ্রামকে বুঝে নিতে চেয়েছিলেন; কবি সতর্ক করে বললেন, কী দরকার। হয়তো তাতে গ্রামকে বাইরে থেকে সাহায্য করার দিকটাই বড় হ'য়ে উঠবে, কবির আশঙ্কা বোধ করি তাই ছিল। তিনি বললেন, 'Once you have learnt Bengali, you will make the same mistake that so many missionaries have made.' গ্রামকে সাহায্য করাই হবে, পল্লীর সত্তাকে বোঝা হবেনা, এই আশঙ্কারই সম্ভাবনা।

সরকারী ধারণাও ছিল তখন ঐ জাতীয়—এখানে ওখানে এভাবে ওভাবে সাহায্য করা। তাতে একপ্রকার আত্মতুষ্টি লাভ হ'তে পারত, সরকারের প্রতি একপ্রকার বিস্ময়-কৃতজ্ঞতার ভাব সৃষ্ট হয়তো হ'ত; কিন্তু আত্মসম্ভ্রম তাতে আরো ক্ষীণ হ'য়ে পড়ত। 'ঘরে বাইরে' বইটিতে এই সত্যটির একটি উক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই করা হয়েছে। দারিদ্র্য-জর্জরিত পঞ্চুকে সদয় মাস্টার-মহাশয় কিছু টাকা দিলেন; কিন্তু টাকাটা তিনি পঞ্চুকে দান বলে দিলেন না, টাকাটা দিলেন ধার বলে হ্যাণ্ড-নোট লিখে। পঞ্চুর শ্রদ্ধা ও প্রণাম তাঁর প্রতি ক্রমশই ছোট হ'য়ে গেল, তাঁকে দয়াহীন বলে ঠাওরাল পঞ্চু। কিন্তু সবই জেনে-শুনে পঞ্চুকে আত্মসম্ভ্রমে রক্ষা করবার জন্য তিনি টাকাটা ধার বলে দিলেন—'মাস্টারমশায় কাউকে বাইরের দিকে দান করে ভিতরের দিকে ঋণী করতে নিতান্ত নারাজ—তিনি বলেন, মনের ইজ্জত চলে গেলে মানুষের জাত মারা যায়।' তাঁর জমিদারীতে 'রাজা' রবীন্দ্রনাথও এইভাবে কত পঞ্চুর কাছে নির্দ- প্রতিপন্ন হ'য়েছিলেন কে জানে! তাঁর প্রতিষ্ঠান শ্রীনিকেতনও এত বৎসর ধরে কত পল্লীর কত আশা এই দিকে ব্যর্থ করেছে তাই বা কে বলবে! তবু তাঁর শ্রীনিকেতন বাইরে থেকে দান করে পল্লীকে কৃত্রিম উপায়ে সুখী করা সার্থক করার পন্থা কখনো গ্রহণ করেনি।

আজ সরকারী নীতিতে শ্রীনিকেতনের এই পরীক্ষিত সত্যটি প্রতিফলিত

হ'তে দেখা যায়; কর্মীদের শিক্ষণে এখন বাইরে থেকে দান করাকে প্রকৃত উপকার বলে কেউ মানেন না; সর্বত্রই শুনতে পাই কর্মীদের শিক্ষায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী 'পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে'। সরকারী বেসরকারী সকল ক্ষেত্রেই সকল উদ্যমেই প্রায়ই এখন চিন্তার ধারাটা হ'য়েছে এইরকমই—দান থেকে রক্ষা করে নিজের শক্তিকে আবিষ্কার করে তারই উপর নির্ভর করতে শেখানোই এখন পল্লী-প্রয়াস হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। জীবনের একটি ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রেই এই আত্ম-আবিষ্কারের নীতি অনুসরণীয়। কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায়, বিনোদনে—সকল দিকেই নিজেদের মধ্যে কতখানি সম্ভাবনা আছে তার আবিষ্কারের উৎসাহ-দানই পল্লীগঠনের মূল কথা হ'য়ে উঠছে। পল্লীর যাত্রা-গান, পল্লীর কথকতা, পল্লীর বাউল, পল্লীর কবিগান—এসবের উৎস শুষ্কপ্রায়। এরই উৎস পুনরাবিষ্কার করাই বোধহয় জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের বিনোদন বাবদ অর্থ-সাহায্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। ক্রমশ পল্লীর তরুণ ও গৃহীদের নিয়ে যে-সব যাত্রা-থিয়েটরের কীর্তনের গানের সঙ্ঘ সমিতি সৃষ্ট হ'য়ে উঠছে, তার মূলে এই আত্মশক্তিরই উদ্বোধন ঘটছে।

শ্রীনিকেতনের পল্লী-প্রয়াসে আত্মশক্তির চর্চাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করা যায়। চিত্ত-বিনোদনের দিকে শ্রীনিকেতনের প্রচেষ্টা নির্মমভাবে সমালোচিত হ'তে শুনেছি আমার বালকবয়সে এবং সেদিন পর্যন্ত। লোকে খেতে পায়না, তাদের আবার বিনোদন! এই ছিল সমালোচনার একটি ধার; দ্বিতীয় ধার ছিল 'গান-বাজনা করা হচ্ছে মেয়েলীপনা'। শ্রীনিকেতনের কর্মী শুনল কবির কণ্ঠে: 'সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ-উৎসেরও সেই দশা।' তিনি জানালেন, 'যারা বীর জাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান্ করেছে, নিজেকে শুকিয়ে মারার অহংকার তাদের নয়, তাদের গৌরব এই যে, অস্ত্রশক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপসৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি।' পল্লীর ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হ'ল, 'এইরূপ সৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ

করবার উদ্দেশে।' চিত্তবিনোদনের প্রচেষ্টায় নাচ-গান-যাত্রা-থিয়েটর কেবল বিনোদন নয়, এযে আত্মলাভ করবার চেষ্টা। শ্রীনিকেতনের চেষ্টা এই আত্ম-আবিষ্কারে সাহায্য করা। এখন তো শুনি নাচ-গান-থিয়েটর নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে! অথচ সমালোচনা সেদিনও কী কঠোর ছিল।

'আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করিনি …' কবির এই উক্তিটি কেবল ঘোষণা নয়, এই ঘোষণার সঙ্গে ছিল কাজ। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে পার্শ্ববর্তী সাঁওতাল গ্রামে যে শিল্প-শেখানোর ক্ষুদ্র চেষ্টা দেখা গিয়েছিল, তাই পল্লীসমূহের এবং জাগ্রত দেশের প্রয়োজনে হ'য়ে উঠল শ্রীনিকেতনের সুসংহত শিল্প-প্রচেষ্টা, নাম হ'ল শিল্পভবন (এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলে শিল্পসদন)। শিক্ষাদান এবং স্থানীয় প্রয়োজন মেটানো এখনো শিল্পসদনের দ্বিবিধ কর্মসূচী অ-স্তিমিত। কৃষির অধিকার অগ্রগণ্য। যখন Elmhirst এলেন ১৯২১ সালে, তখন কবি কৃষির জন্য বিশেষ আগ্রহী। কলেজ বিভাগের ১০ জন ছাত্র, ৩ জন অধ্যাপক এবং কবির পুত্র এই নিয়ে অবিলম্বে শ্রীনিকেতনের কৃষিক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করার জন্য একটু ব্যস্ততাই যেন প্রকাশ করলেন।— '… The farm at Surul is there. How soon can you start?' জিজ্ঞাসা করলেন Elmhirst-কে।

জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা না করার আরো পরিচয় আছে। এখন যে কৃষিক্ষেত্র, গোশালা, মুরগী-পালন শ্রীনিকেতনে রয়েছে, সেগুলি ঐ চিন্তারই পরিচায়ক। যখন নতুন কোনো ধারণাকে কর্মে রূপ দিতে হয়, তখন সব দিক একসঙ্গে বাস্তব হ'য়ে ওঠেনা, নতুনের আবির্ভাবে এবং তার সৃষ্টিতে আঁট-সাঁট প্ল্যান থাকেনা। শ্রীনিকেতনের পল্লীর কাজে তাই গোড়া থেকেই কোনো প্ল্যানের শাসন দেখা যায়না। গোড়াতে কোনো প্ল্যান না থাকার কথা উল্লেখ করে কবি বলছেন, 'কর্মের প্রথম উদ্যোগকালে কর্মসূচী আমার মনের মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট ছিলনা। … সৃষ্টির আরম্ভমাত্রই অব্যক্তের প্রান্তে। … যেখানে প্রাণশক্তির লীলা সেখানে আমি বিশ্বাস করি স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিকে। আমার পল্লীর কাজ সেই পথে চলেছে, তাতে সময় লাগে বেশী, কিন্তু শিকড় নামে গভীরে।' জীবিকার সমস্যা নিয়েও এক কথা, গোড়াতেই প্ল্যান ছকা ছিলনা— কোন্‌টি কখন কী ভাবে করতে হবে আগে থাকতে জানা ছিলনা। শ্রীনিকেতনের কাজ তখন ছিল পথ আবিষ্কার, চলাচলের পথের পরিবর্ধন নয়। কৃষি, গোপালন, মুরগী-পালন প্রভৃতির প্রারম্ভে সমস্ত কর্তব্য বা সূচী অপরিজ্ঞাত

ছিল। তবু শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানরূপে দাঁড়িয়ে ওঠার অল্পকালের মধ্যেই দেখা যায় জীবিকা-সমস্যার সমাধানে পল্লীকে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য শ্রীনিকেতনে রীতিমতো ( তবে, সাধ্যমতো ) কৃষি গোপালন প্রভৃতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হ'য়ে গেছে। যে-সব বিষয়ে তখন ব্যবহারিকভাবে শিক্ষাদান চলছে ১৯২৮ সালের সংক্ষিপ্ত বিবরণে তার কিছু কিছু উল্লেখ আছে। ব্যবহারিক শিক্ষাদানের এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়গুলি ছিল—সার, জমির আর্দ্রতা রক্ষা, বহুফলন ও ফসলের আবর্তন, বীজের উন্নয়ন, গো-উন্নয়ন, গোজাতির সুষম খাদ্য, মুরগী-পালন এবং ভালো মুরগীর পালন প্রচলন। এটি ১৯২৮ সালের পূর্বেই আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছিল, আজও এ কাজ শ্রীনিকেতনের কাছে নিষ্প্রয়োজন হয়নি। সুখের কথা, এখন দেখা যায় সরকারী পর্যায়ে এর সবগুলিই গ্রামের দ্বারে এসে পৌঁছচ্ছে, সারা দেশেই যেন শ্রীনিকেতন সম্প্রসারিত হচ্ছে।

এই সময়ে শ্রীনিকেতনের কর্মপদ্ধতি ও তার অদূর লক্ষ্য নিয়ে অতি সংক্ষেপে যা বলা হ'য়েছিল তারও সার সঙ্কলন করে দেখা যেতে পারে। অদূর লক্ষ্য হিসাবে বলা হচ্ছে 'to assist them in solving their most pressing problems' 'to take the problems of the village and their field to the class-room for study and discussion and to the experimental farm for solution' 'to carry the knowledge and experience gained in the class-room and the experimental farm to the villages' 'to bring home to them the benefits of associated life, mutual aid and common endeavour'। নিজেদের জরুরী সমস্যার সমাধান নিজেরাই করবেন পল্লীবাসীরা, শ্রীনিকেতন শুধু সহায়ক ; পল্লীর সমস্যা শ্রীনিকেতনে আলোচিত হবে, শ্রীনিকেতনের চেষ্টা-অভিজ্ঞতা পৌঁছবে পল্লীর দ্বারে ; সমবায়ের মূল্য উপলব্ধিতে সহায়তা করবে শ্রীনিকেতন। প্রায় ৩৫ বৎসর আগে কাজের মধ্যে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল যে বিষয়, আজ ৩৫ বৎসর পরে হ'লেও সমাদৃত হচ্ছে, ঠেলে রাখা যায়না বলে, সেও তো আশার কথা। কবির প্রেরণা এত শীঘ্র সত্যমর্যাদা পাবে ক'বছর আগেও তা জানা ছিলনা।

কর্মপদ্ধতির আভাসও পাই, তাও বৎসরের হিসাবে পুরাতন হ'লেও একেবারেই আধুনিক বলে মনে হবে। কর্মসূচী কয়েকটি ভাগে বিভক্ত : অর্থনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক, স্বাস্থ্যবিষয়ক, সেবা-বিষয়ক, সমবায়-বিষয়ক। তথ্যসংগ্রহ একটি বিশেষ বিষয় ছিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দেও পল্লীতথ্য ও তাই নিয়ে

গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন জনৈক কর্মী, তারপর একাধিক তথ্যপত্র পাওয়া গেছে। ব্রতীবালক (বালিকাও অনেক আছে এখন) শিলাইদহের বিক্ষিপ্ত সূচনা থেকে এখন রীতিমতো একটি সংগঠনে পরিণতি লাভ করেছে। বিভিন্ন-বয়সের ছেলেমেয়ে যুবকদের নানাপ্রকার কর্মসূচীর মধ্যে এনে তাদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ও বাস্তব করে তোলার প্রচেষ্টা এটি। ব্রতীবালকরা এখন যে ব্রত গ্রহণ করে সেটি হ'ল, 'সত্য-সেবার ব্রত নিয়ে, চলব সিধে রাস্তা দিয়ে; দেশের দশের দুঃখ যত, দূর করিব সাধ্যমতো'। এই বাক্যগুলি না থাক, কর্মসূচীতে অল্পাধিক পার্থক্য থাক, তবু সরকারী বেসরকারী প্রচেষ্টায় এই ব্রতীবালক-বালিকার আদর্শ গৃহীত হ'য়েছে। বালিকা-বিদ্যালয়, নৈশ-বিদ্যালয়, শিক্ষাশিবির, চলমান গ্রন্থাগার, সচিত্র বক্তৃতা, বয়স্কদের শিক্ষা প্রভৃতি শ্রীনিকেতনের সূচনায় আদি-পর্বেই ছিল, রূপান্তরে এখনো আছে, কেননা তার প্রয়োজন এখনো ফুরায়নি। চিকিৎসকের পরামর্শ বা চিকিৎসা, ধাত্রীর পরামর্শ বা সাহায্য, প্রতিষেধক ব্যবস্থা, দাই-শিক্ষা, এগুলিও পুরাতন। বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আকস্মিক বিপদে বা অসুস্থের সেবায় আত্মনিয়োগ করা একটা সখের ব্যাপার ছিলনা, ছিল কর্তব্যে শিক্ষালাভ হবে বলে।

সমবায়ের বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন কবি বরাবরই। যে-সব কর্মোদ্যম আমাদের 'এই লেখনী-বাহন কবিকে অকস্মাৎ টেনে এনেছিল দুর্গম কাজের ক্ষেত্রে' তার একটি বিশেষ প্রেরণা ছিল এই সমবায়। সমবায়কে কতখানি মূল্য দিতেন তিনি পল্লী-পুনর্গঠনের কাজে তা বোঝা যায় দু'একটি ছোট-খাটো ঘটনা থেকে। সমবায়ে ছোট বয়সেই হাতেখড়ি দেবার জন্য ১৯২৮-২৯ নাগাত বোলপুর ব্রতীবালকদের একটি সমবায় ব্রতীবালক ভাণ্ডার খোলা হ'য়েছিল। তাতে থাকত ছাত্রদের ব্যবহারের জিনিস—খাতা. পেনসিল, চকোলেট ইত্যাদি। পরিচালনা, বিক্রয়, হিসাব, টাকা-পয়সা রাখা, এমনকি কলিকাতা থেকে পাইকারী দরে জিনিসপত্র কিনে আনা, সব দায়িত্বই থাকত প্রধানতঃ ব্রতী-বালকদের উপরে। তত্ত্বাবধান করতেন ব্রতীসংগঠক। প্রবন্ধলেখক নিজেই সেই ভাণ্ডারের একজন ব্রতী ছিলেন এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক। তারও আগে নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার মতো ছোট দোকান ছিল শ্রীনিকেতনে সমবায়ের ভিত্তিতে। নিকটবর্তী সাঁওতাল গ্রামে ১৩ জন সাঁওতাল সদস্য নিয়ে সাঁওতালদের জন্য একটি ছোট্ট মুদির-দোকান খোলা হ'য়েছিল। সে ব্যাপারটিও কম দিনের নয়। ছোট্ট দোকান, গুরুত্ব তার অল্প নয়; কারণ

নিঃসমবায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় নতুন করে সমবায়কে প্রতিষ্ঠিত করার সাহস বোধহয় মহাকবিদের মতো বেপরোয়া ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। কবি তাঁর 'বাঁশরী' ফেলে এলেন এই সমবায়ী সাঁওতালদের দোকানের উদ্বোধন করতে! ইতিমধ্যেই সমবায়ের ভিত্তিতে গ্রামে গ্রামে বা কেন্দ্রে সৃষ্ট হ'য়েছে ঋণদান সমিতি, সেচ সমিতি, তন্তুবায় সমিতি, ধান্য-ভাণ্ডার, স্বাস্থ্য-সমিতি। সমবায়ে বিশ্বাসী করে তুলবার জন্য এবং সমবায়ের শক্তিকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাবী কালকে নিজেরাই যাতে গড়ে তুলতে পারেন পল্লীবাসীরা, তারই চর্চা-প্রচেষ্টা এগুলি। পরিমাণের দিকে এর মূল্য না থাক, নতুনকে আহ্বান করে আনার দুর্লভ দায়িত্ব ছিল শ্রীনিকেতনের। স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে পল্লীকেন্দ্রে সরকারী উদ্যমে ও বিশেষ সাহায্যে। খাঁটি সমবায়ের ভিত্তিতে পাঁচ-সাতখানা গ্রাম নিয়ে প্রায় প্রতি পরিবারের যথাসাধ্য চাঁদা সংগ্রহ করে কোনো ব্যক্তির বাইরের ঘরে ডাক্তারখানা খোলা এবং অত্যল্প মূল্যে সদস্য-পরিবারের রোগীদের ঔষধ সরবরাহ করে অত্যল্প ব্যয়ে চিকিৎসককে সদস্য-পরিবারের গৃহে পাঠিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা শ্রীনিকেতনের সমবায়-প্রচেষ্টার বিশেষ পরীক্ষা। পল্লীতে চিকিৎসা ছিলনা, এখন চিকিৎসা সম্ভব এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পল্লীবাসীরা সমবায়ী হ'লে নিজেরাই পারেন, তার পথপ্রদর্শক শ্রীনিকেতন। সরকারী চেষ্টা এই দিকে আরো মনোযোগী হ'তে পারত—শ্রীনিকেতনের অভিজ্ঞতা আরো ব্যবহারে সার্থক হ'তে পারত।

সরকার অনেক অঞ্চলে কয়েকটি পল্লী নিয়ে একপ্রকার বহুমুখী সমিতি সংগঠনের চেষ্টা করছেন,—শিক্ষার দিকে, স্থানীয় জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের দিকে, শস্য-ভাণ্ডারের দিকে তাঁরা সংহত এক-একটি কেন্দ্র-সমিতি গোছের গড়ে তুলতে চাচ্ছেন। শ্রীনিকেতন তার সমবায় শক্তির বিকাশে ১৯৩৪ সালের পূর্বেই অনেকটা অগ্রসর হ'য়ে গিয়েছিল, তার চেষ্টা-আশা বেশ খানিকটা দানা বেঁধে উঠেছিল। পল্লী-অঞ্চলে একটি কেন্দ্রীয় সমিতির বহুমুখী দায়িত্বের বিবরণ পাওয়া যায় ১৯৩৪ সালে। সেই বহু-উদ্দেশ্য-সাধক সমিতির কর্তব্য রয়েছে দেখি (১) স্বাস্থ্য, (২) কৃষি, (৩) শিক্ষা, (৪) শিল্প, (৫) গ্রন্থাগার, (৬) সচিত্র বক্তৃতাদির দ্বারা লোকশিক্ষা, (৭) ধর্মগোলা বা সমবায় শস্য-ভাণ্ডার, (৮) স্থানীয় বিবাদ-বিরোধের নিষ্পত্তি—উকীল আদালতের দ্বারস্থ না হ'য়ে স্থানীয় নিরপেক্ষ বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিয়ে পল্লী-আদালত গঠন করে এই সব বিবাদের অধিকাংশেরই নিষ্পত্তি হ'য়ে যেত, শ্রীনিকেতনের কর্মী এই সব

নিষ্পত্তির সংগঠক ছিলেন এবং ন্যায়-অধিকারী ছিলেন। বর্তমানে আঞ্চলিক যে-সব স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা সরকার প্রবর্তন করতে চাইছেন, তার অনেক দিকের পরীক্ষা শ্রীনিকেতন করেছে। অনেক পরে দেশে সমবায় সম্বন্ধে, আঞ্চলিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সাড়া জাগছে; শ্রীনিকেতনের কর্মপরিধির অন্তর্বর্তী অঞ্চলে অনেক বিষয়ই পরিচিত। এমনকি শস্য-ভাণ্ডার নিয়েও শ্রীনিকেতনের পরীক্ষা যথেষ্ট মনোযোগের যোগ্যতা রাখে। সমবায়কে এমন করে মূল্য দেওয়া অসহযোগ বা লড়াইয়ের যুগে সত্যই নৈর্ব্যক্তিক মনোভাবের পরিচয়।

শ্রীনিকেতনের প্রতিদিনের কর্মধারায় প্রতিষ্ঠাতার কর্মদর্শন প্রতিফলিত হ'য়েছিল বলেই শ্রীনিকেতনকে তার প্রতিষ্ঠাতা থেকে আলাদা করে বোঝা বোধ হয় যায়না। শ্রীনিকেতন বর্তমান দেশ-পুনর্গঠনে সাড়ম্বরে স্বীকৃত না হ'লেও তার সত্যটুকু তার আপন স্থান করে নিয়েছে এবং প্রতিদিনই নিজেকে প্রকাশ করছে সাফল্যে আর ব্যর্থতায়। শ্রীনিকেতন কোনোদিনই গর্ব করে বলবেনা যে, তার পুরোভাগে বিজ্ঞানী পরিসংখ্যায়ক বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি ছিলেন। শ্রীনিকেতন তার প্রতিষ্ঠাতার সতর্কবাণী সর্বদা স্মরণে রেখেছিল—আগে মানুষকে পাওয়া চাই, তারপর চাই বিশেষজ্ঞের বিশেষ সাহায্য। এখনো সরকারী মহলে বা বিদ্বান্‌মহলে এই কথাটি বিস্ময়ের সঞ্চার করবে হয়তো। কিন্তু শ্রীনিকেতনে এই উপদেশটি ভুলবার নয়। প্রতিষ্ঠাতা বলছেন তাঁর সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানের কেন্দ্র বিশ্বভারতী সম্বন্ধে, '... it must produce all necessaries, devising the best means and using the best materials, calling science to its aid.' প্রয়োজনের সবই উৎপাদন করা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আদর্শ এবং বিজ্ঞানকে প্রতিদিনের কাজে আহ্বান করতে হবে। বিজ্ঞানকে প্রতিদিনের কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে অথচ তাকে প্রভু হ'তে দেওয়া হবেনা, বিজ্ঞানের বিশেষত্বকে সমগ্র অধিকার দান করা হবেনা। তিনি Elmhirst-কে পত্র লিখে বললেন, 'It was not the Kingdom of the Expert in the midst of the inept and ignorant which we wanted to establish, although the experts' advice is valuable.' চতুষ্পার্শ্বে অনিপুণ অজ্ঞ পল্লীবাসীদের মধ্যে শ্রীনিকেতনে বিশেষজ্ঞদের রাজ্য-প্রতিষ্ঠা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলনা। কারণ 'The villages are waiting for the living touch of creative faith and not for the cold aloofness of science ...' পল্লীবাসীর প্রয়োজন গড়ে ওঠার আশার বাণীর, বিজ্ঞানের সুখদুঃখাতীত চর্চার প্রয়োজন

তাঁদের কাছে নিতান্তই গৌণ। অনেক বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ 'know human facts without taking the trouble to know the man himself'. মানুষকে পল্লীবাসীকে সমগ্রভাবে জানতে হবে, তার জন্যে বিশেষজ্ঞের আংশিকতা তাঁর অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। এই সত্যটুকু শ্রীনিকেতন আজও বিশ্বাস করে, আজও বিশেষজ্ঞের মূল্য সর্বাধিক হ'য়ে দাঁড়ায়নি এস্থানে, যদিও বিশেষজ্ঞের দান নতমস্তকে গৃহীত হয়। সরকারী পর্যায়ে কর্মোদ্যমের প্রারম্ভেই হয়তো বিশেষজ্ঞের প্রাধান্য বেশী হ'য়ে উঠবে, এ আশঙ্কা আছে। তবে, শ্রীনিকেতন যেমন বহু দিকেই অগ্রদূত, এ বিষয়েও শ্রীনিকেতনের বলবার আছে। সরকারী বেসরকারী প্রচেষ্টায় সামগ্রিক বোধকে অগ্রাধিকার দিয়ে তবে বিশেষজ্ঞের সাহায্যের ব্যবস্থা থাকা ভালো।

শ্রীনিকেতনের শুরু হ'য়েছিল নৈরাশ্যের সাহারায় এতটুকু আশা-উদ্যানের মতো। অনেকের মনে সন্দেহ ছিল যে, এই এতটুকু রস অনন্তপ্রায় প্রয়োজনের দেশে কী দিতে পারে? নিজে শুকিয়ে যাওয়া ছাড়া তার ভবিষ্যৎ আর কী? প্রতিষ্ঠাতা কবি, আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ, অভয় দিয়ে বলেছিলেন, 'যাঁরা স্থূল পরিমাণের পূজারি, তাঁরা প্রায় বলে থাকেন যে আমাদের সাধনক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সংকীর্ণ, সুতরাং সমস্ত দেশের পরিমাণের তুলনায় তার ফল হবে অকিঞ্চিৎকর। এ কথা মনে রাখা উচিত—সত্য প্রতিষ্ঠিত আপন মহিমায়, পরিমাণের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নয়। দেশের যে অংশকে আমরা সত্যের দ্বারা গ্রহণ করি, সেই অংশেই অধিকার করি সমগ্র ভারতবর্ষকে। সূক্ষ্ম একটি সলতে যে শিখা বহন করে, সমস্ত বাতির জ্বলা সেই সলতেরই মুখে।' তিনি বলেছিলেন, '... it should not only have a shape, but also light ; ... A lighted lamp is, for us, the end, and not a lump of gold.' শ্রীনিকেতনে পরিমাণের কথা কখনো ভাবা হয়নি ; পরিমাণের কথা ভাবা হ'য়েছে কাজের সত্যাসত্যটুকু পরীক্ষা করবার জন্য। নির্ভর করা হ'য়েছে কাজের সত্যমূল্য আছে কিনা। সত্যমূল্য থাকলে, '... it might transcend its immediate limits of time, space and some special purpose.' সত্যের লক্ষণই হ'ল অদূর কাল স্থান ও লক্ষ্য অতিক্রম করে যায়। শ্রীনিকেতনের যে-সব কাজ এখনো চলছে তারও পরীক্ষা হবে তার সত্যমূল্যে। সরকারী বেসরকারী উদ্যমে ও পরিকল্পনায়, আজ না হ'ক, ভাবীকালে তা প্রতিফলিত হবেই। প্রতিষ্ঠা কথাটির মধ্যে স্থায়িত্বের আভাষ আছে এবং স্থায়িত্বের সম্ভাবনা আছে তারই

যার মধ্যে সত্য আছে। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে' এই গান হৃদয়ে নিয়ে লেখনী-বাহন কবি আরম্ভ করেন তাঁর পল্লীসাধনা; তার মূলে ও প্রকৃতিতে সত্য ছিল বলে আজ সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরেও তাকে দেখা যাচ্ছে।

কবি কামনা জানিয়ে গিয়েছেন তাঁর পল্লীপ্রয়াস সম্বন্ধে 'যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ করে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে'। আজ যদি সমগ্র দেশ নিরভিমানে অনাড়ম্বরে নিরলস হ'য়ে তাঁর কর্ম-প্রয়াসকে গ্রহণ করে, তাহ'লেই তাঁর শ্রীনিকেতনকে শাশ্বত আয়ু দান করা হবে, তাঁর চিত্তে উদ্ভাসিত সত্যকে আশ্রয় করা হবে, আর সেই হবে কবি-কর্মযোগীর প্রতি দেশের বিশুদ্ধ প্রণতি।

---

ইংরেজী উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হ'য়েছে: (১) *The Visva-Bharati Quarterly, Education Number, May-October 1947* এবং (২) *Rabindranath Tagore and Sriniketan*—Leonard Elmhirst, (৩) ১৯২৮ সালের ক্ষুদ্র বিবরণী থেকে।

বাংলা উদ্ধৃতি নেওয়া হ'য়েছে 'শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার-এর উদ্বোধন-অভিভাষণ ( ১৩৪৫, ২২শে অগ্রহায়ণ )' থেকে।

# স্বাদেশিকতা

[ "আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারম্বার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকী ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করিনে। আপনপক্ষের কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে আছি বলেই অপরপক্ষের কথা নিয়ে এত অত্যন্ত অধিক করে আমরা আলোচনা করে থাকি। তাতে শক্তিহ্রাস হয়। স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই। সে পরিচয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত। দেশের সেবার মধ্যে দেশের প্রতি প্রীতির প্রকাশ কোনো বাহ্য অবস্থান্তরের অপেক্ষা করে না, তার নির্ভর একমাত্র আন্তরিক সত্যের প্রতি। আজ যদি দেখি সেই প্রকাশ অলস উদাসীন, তবে বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ পেলেই অন্তরের সেই জড়তা দূর হবে, এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে।

১৩৩৬ রবীন্দ্রনাথ"

রাজনীতিকের সক্রিয় ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের নয়। তবু বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক সংকট এবং বিশেষত এদেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া তাঁর চিন্তাধারার বেশ একটা বড়ো অংশ জুড়ে রেখেছিল, এ-কথা সত্যি। ইংরেজ শাসকের সঙ্গে শাসিত ভারতবাসীর সম্পর্কের এবং বিরোধের দীর্ঘ ইতিহাসের বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে রচিত হয়েছে। কবির পরলোকগমনের পর উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে বিয়াল্লিশের আন্দোলন ও ক্রিপ্‌স্ মিশনের দৌত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্বশেষে ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ্-ভুক্তি এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিকে স্বীকৃতি দিয়ে স্বাধীনতালাভ এবং স্বরাজ-আন্দোলনের যবনিকাপাত। শেষের এই ক'টি বছরকে বাদ দিলে, রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম যুগ থেকেই কবি তার গতি-প্রকৃতিকে লক্ষ্য করবার অবকাশ পেয়েছেন। এর স্বরূপ নিয়ে তাঁর যথার্থ মুক্তিকামী ও সত্যসন্ধানী মনে বারম্বার প্রশ্ন

জেগেছে। শিক্ষা, ধর্ম, অর্থনীতি এবং সর্বোপরি স্বাদেশিকতামূলক বহু রচনায় সে-প্রশ্ন তিনি বারবার তুলেছেন। কবির প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রায় ষাটবছরের জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপ বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন নেতার নেতৃত্বে নতুন নতুন আকারে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ-কথা অপ্রিয় হলেও, সত্য যে, সেই দীর্ঘকাল-ব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের মর্মস্থলে যথার্থ সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। ভারতবাসীর মুক্তি-যজ্ঞকে তিনি কালোপযোগী করে ভাববার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মূল সংশয়টি তাঁর মন থেকে দূর করে দেবার মতো শক্তির ঐশ্বর্য সে-আন্দোলনের মধ্যে ছিল না। তার মধ্যে চিন্তার মর্মান্তিক দৈন্য, উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তা, পথনির্ণয়ে ভ্রান্তবুদ্ধির শক্তিমত্ততা কবির মনকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছে। তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গোড়ার ভুলটা ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেশব্যাপী সে তাণ্ডবের মধ্যে তাঁর বক্তব্যকে প্রায় সকলেই উপহাসে বিদ্রূপে জর্জরিত করেছিলেন, এর ঐতিহাসিক দলিল আছে। সে অপ্রিয় এবং তিক্ত ইতিহাসের কিছু-না-কিছু এ আলোচনাপ্রসঙ্গে আসতে বাধ্য। নচেৎ রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের অর্থই অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার উপর বিভিন্ন কালের তৎসাময়িক পটভূমির কিছু কিছু প্রভাব এমনভাবে আছে যে, সতর্কভাবে সে-চিন্তাধারার বিবর্তনকে লক্ষ্য না করলে, ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো বক্তব্যকে স্ববিরোধী মনে হওয়াও বিচিত্র নয়। এ সম্বন্ধে কবির নিজের বক্তব্য,

> "আমি জানি, আমার মত ঠিক যে কী তা সংগ্রহ করা সহজ নয়। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যেহেতু বাক্য রচনা করা আমার স্বভাব সেইজন্যে যখন যা মনে এসেছে তখনি তা প্রকাশ করেছি। রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে, প্রয়োজনের সঙ্গে সেই-সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিক ভাবে দেখাই সংগত।"

যে-কোনো ধারাবাহিক চিন্তাধারার মর্মকথা অনুসন্ধানে এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব খুবই বেশী। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—'স্বদেশ', 'শিক্ষা' বা 'শান্তিনিকেতন' ইত্যাদি গ্রন্থে কোনো কোনো রচনায় রাষ্ট্র বা সমাজ সম্বন্ধে কবির যেসব বক্তব্য আছে তার অনেকগুলিই পরবর্তীকালে সংকলিত 'কালান্তর'

গ্রন্থের চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ সমধর্মী নয়। বিরাট কাল-ব্যবধান এবং বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক ভাবধারার পরিবর্তিত স্বরূপ এক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই কবির চিন্তাজগতে নতুন ভাবনার উন্মেষ ঘটিয়েছে। সুতরাং তাঁর বক্তব্যের অর্থ নির্ণয় করতে গেলে যথেষ্ট সতর্কতা এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ-রীতির প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, কোনো রাষ্ট্রদর্শনের উদ্ভাবনকর্তা নন। তা সত্ত্বেও তাঁর রচনায় রাষ্ট্রদর্শন যে আলোচিত হয়েছে এবং তা থেকে একটা নির্দিষ্ট অভিমত তৈরী হয়ে উঠতে পেরেছে, তার কারণ শিক্ষা, সমাজ এবং মানবিক চেতনার সঙ্গে এ-যুগে রাষ্ট্রনীতির সম্পর্কটিকে অগ্রাহ্য করা চলে না। রবীন্দ্রনাথও অগ্রাহ্য করেননি। বিশেষত, ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনটা তাঁর সমসাময়িক কালে এত বাস্তব সত্য ছিল যে, তার প্রসঙ্গে তিনি নির্বাক থাকাটা অবশ্যই সমীচীন বোধ করেননি। বিশেষত, তাঁর মতে সে-আন্দোলনের প্রকৃতি যখন সহজ এবং স্বাভাবিক নয়।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তির চেয়ে মানুষের চিত্তশক্তি এবং তারই সমন্বয়ে সুবৃহৎ সমাজশক্তির স্থান অনেক বেশী। সম্মিলিত সমাজশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তিকে তিনি যথার্থ কল্যাণশক্তি ব'লে গ্রহণ করেননি। তার অস্তিত্বকে সমাজের অংশরূপেই তিনি দেখেছেন।

> "আমি জানি রাষ্ট্রব্যাপার সমাজের অন্তর্গত ; কোনো দেশের ইতিহাসে তার অন্যথা হয়নি ; সামাজিক ভিত্তির কথা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রিক ইমারতের কল্পনায় মুগ্ধ হয়ে কোনো লাভ নেই।"

এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যাবে তাঁর আর একটি রচনায়। সেখানে কবি বলেছেন,

> "চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজেব সম্মিলিত শক্তিতে। ··· রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান ; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে। কিন্তু চীন ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে, তার কারণ সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত।"

সমাজ-মানসের উপর রাষ্ট্রশক্তির সর্বময় কর্তৃত্বের ফলে জনশক্তি নির্ভরশীল হতে হতে শেষে নির্জীব হয়ে পড়ে। তাতে দেশের বা সমাজের সামগ্রিক অবলুপ্তির পথ প্রশস্ত হয়। সে অবস্থায় রাষ্ট্রশক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের অধঃপতনের প্রত্যক্ষ কারণ হ'ল, একমাত্র আশ্রয়ের অভাব। রাষ্ট্রকর্তৃত্ব যদি সার্বভৌম হয়ে কোনো দেশকে এই অবস্থায় এনে দাঁড় করায় তবে সে রাষ্ট্রবিধি অবাঞ্ছিত। রাষ্ট্রসম্পর্কে উপরোক্ত বক্তব্যের এই হল তাৎপর্য। রাশিয়ার জার-শাসনকে উৎখাত করে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। তা প্রথমে রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো ভাবান্তরই সৃষ্টি করেনি। কারণ, য়ুরোপে তখন পর্যন্ত রাষ্ট্রশক্তির যে বিভিন্ন রূপ বিদ্যমান, তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে কোনো-না-কোনো 'ইজ্‌ম্‌'-এর আদর্শের কথা প্রচার করা হলেও, মূলত সেগুলি ছিল ধনতন্ত্র বা সাম্রাজ্যতন্ত্রেরই মাজাঘষা মূর্তি। সুতরাং রাশিয়ায় জারতন্ত্র আর নবপ্রবর্তিত সমাজতন্ত্রের হাতবদলের মধ্যে কবি মহত্তর কল্যাণধর্মের কোনো ইঙ্গিত তখনও পাননি। ১৩৩৩ সালে প্রমথনাথ চৌধুরীকে লিখিত একখানি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন,

> "রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বলশেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশ মোড়া দেওয়া। পূর্বে যে ফোড়াটা বাঁ হাতে ছিল, আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে যদি তাণ্ডবনৃত্য করা যায়, তাহলে সেটাকে বলতেই হবে পাগলামি।"

এরই কিছুকাল পরে রাশিয়া পরিভ্রমণকালে সে-দেশের সমাজ-মানসের বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখে কবি বিপুল উচ্ছ্বাসে বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, আন্তরিক আশীর্বাদে অভিষিক্ত করেছেন সে-দেশের সমাজবাদের প্রবর্তকগণকে।

> "আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু কখগঘ শেখায়নি, মনুষ্যত্বকে সম্মানিত করেছে।"

* * *

> "যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক। যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল—তারা আজ সমাজের অন্ধকুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন।"

কবির এই উচ্ছ্বসিত উক্তির মূলে যে সন্তোষ, যে পরিতৃপ্তি, তার মূলে ওই সর্বাঙ্গীণ সমাজচিত্তের পরিবর্তনটি। রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তনেই এতবড়ো সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কবির মনে যা দাগ কেটেছিল তা ওই শক্তিটা নয়, শক্তির কল্যাণধর্মী প্রকাশটি।

এদেশের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে ওই সমাজচেতনার অস্তিত্বকেই কবি বারম্বার খুঁজেছেন। কিন্তু তা পাননি ব'লেই এই আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতার কথা তিনি গভীর ক্ষোভের সঙ্গে ক্রমাগত উল্লেখ করেছেন। এদেশের স্বরাজ-আন্দোলনের অনুষঙ্গ হিসাবে 'নেশন' বা জাতির যে ধুয়াটি প্রবল হয়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে এদেশের নাড়ীর যোগকে কবি স্বীকার করেননি। তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন,

> " 'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশনগঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। ··· আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।"

রবীন্দ্রনাথের এই সুস্পষ্ট সতর্কবাণী সে-যুগে উপহাসের বিষয় হয়েছিল। কারণ য়ুরোপ থেকে ধার-করা পলিটিক্‌সের বহিরঙ্গটাই তখন জৌলুসে, ছটায় এদেশের শিক্ষিত সমাজকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। তখন 'পলিটিক্‌স্ আগে, দেশ পরে'। মুক্তি-আন্দোলনের ধারণাটাও যখন অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে, তখন তার বাইরের চেহারাটা আরও কৌতুককর। সেই অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলেছেন,

> "আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে তখনো দেখা যায়, সেই আড়ম্বরের সমস্ত মালমশলার গায়ে ছাপমারা 'Made in Europe'।
>
> ··· একদিন ইংরেজের নকল করে আমাদের ছেঁড়া পলিটিক্‌স্ নিয়ে পার্লামেন্টীয় রাজনীতির পুতুলখেলা খেলতে বসেছিলেম। তার কারণ, সেদিন পলিটিক্‌সের আদর্শটাই য়ুরোপের অন্য সব কিছুর চেয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর ছিল।"

উনবিংশ-শতাব্দী-জাত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থার স্বরূপ আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "প্রথম যুগের নেতারা অগত্যা নৌকো বানিয়েছিলেন দরখাস্তের পার্চ্‌মেণ্ট দিয়ে। সেটা দাঁড়িয়েছিল খেলায়।" সে-খেলার সঙ্গে দেশের মাটির যোগ ছিল না। দরখাস্ত-সম্বল সেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির আন্দোলন। বৃহত্তর সামাজিক পটভূমির প্রশ্ন সেখানে উহ্য।

> "তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গবর্মেণ্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতেম। আমাদের দেশে পোলিটিকাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনের[১] তরুণেরা ঠিকমত কল্পনা করতেই পারবেন না। তখনকার পলিটিক্‌সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সম্মিলনীতে, গ্রাম্যজনমণ্ডলীসভাতে, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারতেন না। রাজশাহী-সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলাভাষা প্রবর্তন করবার চেষ্টা যখন করি, তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন। বিদ্রূপ ও বাধা আমার জীবনের সকল কর্মেই আমি প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছি, এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। পরবৎসরে রুগ্ন শরীর নিয়ে ঢাকা-কনফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষ্যে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই ব'লেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্‌যোগ করেছি। বাঙালির ছেলের পক্ষে যে গালি সবচেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানিনে। এতবড়ো দুঃসহ লাঞ্ছনা আমি নীরবে সহ্য করেছিলুম তার একটা কারণ ইংরেজিভাষা-শিক্ষায় বাল্যকাল থেকে আমি সত্যই অবহেলা করেছি; দ্বিতীয় কারণ, পিতৃদেবের শাসনে তখনকার দিনেও আমাদের পরিবারে পরস্পর পত্র লেখা প্রভৃতি ব্যাপারে ইংরেজি-ভাষা-ব্যবহার অপমানজনক বলে গণ্য করা হত।[২]

[১] রচনাকাল ১৩৩৬ সাল

[২] "স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া

তৎকালীন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ভিতরকার যে মর্মান্তিক মানসিক দৈন্য ও ভ্রান্তবুদ্ধির পরিচয় এর মধ্যে পাওয়া যায়, তার সম্বন্ধে নতুন করে ভাষ্যরচনার প্রয়োজন নেই।

পরবর্তীকালে গান্ধিজীর নেতৃত্বে আন্দোলনের স্বরূপ অবশ্যই পালটেছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় চিন্তার মধ্যে সমাজবোধের অভাবটুকু ঘোচেনি। তার ফলে পরিবর্তিত ধারার সেই স্বরাজ-আন্দোলনও দেশের বিপুল কর্মশক্তিকে বহুবার বিপথে চালনা করে সে-শক্তির অপচয় ঘটিয়েছে। এতবড়ো অপচয়কে রবীন্দ্রনাথ কোনো আশু প্রয়োজনের দোহাইয়ে মানিয়ে নিতে চাননি। দেশের জন-মানস যখন এতটুকু সচেতন নয় তখন অতবৃহৎ শক্তিটাকে সংহত করবার প্রয়োজনটাই ছিল গোড়ার কথা—তাকে উচ্ছৃঙ্খল করে তোলা নয়। সন্তানের জননী হবার আগে নাবালিকার পক্ষে দেহে মনে মাতৃত্বের উপযুক্ত হয়ে ওঠাটা অপরিহার্য, নচেৎ সে যথার্থ মা হতে পারে না। কোলের সন্তান তার দৈনন্দিন জীবনে এক বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়ায়। বৃহত্তর রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক জীবনের সার্থকতার ক্ষেত্রেও তেমনি প্রস্তুতিপর্বটি একান্ত আবশ্যকীয়। তাকে কোনো-মতেই অস্বীকার করা চলে না। স্বরাজসাধনার সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ নাটকীয় ঘটনাবলী যখন একের পর এক ঘটে চলেছে, তার পেছনে প্রস্তুতির প্রকাণ্ড দৈন্য রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে বিচলিত করেছে। উদ্দেশ্যের সার্থকতার চেয়েও পোলিটিকাল মাতন যে যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রকটতর ছিল, এ ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। বয়কট বা অসহযোগ আন্দোলন সেই মাতনের আগুনকে দাউ দাউ করে জ্বালিয়েছে, কিন্তু আগুন নেভার পর শান্তি-যজ্ঞের ফোঁটাটি দেশবাসীর কপালে পড়েনি। ইংরেজ জানত, এ আন্দোলন শিক্ষিত মানসের ক্ষোভপ্রকাশ মাত্র, দেশের মর্মমূল থেকে উৎসারিত মুক্তি-কামনার যথার্থ বিপদ-সংকেত নয়। তারা নিশ্চিন্তমনে কেবল লাঠি আর বুলেট সম্বল করেই অপ্রতিহত দাপট বজায় রেখেছে তখন। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের সঙ্গে আপোষ চাননি; দেশের প্রাণশক্তিকে অপচয় থেকে রক্ষা করবার অনুরোধটাই পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন নেতৃবৃন্দের খাস-দরবারে। তাঁকে

---

রাখিয়াছিল। বস্তুত সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়া-ছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।" [ জীবনস্মৃতি ]

মারাত্মক রকমে ভুল বোঝা হয়েছিল, তার নজীর ইতিহাসে আছে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নামে প্রচণ্ড সেই মাতন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে, উপন্যাসে, কাব্যে প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করেননি।

"… ক্রোধের তৃপ্তিসাধন হচ্ছে একরকমের ভোগসুখ; সেদিন এই ভোগ-সুখের মাৎলামিতে আমাদের বাধা অতি অল্পই ছিল—আমরা মনের আনন্দে কাপড় পুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, পিকেট করছি, যারা আমাদের পথে চলছিল না তাদের পথে কাঁটা দিচ্ছি …। এই সকল অমিতাচারের কিছুকাল পরে একজন জাপানি আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'তোমরা নিঃশব্দে দৃঢ় এবং গূঢ় ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে পারনা কেন? কেবলই শক্তির বাজে খরচ করা তো উদ্দেশ্যসাধনের সদুপায় নয়।' তার জবাবে সেই জাপানিকে আমার বলতে হয়েছিল যে, উদ্দেশ্যসাধনের কথাটাই যখন আমাদের মনে উজ্জ্বল থাকে তখন মানুষ স্বভাবতই আত্মসংযম ক'রে নিজের সকল শক্তিকেই সেইদিকে নিযুক্ত করে। … ইংরেজ দোকানদার যাকে বলে *reduced price sale*, সেদিন যেন ভাগ্যের হাটে বাঙালির কপালে পোলিটিকাল মালের সেইরকম সস্তা দামের মৌসুম পড়েছিল। যার সম্বল কম, সস্তার নাম শোনবামাত্র সে এতবেশী খুশি হয়ে ওঠে যে, মালটা যে কী আর তার কী অবস্থা তার খোঁজ রাখে না, আর যে ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করে তাকে তেড়ে মারতে যায়। মোট কথা, সেদিনও আমাদের লক্ষ্য ছিল, ধ্যান ছিল ওই বাইরের মালটা নিয়ে। …"

এরই পাশাপাশি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের একটি অংশের উদাহরণ দেওয়া যাক:

নিখিলেশ॥ আমি তোমাকে সত্য বলছি সন্দীপ, দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যায়কে কর্তব্য, অধর্মকে পুণ্য ব'লে চালাতে চাও, তখন আমার হৃদয়ে লাগে বলেই আমি স্থির থাকতে পারিনে।

সন্দীপ॥ ইংরেজ, ফরাসি, জর্মান, রুশ এমন কোন্ সভ্যদেশ আছে যার ইতিহাস নিজের দেশের জন্যে চুরির ইতিহাস নয়?

নিখিলেশ॥ সে চুরির জবাবদিহি তাদের করতে হবে, এখনও করতে হচ্চে! ইতিহাস এখনও শেষ হয়নি। একটা জিনিস কি দেখতে পাচ্চনা—ওদের পলিটিক্সের ঝুলিভরা মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেস্টিজ-রক্ষার লোভে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান, এই যে সব পাপের বোঝা নিয়ে চলেছে এর ভার কি কম?

আর এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বুকের রক্ত শুষে খাচ্চে না? দেশের উপরেও যারা ধর্মকে মানছে না, আমি বলছি তারা দেশকেও মানছে না।

বিমলা॥ দেখো, সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে কেবল আমাদের এই হাটে বিলেতি কাপড় আসছে, এটা কি ভালো হচ্চে?

নিখিলেশ॥ কী করলে ভালো হয়?

বিমলা॥ ওই জিনিসগুলো বের করে দিতে বল না!

নিখিলেশ॥ জিনিসগুলো তো আমার নয়!

বিমলা॥ কিন্তু হাট তো তোমার!

নিখিলেশ॥ হাট আমার চেয়ে তাদের অনেক বেশি যারা ওই হাটে জিনিস কিনতে আসে।

বিমলা॥ তারা দিশি জিনিস কিনুক না!

নিখিলেশ॥ যদি কেনে আমি খুশি হব, কিন্তু যদি না কেনে আমি অত্যাচার করতে পারব না।

বিমলা॥ অত্যাচার তো তোমার নিজের জন্যে নয়, দেশের জন্যে।

নিখিলেশ॥ দেশের জন্যে অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা। সে কথা তুমি বুঝতে পারবে না।

সারা দেশের অগণিত মানুষকে মনুষ্যত্বের যথার্থ শিক্ষায় বঞ্চিত রেখে নেতৃবৃন্দ যখন 'সস্তায় কিস্তিমাৎ'-এর স্বপ্নে মশগুল তখন রবীন্দ্রনাথ এই বিরাট অসংগতির দিকে বহু ভাবে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অভিমতকে সেদিন অনেকেই এতটুকু মর্যাদা দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। রবীন্দ্রনাথ নিজে গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন এবং নেতা হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব, আদর্শনিষ্ঠার প্রতি সম্পূর্ণ সশ্রদ্ধচিত্ত হয়েও তাঁর প্রদর্শিত সমস্ত উপায়কে তিনি নির্বিচারে স্বীকার করে নিতে পারেননি। গান্ধীজীর সঙ্গে মতবিরোধের জন্যে কবি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রীতির সম্পর্কটা বজায় রাখতে গিয়ে জোড়াতালির আপোষ-রফা করেননি।

"বহুকাল থেকে আমাদের ধারণা ছিল স্বরাজ পাওয়া দুর্লভ; এমন সময়ে যেই আমাদের কানে পৌঁছল যে, স্বরাজ পাওয়া খুবই সহজ এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাওয়া অসাধ্য নয়, তখন এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে, বিচার করতে লোকের রুচি রইল না। তামার পয়সাকে সন্ন্যাসী সোনার মোহর করে দিতে পারে, এ-কথায় যারা মেতে ওঠে তারা বুদ্ধি

নেই বলেই যে মাতে তা নয়, লোভে পড়ে বুদ্ধি খাটাতে ইচ্ছে করেনা বলেই তাদের এত উত্তেজনা।"

যথার্থ মুক্তির জন্যে যে মূল্য দেবার প্রয়োজন, দেশের জনমানসে তার ধারণা সেদিন ছিল না। কিন্তু উপর-মহলেও সে-প্রস্তুতির কোনো উদ্যোগ ছিল না। সেখানে চিন্তার যে জড়তা দেখা গিয়েছিল, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে দেশের নজর ফেরাবার চেষ্টা করেছেন।

"চরকা-কাটা স্বরাজসাধনার প্রধান অঙ্গ এ-কথা যদি সাধারণে স্বীকার করে তবে মানতেই হয়, সাধারণের মতে স্বরাজটা একটা বাহ্য ফললাভ।

* * *

এইরকম অন্ধসাধনায় মহাত্মার মতো লোক হয়তো কিছুদিনের মতো আমাদের দেশের একদল লোককে প্রবৃত্ত করতে পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের 'পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে। ··· আমি মনে করি এরকম মতি স্বরাজলাভের পক্ষে অনুকূল নয়।"

চরকা-কাটার মতো একটি প্রক্রিয়াকে রবীন্দ্রনাথ স্বরাজসাধনার আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে কোনোমতেই গ্রহণ করতে পারেননি। চরকা বা খদ্দরের সঙ্গে অর্থনীতির যেটুকু সম্পর্ক ছিল, তাও অসম্পূর্ণ। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল্য তত বড়ো ছিল না, যত বড়ো করে তাকে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে, চরকা বা খদ্দর রাজনৈতিক ইমোশনের কিছুটা রসদ যোগানো ছাড়া অন্য কোনো বাস্তব প্রয়োজন মেটাতে পারেনি।

জাতীয় আন্দোলনের একটা পর্যায়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সত্যাগ্রহের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটির মধ্যে 'চিত্তশক্তির উদ্‌বোধন'-এর প্রশ্ন জড়িত আছে। 'আন্তরিক সত্যের উপর অবিচল নির্ভরতা' সত্যাগ্রহের শক্তির উৎস। এই শক্তির উপলব্ধি কি সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সময়েই ঘটেছে, নাকি তারও আগে এর নিদর্শন ছিল?

১৯০৯ সালে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের একটি অংশের উদ্‌ধৃতি দেওয়া গেল। রাজা প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে। বিদ্রোহের নেতা সর্বত্যাগী ধনঞ্জয় বৈরাগী।

প্রতাপাদিত্য ॥ তুমি এই সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ?

ধনঞ্জয় ॥ খেপাই বইকি। নিজে খেপি ওদের খেপাই, এই তো আমার কাজ!

প্রতাপ ॥ দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি ক'রে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক। মাধবপুরের প্রায় দু-বছরের খাজনা বাকি—দেবে কিনা বলো ?

ধনঞ্জয় ॥ না, মহারাজ, দেব না।

প্রতাপ ॥ দেবে না ! এত বড়ো স্পর্ধা !

ধনঞ্জয় ॥ যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপ ॥ আমার নয় !

ধনঞ্জয় ॥ আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন, এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী ব'লে !

প্রতাপ ॥ তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে !

ধনঞ্জয় ॥ হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি—তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিসনে।

১৯০৯ সালে রাষ্ট্রনেতাদের কাছে সত্যাগ্রহ অজ্ঞাত বস্তু ছিল। পরবর্তীকালে সত্যাগ্রহের যে রূপ দেখা গেছে, তার আদর্শ আর চিত্র রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই তার অনেক আগে পাওয়া গেল।

আন্দোলনের নেতৃবর্গের কাছে রবীন্দ্রনাথের একদা পরিচয় ছিল *novice in politics* ব'লে। ১৯১৭ সালে আনি বেসাণ্ট অন্তরীণাবদ্ধ হবার পর টাউনহলে একটি প্রতিবাদ-সভার ব্যবস্থা হয়। সভার দিন তিনেক আগে ইংরেজ সরকার জুলুম প্রয়োগ করে সে-সভা বন্ধ করলেন। *Novice in politics* রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠকে তাই ব'লে তাঁরা রোধ করতে পারেননি। 'রামমোহন লাইব্রেরি'র কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমন্ত্রণ এলো। কবি সেই সভায় পাঠ করলেন বিখ্যাত 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটি।

শাসক ইংরেজকে ইংরেজ ব'লে তিনি ঘৃণা করেননি, ভর্ৎসনা করেছেন অত্যাচারী হিসেবে ইংরেজকে। জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর পাঞ্জাবে 'মার্শাল ল' জারি হয়েছে, কোনো খবর কাগজে প্রকাশিত হচ্ছে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কানে তা পৌঁছল। তিনি ছটফট করতে লাগলেন ; রাত্রিতে ঘুম হয় না। এক চিঠিতে লিখলেন,

"আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম সহ্য করতে পারি, কিন্তু

মর্ত্যের প্রতাপ আমার আর সহ্য হয় না; এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে।"

কবি কলকাতায় এসে বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডকে একখানি চিঠি লিখে ইংরেজের বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করলেন।

স্বরাজ-আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার অর্থ যে শাসক ইংরেজের পক্ষ সমর্থন করা নয়, এটুকু বুঝতে এর পরেও ঢের সময় লেগেছিল নেতৃবৃন্দের। অন্তত, ইতিহাস তাই বলে।

স্বরাজ-আন্দোলনের সঙ্গে নেশন-বোধ-পুষ্ট যে সর্বভারতীয় জাতিত্বের রব উঠেছিল, তাকে তিনি আরোপিত একটি স্লোগানের চেয়ে বেশী মূল্য দেননি। তিনি লক্ষ্য করেছেন, 'ভারতবর্ষের এক প্রদেশের সঙ্গে আর-এক প্রদেশের বিচ্ছেদের সাংঘাতিক লক্ষণ নানা আকারেই থেকে থেকে প্রকাশ' পেয়েছে। তার ওপর ছিল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,

"কারণ যাই হোক, প্রদেশে প্রদেশে জোড় মেলেনি। মনে পড়ছে আমার কোনো-এক লেখায় ছিল, যে জীর্ণ গাড়ির চাকাগুলো বিশ্লিষ্ট, মড়্‌মড়্‌ ঢল্‌ঢল্‌ করে যার কোচবাক্স, জোয়ালটা খসে পড়বার মুখে, তাকে যতক্ষণ দড়ি দিয়ে বেঁধে-সেঁধে আস্তাবলে রাখা হয় ততক্ষণ তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে ঐক্য কল্পনা করে সন্তোষ প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু যেই ঘোড়া জুতে তাকে রাস্তায় বের করা হয় অমনি তার আত্মবিদ্রোহ মুখর হয়ে ওঠে।"

কবির দৃষ্টিতে অনৈক্যের এই যে রূপটি ধরা পড়েছিল, এটি ভারতের স্বরাজ-সাধনাকে বহু ভাবে প্রতিহত করেছে। এ অবস্থা বাঞ্ছিত নয়, কিন্তু এর অস্তিত্ব ছিল বাস্তব সত্য। ভিতরকার এই প্রকাণ্ড বাধাটাকে দূর না করা পর্যন্ত সত্যিকারের মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়, এ-কথা কবি বারম্বার উচ্চারণ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন,

"সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের কথা, তার পরিচয়; তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার অভাব —আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে—তখন দেশের জনসংঘের এই চিত্তদৈন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো

বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে এ দেশে স্বরাজ কায়েম হতে পারে এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।”

অতএব দেশের মর্ম থেকে অশিক্ষা আর অসত্যকে আগে উৎপাটন করা প্রয়োজন।

“... ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে আপাতত এই গড়াপেটার কাজটাই কি সবচেয়ে দরকার নয়? যমের ফাঁসি-বিভাগের সিংহদ্বার থেকে বাংলাদেশের যে-সব যুবক ঘরে ফিরে এসেছেন, তাঁদের লেখা প'ড়ে, কথা শুনে আমার মনে হয় তাঁরা এই কথাই ভাবছেন। ... বাইরের দিক থেকে কোনো অন্ধবাধ্যতা-দ্বারা এ হতেই পারে না, ভিতরের দিক থেকে জ্ঞানালোকিত চিত্তে আত্মোপলব্ধি-দ্বারাই এ সম্ভব।”

স্বরাজ-আন্দোলনের মধ্যে ফাঁকি দিয়ে কাজ উদ্ধারের মনোভাব রবীন্দ্রনাথের মনকে বারবার আলোড়িত করেছে। বিক্ষুব্ধকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন,

“কোনো বাহ্য পদ্ধতিতে পরের কাছে ভিক্ষা করে আমরা স্বাধীনতা পাব না; কোনো সত্যকেই এমন করে পাওয়া যায় না।”

কি শিক্ষা, কি দেশাত্মবোধ—দুটি ক্ষেত্রেই একেবারে গোড়া থেকে গড়ে তোলবার উপরেই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তা যেদিন সত্য হয়ে উঠবে, সেদিন ‘সেই সত্যের সাহায্যেই পরাধীনতার বন্ধনও ছিন্ন হবে’।

মানুষের মধ্যে কল্যাণশক্তির উদ্বোধন একদিন হবে, এ বিশ্বাস নিয়েই তিনি শেষজীবনে ঘোষণা করেছেন,

“আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।”

বিশ্বমানবতার বিশাল প্রাঙ্গণে কবির সেই বিশ্বাস একদিন অবশ্যই সত্য হয়ে রূপ নেবে।]

# রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা

## শচীন সেন

তত্ত্বের দিক দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ হল রাজনীতির প্রাণধর্ম। রবীন্দ্রনাথের মননধারা রাজনৈতিক ভাবনায় সমৃদ্ধ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের দায় মহামানবের দায়। অন্তহীন মানুষের গতি, তার গতি কর্মের গতি আগামীকালের অভিমুখে, এই আগামীকালকে গড়তে হলে অতীতের স্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে চলবেনা। মানুষের সমস্ত অনুষ্ঠান,—তার রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র,—তখনই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যখন মানুষ ত্যাগ করতে শেখে, ভালবাসতে জানে এবং সেবার ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট না হয়।

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় ও সাধনায় বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও আদর্শ সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে ভেবেছিলেন। সেই চিন্তনধারাকে বিচার করতে হলে রবীন্দ্রভাবনার বিশিষ্ট ভঙ্গিকে আমাদের জানতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মতে, দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ। দেশে বৈচিত্র্য আছে, বিরোধ আছে,—তার সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা হল স্বাদেশিকতার প্রথম ও প্রধান কাজ। যুগ-যুগান্তরের প্রবাহিত চিন্তাধারা আছে, সেই অতীতকালের তপস্যা বর্তমানকে সমুজ্জ্বল করবে এবং আগামীকালকে ফলবান করবে। মানুষ আপনাকে জানতে পারে যখন সে ভাবে যে, সে অমৃতের সন্তান। তাই অতীতকে স্বীকার করে বর্তমানকে ভবিষ্যতের জন্য উৎসর্গ করতে হবে। যাঁরা অমৃতের সন্তান, তাঁদের চিন্তা, তাঁদের কর্ম, জাতিবর্ণনির্বিচারে সমস্ত মানুষের। সবাই তাঁদের সম্পদের

উত্তরাধিকারী। রবীন্দ্রনাথের মতে, "তাঁরাই প্রমাণ করেন সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক-মানুষ বিরাজিত। সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে বলেই মানুষের বাস দেশে।" মানুষের দেশপ্রেম তখনই সার্থক যখন মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে। মানুষ এ কথাটা বুঝেছে যে, তার এগিয়ে যেতে হবে। পরিপূর্ণতার দিকে মানুষের আকর্ষণ, যদিচ এই পরিপূর্ণতা কখনো সে লাভ করতে পারবে না। অনিশ্চিত আগামীর দিকে মানুষের প্রাণপণ আগ্রহ। "এই যে অনিশ্চিতের মধ্যে অনাগতের মধ্যে, তার চিরনিশ্চিতের সন্ধান অক্লান্ত, তারই সংকটসংকুল পথে মানুষ বার বার বাধা পেয়ে ব্যর্থ হয়েও যাত্রা বন্ধ করতে পারলেনা।" এই যাত্রাপথের শেষ নেই, কোথাও নৌকা বেঁধে নিদ্রা দেবার স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হবে, "ঊর্ধ্বে কেবল ধ্রুবতারা দীপ্তি পাচ্ছে এবং সম্মুখে কেবল তটহীন সমুদ্র, বায়ু অনেকসময়ই প্রতিকূল এবং তরঙ্গ সর্বদাই প্রবল।"

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে সেইখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ, তুমিই কেবল একলা থামবে, আর কেউ থামবেনা। জগৎ-প্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি না চলতে পার তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার উপর এসে আঘাত করবে। একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে, কিম্বা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হয় অবিশ্রাম চলো এবং জীবনচর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও, পৃথিবীর এইরকম নিয়ম।"

রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছেন যে, "যদি প্রতিষ্ঠা চাও তো চিত্তের উদার প্রসার, সর্বাঙ্গীণ নিরাময় সুস্থভাব, শরীর ও বুদ্ধির বলিষ্ঠতা, জ্ঞানের বিস্তার এবং বিশ্রামহীন তৎপরতা চাই।" দেশ ও সমাজ যত উন্নতিলাভ করবে, তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের জটিলতা বেড়ে যাবে। কিন্তু জটিলতার ভয়ে যদি নির্জীবতাকে সাধুতা এবং অক্ষমতাকে সর্বশ্রেষ্ঠতা বলে প্রতিপন্ন করতে চাই, তাহলে সদ্‌গতির পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ বলবান ছিল, তাই তার মধ্যে বহু পরিবর্তন, সমাজবিপ্লব, বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যেত। মানবসমাজে ভালো-মন্দ, আলোক-অন্ধকার সবকিছুই থাকে। কিন্তু মানুষ যদি জাগ্রত ও

জীবিত থাকে, তাহলে ভিন্নতার মধ্যে ঐক্য এবং বৈপরীত্যের মধ্যে সেতু স্থাপন করে চতুর্দিকে নিজেকে প্রসারিত করতে পারে। এই প্রসারণই প্রকৃত উন্নতি।

রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের দুটো দিক আছে—একটা ব্যক্তিগত বৈষয়িকের দিক, যেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়, আর একটা ত্যাগের দিক, সাধনার দিক, যেখানে উপস্থিত-প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে, কর্মস্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে, ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে সর্বজনীন সর্বকালীন মানবের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে চায়। তাই, মানুষের চিন্তায়, ভাবে, কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। "এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের জাত, অন্তরে আছে এক মানব।" মানুষের অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা। বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁছুতে চায় বিশ্বমানসলোকে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের এই সর্বজনীন প্রকাশকে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলে গ্রহণ করেছেন। যে একান্ত ব্যক্তিগত সে সকল কালের, সকল মানুষের মনকে আকর্ষণ করতে পারে না। ইতিহাসে মানুষের এই গভীর আত্মোপলব্ধি রাষ্ট্রতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, ধর্মতন্ত্রে প্রচারিত হয়েছে। যে দেশপ্রীতির সঙ্গে এই আত্মোপলব্ধি নেই, তা ঐক্যের দিকে, মঙ্গলের দিকে প্রসারিত নয়। যে দেশ-প্রেমে জীবভাব প্রধান, বিশ্বভাব অপ্রধান, রবীন্দ্রনাথ তাকে বড়ো স্থান দেননি।

মানুষ বসে থাকতে চায় না, তাই সে খাড়া হয়ে উঠেছে। ঘরে সে দাঁড়ায় জানালার সম্মুখে, তার দৃষ্টি দিগন্তের পর দিগন্তের দিকে। পথে সে চলতে চায়, এবং পথ-চলাতে সে আনন্দ পায়। এই প্রয়োজনাতীত বাইরের দিকে তার আকর্ষণ। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে সে বিশ্রামহীন জয়যাত্রায় পথকে প্রশস্ত করেছে। রবীন্দ্রনাথ এ কথা মানেন যে, মানুষ বেহিসাবী। মানুষ যদি বৃহৎকে পেতে চায়, তার হতে হবে বৃহৎ। সীমার মধ্যে মানুষের জিজ্ঞাসা অসমাপ্ত থেকে যায়।

তাই রবীন্দ্রভাবনার তারে এই সুর বার বার ঝংকৃত হয়েছে—

"অন্যান্য জন্তুর মতোই তথ্য মানুষের সম্বল, কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যের চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমা উপলব্ধি করানো। ঐশ্বর্য-অভিমানী মানুষ বলেছে, ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। বলেছে, অল্পে সুখ নেই, বৃহতেই সুখ।"

রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে, "মানুষ অশ্রান্ত যাত্রা করেছে অন্নবস্ত্রের জন্য নয়, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে, আপনার জটিল বাধার থেকে আপনার অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে।" মানুষ অনুভব করে সে আছে একটি নিখিলের মধ্যে। "সেই নিখিলের সঙ্গে সচেতন সচেষ্ট যোগসাধনের দ্বারাই সে আপনাকে সত্য করে জানতে থাকে। বাহিরের যোগে তার সমৃদ্ধি, ভিতরের যোগে তার সার্থকতা।" রবীন্দ্রনাথ মানুষের উপর বিশ্বাস কোনোদিন হারাতে পারেননি। মানুষ যখন নখদন্ত বিকাশ ক'রে, তার বর্বরতা দিয়ে ইতিহাসে অনেক সময় বিভীষিকা বিস্তার করেছে, তিনি আতঙ্কিত হয়েছেন, কিন্তু তিনি তাঁর আশিবৎসর বয়সে বলে গেলেন—"মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে-বিশ্বাস শেষপর্যন্ত রক্ষা করব।" এই বিশ্বাসে বলী হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলতে পেরেছিলেন—"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে।" কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, "ইংরেজ তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি।" এবং তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন যে, "ভারতবর্ষ ইংরেজের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে।" ইংরেজ-শাসনে ভারতবাসীর মধ্যে যে আত্মবিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে, তাতে প্রগতির পথ অবরুদ্ধ হয়েছে।

রবীন্দ্রভাবনায় যে বিশ্ববোধের সুস্পষ্ট ইশারা আছে, তাকে জানতে হবে এবং মানতে হবে, নইলে রবীন্দ্রনাথের স্বাজাতিকতা অনেকের কাছে অর্থহীন বলে মনে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, মানুষের জন্মভূমি তিনটি—প্রথম, পৃথিবী ; দ্বিতীয়, স্মৃতিলোক ; তৃতীয়, আত্মিক লোক। পৃথিবী মানুষের কাছে তার হৃদয় অবারিত করে দিয়েছে, পৃথিবীর কোনো অংশ তার কাছে দুর্গম নয়। পূর্বপুরুষের কাহিনী নিয়ে কালের নীড় মানুষ তৈরি করেছে। এই কালের নীড় স্মৃতির দ্বারা রচিত ও গ্রথিত। "মানুষ জন্মগ্রহণ করে সমস্ত পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করে নিখিল ইতিহাসে। আত্মিক লোক হল সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ। এই চিত্তলোক বিশ্বগত।" সাধারণ মানুষ যখন ভালবাসে, তখন অনেক সময় সে নিজের ক্ষতি করে ফেলে। এই ক্ষতি করা সম্ভব, কারণ মানবমনের একটা দিক আছে—সেটা সর্বমানবের চিত্তের দিক। রবীন্দ্রনাথের

রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে সম্যকভাবে বুঝতে হলে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, ব্যক্তিগত মন আপন বিশেষ প্রয়োজনের সীমায় সংকুচিত হলেও, তার সত্যকার বিস্তার সর্বমানবচিত্তে। "যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে, তখন দেখে সত্যকে।"

দুই ॥

আধুনিক যুগ রাষ্ট্রের উপাসক। হেগেল তাঁর *Philosophy of History* গ্রন্থে লিখেছেন যে, "The State is the Divine Idea as it exists on earth"। তিনি সুস্পষ্টরূপে প্রচার করেছেন যে, মানুষের প্রকাশ ও বিকাশ স্টেটের কার্যাবলীর ভিতর দিয়ে। স্টেটের একেশ্বরত্ব আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারায় স্বীকৃত। ইতিহাসের গতীয় ভঙ্গী সম্বন্ধে হেগেলের যে দৃষ্টি ছিল, তা মার্ক্স নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। মার্ক্স স্টেটের প্রভুত্ব মেনে নিলেন। কিন্তু তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, ধনিকতন্ত্রের ভিতর যে বীজ আছে, তা ফলিত হয়ে গণতন্ত্রের প্রাধান্য (dictatorship of the proletariat) প্রতিষ্ঠিত হবে। হেগেল ও মার্ক্স স্টেটের প্রভুত্বকে নতমস্তকে স্বীকার করলেন। কিন্তু লেনিন তাঁর *What Is To Be Done* গ্রন্থে নতুন ঘোষণা প্রচার করলেন। এই গ্রন্থ ১৯০২ সালে প্রকাশিত। তিনি জোর দিলেন যে, স্টেটের ক্ষমতা অধিকার করতে হলে পার্টির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কম্যুনিজম-এর আবর্তনকে সার্থক করতে হলে কম্যুনিস্ট পার্টি গড়তে হবে। অর্থাৎ স্টেটের যে নিগ্রহ-বল আছে তাকে আয়ত্ত করতে হলে পার্টির ভেলায় আশ্রয় নিতে হবে। এই পার্টিকে বাহন করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংখ্যাল্প সম্প্রদায় সংখ্যাধিক্য সম্প্রদায়কে অভিভূত করতে পারে। সমাজ-বিবর্তনের যুগে যাঁরা দ্বিধাহীন, একনিষ্ঠ বিপক্ষতা করতে পারেন, তাঁরা সংখ্যাল্প হলেও জয়ী হতে পারেন। যাঁরা আগুন জ্বালাতে চান, তাঁদের সংখ্যা বেশি না হলেও তাঁরা জয়ী হতে পারেন, যদি আগুন জ্বালাবার কৌশল জানা থাকে। সংসারে বেশিরভাগ লোক আগুন নিয়ে খেলাকে পছন্দ করেন না এবং সেই খেলাকে ভয় করেন। তাই পুড়িয়ে ছারখার করা যাদের আদর্শ, তারা চিরকাল সংখ্যায় অল্প। তারা সংখ্যাধিক্য সম্প্রদায়কে কবলিত করেন জবরদস্তির সাহায্যে। লেনিন আধুনিক কম্যুনিজম-এর প্রকৃত গুরু। তিনি বললেন যে মার্ক্সীয় নিয়তি ও

বিধানকে সফল করতে হলে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রয়োজন। কবে এবং কখন ধনিকতন্ত্রে ঘুণ ধ'রে তা বিকল ও বিফল হবে, তার জন্য অপেক্ষা করলে চলবেনা। ধনিকতন্ত্রকে বিধ্বস্ত করে, স্বৈরশাসনকে অস্বীকার করে স্টেটের ক্ষমতা লাভ করতে হবে। রাজনৈতিক উত্তেজনা ও আন্দোলন এবং উৎকণ্ঠিত নিষ্ঠাবান আবর্তনবাদীর প্রয়োজন লেনিন গভীরভাবে বোধ করলেন। তাই তিনি গড়তে চাইলেন এক কেন্দ্রীভূত বিদ্রোহাত্মক সংঘ, এবং সংঘের নীতি হিসাবে গ্রহণ করলেন সুগভীর গোপনতা, সযত্নভাবে সভ্য-নির্বাচন এবং বিদ্রোহকারীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান।

লেনিন বুঝেছিলেন যে, রাজনীতির খেলায় পার্টির আবশ্যকতা বেশি। তাই লেনিন Party State-এর গোড়াপত্তন করলেন। এই লেনিনবাদকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Professor W. W. Rostow তাঁর *The Stages of Economic Growth* গ্রন্থে বলেছেন—"The Communist Party would not work as a fraction of the socialist movement, as the Communist Manifesto counselled. It would form itself as a separate party, a conspiratorial elite, and seek power on a minority basis, in the name of the proletariat, swimming against the stream of history."

আধুনিক রাজনীতি হল ক্ষমতার ঘাত-প্রতিঘাতের খেলা। আইনতঃ, স্টেটের নিগ্রহশক্তি সবার চেয়ে উপরে, কারুর অধীনে নয়। স্টেটের প্রভুত্ব সকলের অধিকার গ্রাস করতে পারে। তাই সর্বব্যাপক ক্ষমতা পেতে হলে সর্বগ্রাসী স্টেটের নিগ্রহ-যন্ত্রকে অধিকার করতে হবে। লেনিন কম্যুনিস্ট পার্টির সাহায্যে সেই নিগ্রহ-যন্ত্রকে অধিকার করতে চাইলেন। পার্টি যখন নিজের বলে, নিজের চক্রান্তে, নিজের কৌশলে স্টেটের শক্তি অধিকার করে, তখন স্টেট পার্টির অধীন হয়ে পড়ে। আইনতঃ স্টেট মুখ্য হলেও পার্টি বস্তুতঃ মুখ্য হয়। তাই পার্টি-স্টেটের উৎস-পরীক্ষা লেনিনবাদের ভিতর পাওয়া যায়।

আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্বের এই পশ্চাদ্‌ভূমিতে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব আখ্যাত ও ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে নব নব পরীক্ষা ও নব নব পরিবর্তনের পথে। প্রাণশক্তি জীবনের প্রকাশকে সাহায্য করে। পুরাতন মরে যায় এবং নূতন জেগে ওঠে,

এই মৃত্যু ও পরিবর্তন অমৃতের সন্ধান দেয়। এই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে নবজীবনলাভের প্রচেষ্টা যখন বন্ধ হয়, তখন মানবসমাজের যথার্থ মৃত্যু ঘটে। জড়বস্তু মৃত, কিন্তু প্রাণশক্তি মৃত্যুহীন। প্রবল প্রাণশক্তির জোরে বনস্পতি প্রচুর পল্লব বর্ষণ করে। সে যখন প্রাণহীন হয়, তখন শুকনো পাতা মাটিতে ঝরে পড়ে। অবিশ্রাম পরিত্যাগ যেখানে নেই, মৃত্যু সেখানে মৃত্যুহীন হতে পারেনা। উন্নতির মূলে মানুষের এই মৃত্যুহীন আত্মা আছে—বাহিরের বিকাশে সেই আত্মার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রের প্রভুত্বকে প্রশংসার চোখে দেখেননি। রাষ্ট্রের প্রভাব যত কম হয়, সমাজের পরিসর তত বিস্তৃত থাকে। কল্যাণের ভার, ঐক্যস্থাপনের দায়িত্ব এবং সামঞ্জস্যবিধানের প্রচেষ্টা তিনি সমাজের উপর ন্যস্ত করবার পক্ষে রায় দিয়েছেন। সমাজের প্রাণশক্তি দুর্বল থাকলে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মানুষ সবল ও সতেজ থাকতে পারেনা। মন যখন পঙ্গু ও দাস্যভাবে বিকল হয়ে ওঠে, দেশের কল্যাণের কাজ, মানুষে মানুষে মিলন-সাধনের কাজ সেই মন দিয়ে সম্ভব হয়না। রাষ্ট্রের পরিধিকে সংকীর্ণ করতে হবে এবং সমাজের ব্যাপ্তি ও দীপ্তি বাড়াতে হবে, তাহলে দেশের মঙ্গলঘট পরিপূর্ণ থাকবে। তাই, রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতায় রাষ্ট্র বা পার্টির অধিনায়কত্ব নেই। তিনি মানুষের প্রাণশক্তিকে সচেতন রাখতে বলেছেন, এবং শুভবুদ্ধির দ্বারা, আত্মশক্তির দ্বারা, মানুষের বিশ্ববোধের দ্বারা দেশকে সেবা করতে আহ্বান করেছেন। ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে হবে কল্যাণের বাহনরূপে, নিজের ক্ষুদ্রতার পরিপোষণে নয়।

ব্যক্তিগত ও জাতিগত দৃষ্টির ভিতর যে সংকীর্ণতা আছে, তা রবীন্দ্রনাথকে পীড়া দিত। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের উপাসকের নিকট রবীন্দ্রনাথের বিশ্বত্ববোধ অনেক সময় হেঁয়ালি সৃষ্টি করত। তাই সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ঘোষণা ও প্রচারণ সবসময় যথার্থ সমাদর লাভ করেনি। কিন্তু চিন্তাশীল সমাজে আজ এ কথা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, আজ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে একত্রিত হয়ে না ভাবতে পারলে আমাদের মরণ ও পতন সন্নিকট। পশ্চিমের ভাবুক সমাজে আজ Nation-State-এর বিরুদ্ধে মত গড়ে উঠেছে। পশ্চিমের এই নূতন চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করে Professor Harold Laski বলেছেন—"Nationalism emerging into Statehood results, in a word, in an egoism we have discovered to be intolerable. Either

we must curb its excesses, which means the end of sovereign State or they will destroy civilisation. The power to call the State to account is essential to freedom, and it cannot exist where the State is sovereign. ... The technical pivot upon which our power to end aggression turns is the abolition of sovereignty. That must involve the rebuilding of a new world-order in which the nation-state is no longer sovereign. We need, therefore, the conditions under which that sovereignty can go, and the institutions through which a new world-order can operate." রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও সাধনা পশ্চিমের এই নূতন চিন্তাধারার পরিপোষক।

রবীন্দ্রনাথের মতে, আমাদের সমস্যা রাষ্ট্রগত নয়, সমাজগত। ভারতের রাজনীতি প্রকৃতপক্ষে সমাজনীতি। সমাজের পরিচালনায় তার আত্মপ্রসারণ ও আত্মরক্ষণ চলেছে, তার সামঞ্জস্যের চেষ্টা রচিত হয়েছে। য়ুরোপে স্টেট দেশের সমস্ত হিতকর কর্মের ভার গ্রহণ করেছে। স্টেট শিক্ষাদান করে, ভিক্ষাদান করে, ধর্মরক্ষা করে। আমাদের কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে, তা ধর্মরূপে আমাদের সমাজে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। ভারতবর্ষ রাজত্বের দিকে তাকায়নি, সমাজের দিকে দৃষ্টি রেখেছে। সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থ-ভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, মঙ্গল করবার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। তাই ভারতবর্ষের প্রকৃতি-সম্বন্ধে বিদেশীর নিকট বলেছিলেন—"India devoid of all politics, the India of no nations."

ন্যাশনাল ঐক্য বলতে আমরা বুঝি রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক ঐক্য এবং ন্যাশনালিজম-এর মানে হল রাষ্ট্রগৌরবলাভের অধিকার। রবীন্দ্রনাথ যখন বিদেশীর কাছে ঘোষণা করেছিলেন যে, "India has never had a real sense of nationalism", তখন নেশন কথাকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন—"A nation, in the sense of the political and economic union of a people, is that aspect which a whole population assumes when organised for a mechanical purpose." ভারতবাসী আজ ন্যাশনালিজম-এর নেশায় ভরপুর। য়ুরোপীয় চিন্তাধারায় আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভাবান্বিত। ভারতে ব্রিটিশ-শাসন ছিল ব্রিটিশ নেশন-এর শাসন। *Nationalism* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"Inasmuch as we have been ruled and

dominated by a nation that is strictly political in its attitude, we have tried to develop within ourselves, despite our inheritance from the past, a belief in our eventual political destiny."

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন—(ক) সত্যিকারের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সামাজিক অন্ধতার উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় না; (খ) সমাজের ভিতর যে দুর্বলতা আছে, তা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে দেখা দেবে; (গ) য়ুরোপে ন্যাশনাল একতা সুদৃঢ় হয়েছে, কারণ সেখানে নানা বর্ণের ও নানা শ্রেণীর ভিতর রক্তের মিশ্রণ বন্ধ হয়নি, কিন্তু ভারতবর্ষে নানা বর্ণ, ধর্ম ও জাতির মধ্যে রক্তের মিশ্রণে বাধা আছে, এবং রক্তের মিশ্রণ নেই বলেই ভারতবর্ষের ন্যাশনাল ঐক্য ঠুনকো রয়েছে; (ঘ) সমাজের ভিতর যদি মানুষের অসম্মান চলে, মানুষের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার ঘটে, সেই কলঙ্কিত সামাজিক মন নিয়ে রাষ্ট্রীয় গৌরবলাভ সম্ভব হয়না। প্রাচীন ভারতে আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের রক্তের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটেছিল। যতই বর্ণসংকর ও ধর্মসংকর উৎপন্ন হতে লাগল, ততই সমাজের আত্মরক্ষণী শক্তি বারম্বার সীমা নির্ণয় করে আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে, এবং যাকে ত্যাগ করতে পারেনি, তাকে গ্রহণ করেছে। ইতিহাসের প্রথমযুগে আর্য-অনার্যে যখন সংঘাত চলেছিল, তখন সমভাবে মিলনের চেষ্টা চলছিল। ক্ষত্রিয়েরা অনার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যখন সমানভাবে প্রবল ছিল, আত্মপ্রসারণ ও আত্মরক্ষণ সমভাবে চলেছিল। কিন্তু বৌদ্ধপ্লাবনের পরে, ব্রাহ্মণ সমাজের একেশ্বর হল এবং ক্ষত্রিয়শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল। সমাজের অনার্যশক্তি ব্রাহ্মণ-শক্তির প্রতিযোগীরূপে দাঁড়াতে সক্ষম হলনা। তাই, ব্রাহ্মণের অধিনায়কত্বে ভারতবর্ষের সংকোচনের যুগ আরম্ভ হল। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, যখন সমাজের একভাগ আপনাকে নিকৃষ্ট বলে স্বীকার করে নেয় এবং আর একভাগ আপনার আধিপত্যে কোনো বাধা পায়না, তখন নীচে যে থাকে সে যতই অবনত হয়, উপরে যে থাকে ততই নেমে পড়তে থাকে।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"যাহাকে মারি সে যখন ফিরিয়া মারে তখন মানুষের মঙ্গল, যাহাকে মারি সে যখন নীরবে সে-মার মাথা পাতিয়া লয় তখন বড়ো দুর্গতি। বেদে অনার্যদের প্রতি যে বিদ্বেষ-প্রকাশ আছে তাহার মধ্যে পৌরুষ দেখিতে পাই, মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি যে একান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর অবজ্ঞা দেখা যায় তাহার

মধ্যে কাপুরুষতার লক্ষণ ফুটিয়াছে। মানুষের ইতিহাসে সর্বত্রই এইরূপ ঘটে। যেখানেই কোনো একপক্ষ সম্পূর্ণ একেশ্বর হয়, যেখানেই তাহার সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকেনা, সেখানেই কেবল বন্ধনের পর বন্ধনের দিন আসে, সেখানেই একেশ্বর প্রভু নিজের প্রতাপকে সকল দিক হইতেই সম্পূর্ণ বাধাহীনরূপে নিরাপদ করিতে গিয়া নিজের প্রতাপই নত করিয়া ফেলে। বস্তুত, মানুষ যেখানে মানুষকে ঘৃণা করিবার অপ্রতিহত অধিকার পায় সেখানে যে মাদক বিষ তাহার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে তেমন নিদারুণ বিষ মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।"

ইতিহাসের এই ব্যাখ্যান, এই শিক্ষণ আমাদের মনে রাখতে হবে। ভারতবর্ষের সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুই শক্তি ছিল। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধতার যুগে সমাজের গতি মধ্যপথে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। যখন ক্ষত্রিয়শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল অথবা ক্ষত্রিয়শক্তি ব্রাহ্মণের প্রভুত্বকে স্বীকার করে সমাজের সৃষ্টিকার্যে আপনার প্রতিভা প্রয়োগ করতে পারলনা, তখন ব্রাহ্মণশক্তি প্রবল হল। সেই সময় ব্রাহ্মণের আত্মরক্ষণী শক্তি সংকোচের দিকে প্রবাহিত হল। এবং ক্ষত্রিয়ের উপর যে প্রসারণের ভার ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যান গ্রহণ করলে এ-কথা মানতে হবে যে, স্টেট যখন প্রবল হয় এবং সমাজশক্তি দুর্বল ও নিশ্চল হয়, তখন মানবসমাজের ওজন ঠিক থাকতে পারেনা। স্টেটের প্রতিযোগীরূপে সমাজশক্তির দাঁড়াতে হবে, তবেই গতির মধ্যে যতি ও সংহতি পাওয়া যাবে। তাই স্টেট যখন একেশ্বর হয়ে বন্ধনকে দৃঢ় করতে চায়, রবীন্দ্রনাথ আতঙ্কিত হয়েছেন। কারণ, সামঞ্জস্যের চেষ্টা একপক্ষের অধিনায়কত্বে সম্ভব নয়। এবং তা সম্ভব নয় বলেই তিনি চিত্তশক্তিকে সর্বদা সজাগ ও সক্রিয় রাখতে বলেছেন।

ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল জড়ত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা। জড়ত্বের বোঝা মাথায় বহন করে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকা মঙ্গলপ্রসূ নয়, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন। ভারতের সচেষ্ট হতে হবে সামঞ্জস্যকে ফিরে পাবার জন্য। এই সামঞ্জস্যের চেষ্টা তখনই সফল হয়, যখন আমরা উপলব্ধি করব যে রক্ষণীশক্তি প্রসারণের পথকে বন্ধ করবে না এবং স্বজাতির মধ্য দিয়ে সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্য দিয়ে স্বজাতিকে পেতে সাহায্য করবে। আপনাকে কুঞ্চিত করে রাখা চরম দুর্গতি এবং আপনাকে রিক্ত করে পরের উপর নির্ভর করা নিষ্ফল ভিক্ষুকতা।

। তিন ।

রবীন্দ্রনাথের মতে, বাংলাভাষায় 'নেশন' কথার প্রতিশব্দ নেই। যদি বলি 'নেশন' কথার অর্থ জাতি, তাতে ভারতবর্ষের সর্বজাতীয় বা সর্বজনিক ইশারা পাওয়া যায় না। আমরা বলি বাঙালী জাতি, মারাঠী জাতি ইত্যাদি। আমাদের বর্ণভেদ আছে, তাই আমরা জাতি বলতে বর্ণও বুঝি। ইংরেজিতে যাকে *caste* বলি বা *race* বলি, আমরা জাতি কথাটা সেই অর্থেও ব্যবহার করি। ভারতবর্ষে জাতির নানা নিশানা আছে, আমরা জাতিতে হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান ; আমরা জাতিতে বাঙালী, মারাঠী, গুজরাটী ইত্যাদি। ধর্মের বা ভাষার বা প্রদেশের তকমা দ্বারা আমরা পরিচিত। ভারতবাসী বলে আমাদের যে পরিচিতি, তা ভৌগোলিক। ইতিহাসে ভারতবাসী বলে কোনো জাতি গড়ে ওঠেনি। জনসাধারণের কাছে ভারতবাসী-সংজ্ঞা এখনো কুহেলিকায় আবৃত। হিন্দু বা মুসলমান বললে, বাঙালী বা বিহারী বললে, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র বললে জনসাধারণের একটা পরিচয় আমাদের মিলবে। কিন্তু ভারতবাসী বললে ভৌগোলিক ব্যাখ্যান ছাড়া আর কোনো পরিচয়ই আমাদের মিলবেনা। যখন আমরা বলি—একজাতি, একপ্রাণ, তখন আমরা ভারতবর্ষের সর্ব ধর্ম, সর্ব বর্ণ, সর্ব প্রদেশকে বুঝি কিনা তা বলা মুশকিল। তাই অনেক সময় সর্বজাতিকে এক তালিকায় ভুক্ত করবার জন্য 'মহাজাতি' শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু 'নেশন' কথার আত্মিক ব্যাখ্যান 'মহাজাতি' শব্দ দিয়ে বুঝা যায় না। ( স্বাধীন ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজাধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং বর্ণ, ধর্ম বা ভাষার বিভাগ গৃহীত হয়নি। ভারতীয় চাপরাস বহন করা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে ভাষাগত, ধর্মগত, বর্ণগত ও প্রদেশগত সংঘাত ভারতীয় বোধকে জাগ্রত হতে দিচ্ছে না। কণ্ঠে ভারতীয় প্রজাধিকার উচ্চারিত হলেও, কর্মে সর্বজাতীয় ঐক্যবোধ সজাগ নয়। )

রাজনৈতিক দার্শনিক সমাজে আজ এ কথা স্বীকৃত হয়েছে যে, জাতি, ভাষা, বৈষয়িক স্বার্থ, ধর্মের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান, এসব নেশন-নামক মানসপদার্থ সৃজনের মূল উপাদান নয়। সর্বসাধারণের মধ্যে অতীতকালের এক গৌরব ও বর্তমানের এক ইচ্ছা যদি বিরাজ করে, অর্থাৎ পূর্বে একত্রে বড়ো কাজ করা এবং পুনরায় একত্রে বড়ো কাজ করবার সংকল্প যদি থাকে, তাহলে ঐক্যগঠনের পথ সহজ হয়। প্রকৃতপক্ষে, 'নেশন' একটি মানসিক পদার্থ। যদি গৌরবময় স্মৃতি

থাকে এবং সেই স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ থাকে, তাহলে নেশন-নামক মানসপদার্থের সৃষ্টি হয়। একত্রে দুঃখ পাওয়া, একত্রে দেশের গৌরবময় স্মৃতি গড়ে তোলা, এবং একত্রে ভবিষ্যতের মহতী আশায় উদ্দীপিত হওয়া,—এসব জনসাধারণকে একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে, এবং তা নেশন-এর সত্তা। মানুষ বর্ণ, ভাষা বা ধর্মমতের দাস নয়। তার হৃদয়ে ভাবনা ও আদর্শ আছে, তারই উদ্দীপনায় এক সচেতন চরিত্র সৃষ্ট হয়, তাকেই আমরা 'নেশন' বলতে পারি। সেই দিক থেকে ভারতবর্ষে নেশন-এর সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীনের স্মৃতি, অতীতের প্রয়াস, বর্তমানের সংকল্প ও প্রচেষ্টা, ভবিষ্যতের মহৎ আদর্শ—আমাদের একবন্ধনে একীভূত করেছে ; তাই আজ আমরা ভারতবাসী, এবং বর্ণ, ধর্ম, ভাষা ও প্রদেশের সীমানাকে অস্বীকার করে ভারতের সর্বজনিক নেশন গড়ে তুলবার চেষ্টা করছি।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, নেশন একটি মানসপদার্থ। ফরাসী ভাবুক রেনাঁর ব্যাখ্যান আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রচার করেছেন যে, ভারতীয় সভ্যতার ও য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাণধর্ম এক নয়। বিচিত্রকে মিলিত করবার শক্তি সভ্যতার লক্ষণ। বহুলোকের চিত্ত এক হতে পারলে মহৎ ফল ফলে। কিন্তু চিত্তের মিলন যথার্থ হতে পারেনা যদি বেদনা, অপমান ও আঘাত প্রবল হয়ে দেখা দেয়। য়ুরোপের কাছে ন্যাশনাল ঐক্য অর্থাৎ রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক ঐক্যই শ্রেষ্ঠ। তাই য়ুরোপ রাষ্ট্রের সাহায্যে ঐক্যসেতু বেঁধেছে। প্রয়োজন হ'লে প্রবল দুর্বলকে আঘাত দিয়ে এক-একটি 'নেশন' করবার চেষ্টা করেছে। বিচিত্র ভাবনা ও বিধানকে গ্রহণ করে এক নূতন মিলনসেতু বাঁধবার চেষ্টা করেনি। রাষ্ট্র মাথা নোয়াতে জানেনা, সে জানে আঘাত দিতে। এই আঘাতের সহায়তায় রাষ্ট্র নূতন মিলনশক্তি সৃষ্টি করবার চেষ্টা করে।

রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে—

"নানা যুদ্ধবিগ্রহ-রক্তপাতের পর য়ুরোপের সভ্যতা যাহাদিগকে এক নেশনে বাঁধিয়াছে, তাহারা সবর্ণ। অনেক যুদ্ধবিরোধের পরে হিন্দুসভ্যতা যাহাদিগকে এক করিয়া লইয়াছিল, তাহারা অসবর্ণ। তাহারা স্বভাবতই এক নহে।"

হিন্দুসভ্যতা এক প্রকাণ্ড সমাজ গড়েছে, তার মধ্যে নানা বর্ণ, জাতি ও ধর্ম স্থান পেয়েছে। য়ুরোপের সভ্যতা রাষ্ট্র গড়েছে যাতে ভাষা ও ধর্মের প্রভেদ স্থান পায়নি। হিন্দুসভ্যতা চেষ্টা করেছে ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের প্রভেদকে রক্ষা করে এক বৃহৎ সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, য়ুরোপীয়

সভ্যতা এত সজীব কেন এবং হিন্দুসভ্যতা এত নির্জীব কেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, চিত্তবৃত্তি যখন সচেষ্ট না থাকে, তখন সভ্যতা নিশ্চল হয়ে পড়ে। আমাদের পিতামহেরা বড় হয়েছিলেন যখন তাঁরা বিচার করতেন, পরীক্ষা করতেন, পরিবর্তন করতেন। গৌরবময় স্মৃতির কোলে নিশ্চলভাবে শয়ন করে নূতন সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা যায়না। মানুষের চিত্ত যখন প্রবাহিত, যখন প্রজ্বলিত, তখন জাতি বড় হয়, এবং সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়। অর্থাৎ, প্রপিতামহের সজীব চিত্তের সঙ্গে আমাদের চিত্তের যদি প্রকৃত যোগসাধন না হয়, তাহলে জড়সম্বন্ধ গড়ে উঠবে, এবং ঐক্যসূত্র ছিঁড়ে যাবে। এক অংশ প্রজ্বলিত, অপরাংশ নির্বাপিত, তাহলে সভ্যতার মিলনশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র ও সমাজের বিরোধকে জয় করা যায়না, যদি অতীত ও বর্তমানের মধ্যে নিরন্তর সজাগ চিত্তের সম্বন্ধ না থাকে। রবীন্দ্রনাথ এ কথা বার বার বলেছেন যে, আপনাকে সবল ও সচল করে না তুলতে পারলে এবং চিত্তকে নিয়ত জাগ্রত না রাখতে পারলে দেশের ও সমাজের মঙ্গলপ্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। যদি বর্তমানকে স্বীকার না করে পূর্বপুরুষের দোহাই দিই, যদি অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করি, যদি অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত হই, যদি চিত্তবৃত্তিকে সজাগ না রাখি, তাহলে আমাদের কর্মপ্রবাহ নানা ভাবে বাধা পাবে।

রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে যে-কথা বলতে চেষ্টা করেছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তন-ধারার মূল কথা। প্রথম, যুরোপের শক্তির ভাণ্ডার স্টেট অর্থাৎ সরকার। আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষ রাজ্য নিয়ে মারামারি, বাণিজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করেনি। তৃতীয়, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করে চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। আমাদের বাঁচবার উপায় আমাদের নিজের শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত রাখা। চতুর্থ, আত্মরক্ষার জন্য সমাজকে সজীব ও সতেজ রাখতে হবে। পঞ্চম, পোলিটিকাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। ষষ্ঠ, আমাদের সমাজপতি চাই, এই সমাজপতি কখনো ভালো কখনো মন্দ হতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপর কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করতে পারবেনা। সপ্তম, নূতনত্ব ও পরিবর্তনকে মেনে না নিলে সমাজের অগ্রসরণ সম্ভব হয়না। সমাজে স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে গতির বন্দোবস্ত রাখতে হবে।

ভারতবর্ষ যখন পৃথিবীর গুরুর আসন লাভ করেছিল, তখন ধর্মে বিজ্ঞানে দর্শনে ভারতবর্ষের চিত্তে সাহসের সীমা ছিলনা। আজ আমরা পঙ্গু, আমাদের শক্তি আবদ্ধ, তাই বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে একাত্মতা-লাভ করতে আমরা অসমর্থ। ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম হল পার্থক্যকে বিরোধ বলে না জানা, তাই সে সকল পথকে স্বীকার করতে চায়, বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকে স্থান দিতে চায়। তাই, দেশকে জানতে হবে, পৃথিবীকে জানতে হবে এবং সমাজ-চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন—"গবর্নমেণ্টের কাছ হইতে আমাদের দেশ যতদূর পাইবার তাহার শেষ কড়া পর্যন্ত পাইতে পারে, যদি দেশকে আমাদের যতদূর পর্যন্ত দিবার তাহার শেষ কড়া পর্যন্ত শোধ করিয়া দিতে পারি। যে-পরিমাণেই দিব সেই পরিমাণেই পাইবার সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ দরখাস্ত-কাগজের নৌকা বানাইয়া সাত-সমুদ্র-পারে সাত-রাজার ধন-মানিকের ব্যবসা চালাইবার প্রস্তাব চিরকাল অবজ্ঞা করিয়াছেন। তিনি দেশের মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন দেশপ্রীতি ও সমাজচেতনার উপর। সহজ পথ শ্রেয়ের পথ নয়। সেবার দ্বারাই প্রেমের চর্চা হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে, আমাদের কাজ জড়ত্বের মধ্যে জীবন সঞ্চার করা, সংকীর্ণতার মধ্যে উদার মনুষ্যত্বকে আহ্বান করা, নিজের শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন করা এবং নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা। তিনি এ কথা মানতেন যে, "অশক্তের শক্তি যদি না জাগে, তাহলে মানুষের পরিত্রাণ নেই, কারণ শক্তিমানের শক্তিশেল অতিমাত্র প্রবল হয়ে উঠেছে।" মনে রাখতে হবে, "নিরুপায় আজ অতিমাত্র নিরুপায়, সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আজ কেবল মানব-সমাজের একপাশে পুঞ্জীভূত, অন্যপাশে নিঃসহায়তা অন্তহীন।" রবীন্দ্রনাথ অসংকুচিত কণ্ঠে বলেছেন যে, "যে-মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না, সে-মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম।"

মানুষ যখন আপনার দিকে সমস্তকে টানতে চায়, সে তাতে প্রকাণ্ডতা লাভ করতে পারে। কিন্তু সে যখন আপনাকে সমস্তের দিকে উৎসর্গ করে, সে সামঞ্জস্য লাভ করে। এই সামঞ্জস্যই মানুষের শান্তি ও সমাজের শক্তি। মানুষের দুইরকম প্রকাশ আছে, এক শক্তির প্রকাশ, আর এক প্রীতির প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ এই প্রীতির প্রকাশকে বড় স্থান দিয়েছেন। তিনি এ কথা বলেছেন যে, অশক্তের সঙ্গে শক্তের মিলন সম্পূর্ণ হয়না, তাই নিজের শক্তিতে পরের

শক্তির সঙ্গে সন্ধি করতে হবে। এবং সেই শক্তিকে সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে হবে। যে মারতে পারে, সবসময় তার জিত হয়না ; যে মরতে পারে, তারও জিত হয়। এই জয়-পরাজয়ের ইতিহাস মানুষের উত্থান-পতনের ইতিহাস।

॥ চার ॥

ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে, ভারতবর্ষ চিরদিন চেষ্টা করেছে প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করতে এবং বহুর মধ্যে এক-কে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করতে। তাই রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি ভারতবর্ষ উদাসীন রয়েছিল। রাষ্ট্র-গৌরবের মূলে আছে বিরোধের ভাব। পরকে একান্ত পর বলে অনুভব করা, পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা, তা রাষ্ট্রগৌরবলাভের ভিত্তি। য়ুরোপীয় রাষ্ট্র যে ঐক্যসাধন করেছে, তাতে সামঞ্জস্যের চেষ্টা নেই, তাতে আছে বিরুদ্ধপক্ষের উৎসাদন। ভারতবর্ষ সামঞ্জস্য সাধন করেছে সমাজের ভিতর দিয়ে। সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করে এক নূতন মিলন-সাধনের চেষ্টা করেছিল। পর বলে কাউকে দূর করেনি, অসংগত বলে সে কোনো জিনিস উপহাস করেনি। ভারতবর্ষ সমস্ত গ্রহণ করেছে, সমস্ত স্বীকার করেছে। এই ঐক্যবিস্তারণ ও শৃঙ্খলাস্থাপন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় ও ধর্মনীতিতে পাওয়া যায়। জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টায় ভারতবর্ষ ধর্ম ও সমাজের বিচ্ছেদ ঘটতে দেয়নি। মানুষের একদিকে আছে বিশেষত্ব, আর একদিকে তার বিশ্বত্ব, তাই আত্মরক্ষণ ও আত্মপ্রসারণের কাজ সঙ্গে সঙ্গে চলতে হবে। প্রাচীন ভারতে আত্মরক্ষণের দিকে ছিল ব্রাহ্মণ, এবং আত্মপ্রসারণের দিকে ছিল ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় অগ্রসর হয়েছে, ব্রাহ্মণ নূতন ও পুরাতনের সীমা বেঁধে দিয়েছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যথার্থ জাতিগত ভেদ ছিলনা, তারা একই জাতির দুই স্বাভাবিক শক্তি। ভারতীয় সমাজের স্বাভাবিক স্থিতি ও গতিশক্তি এই দুই শ্রেণীকে অবলম্বন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই স্থিতি ও গতিশক্তির সামঞ্জস্য বাধা পেল যখন প্রসারণ বন্ধ হল। আত্মরক্ষণশক্তির অধিকারী ব্রাহ্মণ যখন প্রাধান্য লাভ করল, সমাজ প্রাণহীন হল। আত্মপ্রসারণী শক্তি যখন ব্যাহত হয়, তখন ঐক্যসাধনের ভানে ব্রাহ্মণ সমাজকে বেড়াজালে আবদ্ধ করল। ভিতরকার

অনৈক্য অবাধে মাথা তুলে নানা বিরোধ সৃষ্টি করল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "যাহা বাগান ছিল তাহা জঙ্গল হইয়া উঠিল"।

পরকে আপন করতে প্রতিভার প্রয়োজন, সেই প্রতিভা ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল। বৌদ্ধযুগের প্রলয়াবসানে ক্ষত্রিয় দুর্বল হল, এবং সমস্ত ভার ব্রাহ্মণের উপর ন্যস্ত হল। পূর্বধারাকে রক্ষা করা এবং নূতনকে তার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া, এই দুই কাজ ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দেওয়া হল। তার অধিকার ও ক্ষমতা বাড়তে লাগল। যারা স্বতন্ত্র তাদের এক করে বাঁধতে গিয়ে বাঁধন অত্যন্ত আঁট করল। সমাজ ব্রাহ্মণরচিত গ্রন্থিবন্ধন দ্বারা শৃঙ্খলিত হল। মুসলমানের আঘাত যখন লাগল, তখন সংঘাত ঘটল এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চিরপ্রথার। মুসলমান আপন শতাব্দীর মধ্যে আবদ্ধ। সে হিন্দুস্থানে এসে বাসা বেঁধেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের চিত্তে কোনো জাগরণ আনতে পারেনি। মুসলমানযুগে এই দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। বাহুবলের ধাক্কা খুব জোরে লেগেছে, কিন্তু চিন্তারাজ্যে নূতন সৃষ্টির উদ্যম আনেনি। তাই "পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আসর"।

ইংরেজ এল য়ুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে। মুসলমান আমাদের নিকটে এসেছিল, কিন্তু তার প্রতি আমরা মুখ ফিরিয়ে ছিলাম। ইংরেজ আমাদের কাছে আসেনি বটে, কিন্তু আমাদের চিত্তকে জাগিয়ে দিল। ইংরেজ-শাসন ইংরেজ-রাজার শাসন নয়, তা হল ইংরেজ-জাতির শাসন। একটা আস্ত জাতি নিজের দেশে বাস করে ভারতবর্ষকে শাসন করেছে, তা ভারতবর্ষের ইতিহাসে পূর্বে ঘটেনি। তাই ইংরেজ-শাসনে যে শোষণ ছিল, তা ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমাদের স্থাবর মনকে এক নূতন উদ্দীপনায় জাগিয়ে তুলেছিল। য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল, এবং য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতার যুগ আরম্ভ হল। মন যখন জেগে উঠল তখন দেখতে পেলাম যে, ইংরেজ-শাসনের রথ সামনের দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেনা। আমাদের শিক্ষা, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের ধন উৎপাদনের সুযোগ অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে উঠল। আমাদের তৃষ্ণা বাড়ল, কিন্তু তৃষ্ণা মিটলনা। য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ-শাসন আমাদের কাছে ব্যাপক ও গভীরভাবে এসেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন যে, য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে।

সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ যদি না থাকে, সামঞ্জস্যের চেষ্টা সেখানে বাধা পায়, এবং সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে। তাই স্টেটের একেশ্বরত্ব সর্বনাশের নিশানা। সমাজ-প্রসারণের শক্তি যখন দুর্বল হয়, সংকোচের যুগ তখন আরম্ভ হয়। তাই ইতিহাসে প্রসারণের যুগের পর অত্যন্ত সংকোচনের যুগ আসে, এবং প্রসারণের ভার যদি একেশ্বর স্টেট গ্রহণ করে, দুর্ঘটনা তখনই ঘটে। তাই সমাজ যখন দুর্বল থাকে, স্টেট স্বভাবতই প্রবল হয়, এবং স্টেটের প্রবলশক্তি সামঞ্জস্যকে বাধা দেয়। তাই, যাঁরা ভাবুক তাঁরা এ কথা স্বীকার করেছেন যে, সমাজের চিত্তবৃত্তি যখন অলস ও উদাসীন থাকে, স্টেটের বন্ধন তখন দৃঢ় হয়, এবং সমাজের সৃষ্টিকার্য পদে পদে বাধা পায়। তাই প্রজাতন্ত্রকে সচল করতে হলে স্টেটের প্রতিযোগী-রূপে সমাজশক্তির দাঁড়াতে হবে। সমাজের স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি সবল না থাকলে স্টেট সর্বগ্রাসী হয়ে পড়ে, এবং সর্বগ্রাসী স্টেট দেশকে সামঞ্জস্যের পথে খাড়া রাখতে পারেনা। সর্বগ্রাসী স্টেটের তামসিকতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে আত্মসমর্পণ করতে বার বার নিষেধ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ এ কথা কখনো স্বীকার করতে পারেননি যে, দেশের পলিটিক্স আগে, দেশের মানুষ পরে। এইজন্য তাঁকে অনেকে ভুল বুঝেছেন। তিনি দেখেছিলেন যে, দেশের পলিটিশিয়ান আর দেশের সর্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব। আমরা পলিটিক্স করি ইংরেজের পলিটিক্স নকল করে। আমরা বিদেশীয় রাজনীতির পুতুলখেলায় উন্মত্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কথা হল, সমাজকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষে সামঞ্জস্যের চেষ্টা ফলবতী হবেনা। দ্বিতীয় কথা, জবরদস্তি দ্বারা মনের পাপকে দূর করা যায়না। পাপকে ভিতর থেকে মারতে হবে। তৃতীয় কথা, গোঁয়ারতুমির দ্বারা উপর ও নীচের অসামঞ্জস্য ঘোচেনা। কারণ, অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। চতুর্থ কথা, যে-মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানেনা, কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারেনা। এই যে বাঁচবার শক্তি, জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে খুঁজে নিতে হবে। পঞ্চম কথা, লাঠি দিয়ে, হিংসা দিয়ে, বিদ্বেষ দিয়ে মানুষকে সংস্কার করা যায়না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "যেন বৌয়ের দল বলচে শাশুড়ীগুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গাযাত্রা করাও, তাহলেই বধূরা নিরাপদ হবে। ভুলে যায় যে মরা শাশুড়ীর ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শাশুড়ীতর শাশুড়ীতম করে তুলতে দেরী করেনা।" ষষ্ঠ কথা, রক্তপিপাসায় বড়-জোঁকের চেয়ে ছিনে-জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য নেই।

রবীন্দ্রনাথের স্বরাজ-কল্পনা ও স্বরাজ-সাধনা বুঝতে হলে এই সত্যটি জানতে হবে যে, তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর, এবং সেই মন তার বহুধাশক্তির দ্বারা এবং আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা স্বরাজ সৃষ্টি করতে থাকে। এই স্বরাজ-সৃষ্টি কোনো দেশেই শেষ হয়নি—লোভ বা মোহের প্ররোচনায় বন্ধনদশা থেকে গেছে। সেই বন্ধনদশার কারণ মানুষের চিত্ত। তাই চিত্ত-বিকাশের উপরই স্বরাজ দাঁড়াতে পারবে। এই চিত্তবিকাশকে বন্ধ করে স্বরাজ-সৃষ্টি সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের স্বরাজ-সৃষ্টিতে ভেদবুদ্ধি বা স্বার্থবুদ্ধির স্থান নেই।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"যে-বুদ্ধি সকলকে সংযুক্ত করে সেই হচ্ছে শুভবুদ্ধি। আজ এই বিশ্বচিত্ত-উদ্বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোন প্রচেষ্টার মধ্যে যদি সর্বজনীন কোন বাণী না থাকে তা হলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে। ··· আজ সর্বমানবের চিত্ত আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে ; আমাদের চিত্ত ভাষায় তার সাড়া দিক, কেননা ডাকের যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণশক্তির লক্ষণ। একদা পরমুখাপেক্ষী পলিটিক্সে সংযুক্ত ছিলুম তখন আমরা কেবলি পরের অপরাধের তালিকা আউড়ে পরকে তার কর্তব্যত্রুটি স্মরণ করিয়েছি—আজ যখন আমরা পর-পরায়ণতা থেকে আমাদের পলিটিক্সকে ছিন্ন করতে চাই, আজও সেই পরের অপরাধের জপের দ্বারাই আমাদের বর্জননীতির লালন করতে চাচ্চি। ··· সমস্ত বিশ্বের যোগযুক্ত ভারতের বিরাটরূপ চোখে না পড়াতে আমাদের কর্মে ও চিন্তায় ভারতের যে-পরিচয় আমরা দিতে প্রবৃত্ত হয়েছি সে অতি ছোটো, তার দীপ্তি নেই, সে আমাদের ব্যবসায়বুদ্ধিকেই প্রধান করে তুলেছে।"

দেশের মুক্তি-কাজটা খুব বড়, তাই তার উপায়টা ছোট হলে চলবেনা। ফাঁকি দিয়ে দেশকে গড়া যায়না, নিজের শক্তির উপরে বিশ্বাস রেখে দেশকে বড় করতে হবে। বুদ্ধিবিচারের দায়িত্ব পরের হাতে সমর্পণ করে চিত্তকে জাগ্রত রাখা যায়না ; অথচ নিজেকে সজাগ ও সচেষ্ট না রাখতে পারলে দেশসেবা অসার্থক হতে বাধ্য। আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, অবুদ্ধির সঙ্গে, মনের জড়তার সঙ্গে। আমাদের পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে চিন্তা দিয়ে, কর্ম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে। আগুনের জ্বালানি-কাঠ হচ্ছে আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস। তাই রবীন্দ্রনাথ দেশসেবার কাজে 'বৃহৎ-আমি'র প্রকাশ চেয়েছেন।

# প্রবন্ধ

[ "··· কেবল একটি কথা আজ আমি নিজের পক্ষ হইতে বলিব, সেটি এই যে, সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহাই জোগাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি আমার রচনা পাঠকদের মনের মতো করিয়া তুলিবার দিকে চোখ না রাখিয়া আমার মনের মতো করিয়াই সভায় উপস্থিত করিয়াছি। সভার প্রতি ইহাই যথার্থ সম্মান। কিন্তু এরূপ প্রণালীতে আর যাহাই হউক, শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত বাহবা পাওয়া যায় না, আমি তাহা পাইও নাই। আমার যশের ভোজে আজ সমাপনের বেলায় যে মধুর জুটিয়াছে, বরাবর এ রসের আয়োজন ছিল না। ··· কেবল আমার বলিবার কথা এই যে, যাহা আমার তাহাই আমি অন্যকে দিয়াছিলাম—ইহার চেয়ে সহজ সুবিধার পথ আমি অবলম্বন করি নাই। ···" —রবীন্দ্রনাথ

কবি রবীন্দ্রনাথের মন্ময় কবি-চিত্তের যেসব অনুভূতির কথা শুধু কাব্যের পরিসরেই সবটুকু বলা শেষ হয়নি, সেসব কথার অনেকখানিই বলা হয়েছে তাঁর সংগীতে, নাটকে কিম্বা চিত্রকলায়। মনীষী রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল চিন্তাধারার যে মূলকথাগুলি তাঁর উপন্যাসে, নাটকে এবং পত্রসাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, সেই চিন্তাধারারই পটভূমি এবং পরিণত স্বরূপটি বিধৃত হয়ে আছে তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যে। কাব্যের ক্ষেত্রে কবি-মানসের পর্যায়ক্রমিক যে বিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট, প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, দর্শন, সাহিত্যতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, এমনকি অর্থনীতি পর্যন্ত তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিষয়বস্তু রূপে গৃহীত হয়েছে। এবং সর্বত্রই কবির মৌল দৃষ্টিভঙ্গি বৃহত্তম মানবতাবোধের দ্বারা মহিমান্বিত। শিক্ষা, সমাজ বা রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক আলোচনাতেও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতি তাঁর লক্ষ্যটি নতুন নতুন ভাবে ঘোষিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, বক্তব্যের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্য তাঁর কাব্য এবং মন্ময় কবি-চিত্তের পরিপূরক। ধর্মবোধ বা দর্শন-প্রতীতি

মানুষের একান্ত নিজস্ব অনুভূতি বা উপলব্ধির বিষয়। কিন্তু শিক্ষা, সমাজচিন্তা বা রাষ্ট্রচেতনা বহুলাংশে যুগ কাল এবং সর্বাংশে সামগ্রিক বস্তুজগৎ-সাপেক্ষ। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বিষয়বস্তুগুলির উপর রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ধর্ম বা অধ্যাত্মচিন্তার রচনা তো আছেই। লক্ষণীয় এই যে, শ্রেণী যাই হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ কোনো বিষয়বস্তুকেই খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ করেননি। জীবন-লীলা-রহস্যের মূলে যে মানবিক সত্য, তাকেই তিনি দেখাতে চেয়েছেন সমগ্র সাহিত্যকর্মে। দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে তিনি বলেছেন,

> "... অনেকদিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে, নানা অবস্থায়। শুরু করেছি কাঁচা বয়সে—তখনো নিজেকে বুঝিনি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ-সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। ... আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি। ..."

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি আগাগোড়া কাব্যধর্মী। গদ্য-কবিতার ছন্দে যে মুক্তির ইসারা আছে, তার নিদর্শন প্রবন্ধের গদ্যেও অপ্রতুল নয়। বিশেষ ক'রে, কবির মন্ময় রচনাগুলিকে (personal essay) কাব্যের কোঠাতেই ফেলা যায়। চিন্তাশীল প্রবন্ধের গদ্যরীতিতে কাব্যব্যঞ্জনার লালিত্যই যেন বেশী। সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠার জন্যে যখন প্রবন্ধের অবতারণা তখন তার ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গি যুক্তিনিষ্ঠ এবং স্তরানুক্রমিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বঙ্কিমী গদ্যরীতিতে এই নিয়মের প্রকাশ সম্পূর্ণ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে যুক্তিপ্রতিষ্ঠার উপায় বেশীর-ভাগ ক্ষেত্রেই উপমা-প্রয়োগের মাধ্যমে। এ রীতিটি কবি-মানসের স্বকীয়তায় মণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভাষা এক অভিনব সৃষ্টি। পরবর্তীকালের সাহিত্যবিচারে প্রবন্ধের এ রীতি সমাদৃত হবে কিনা তা তখনকার দিনেই ঠিক হবে। এ-যুগে অন্তত বিশেষ রীতিসিদ্ধ কাব্যগুণসম্পন্ন এই ভাষা এক অনন্য-সাধারণ কীর্তি হিসাবেই চিহ্নিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সংখ্যা অজস্র। একই বক্তব্য তার মধ্যে বহু ভাবে বলা হয়েছে, এর দৃষ্টান্ত অনেক মিলবে। আর সেই সঙ্গে স্ববিরোধী মন্তব্যের অস্তিত্বও তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যের অনেকস্থলেই বিদ্যমান। এই পৌনঃপুনিকতা কিম্বা স্ববিরোধী চিন্তার মূলে যিনি, তিনি প্রবন্ধ-রচয়িতা হলেও মূলত কবি, তাই তাঁর চিন্তাজগতের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটি মনে রেখে এর মূল্যায়ন করায় ভুলের আশংকা কম। কারণ প্রবন্ধ-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ এবং কবি রবীন্দ্রনাথের আঙ্গিক-গত পরিচয় ভিন্ন হলেও, মুল পরিচয়টি এক এবং অভিন্ন।]

# রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্য

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ এক অভিনব ও বিস্ময়কর সাহিত্যসৃষ্টি। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে যে উচ্চাঙ্গের মননশীলতা ও অপূর্ব রস-ব্যঞ্জনার মনিকাঞ্চনযোগ হয়েছে, তা কেবল রবীন্দ্রনাথের মতো প্রথমশ্রেণীর কবি-প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। তথ্য ও যুক্তির সঙ্গে অন্তরঙ্গ অনুভূতির নিবিড় সংযোগ, বক্তব্যের রসময় ও সৌন্দর্যময় প্রকাশভঙ্গী, প্রতি পদে এক রসবিদগ্ধ মনের ভাব-কল্পনার জ্যোতি-বিস্ফুরণ, জগৎ ও জীবনের মধ্যে এক নবতম ভাবদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্যকে এমন এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে উন্নত করেছে যে, যার জুড়ি বিশ্বসাহিত্যে মেলে না।

প্রবন্ধ শব্দটি ইংরেজী Essay-এর প্রতিশব্দরূপে সাধারণত আমরা বাংলায় ব্যবহার করি। বাংলায় নিবন্ধ, সন্দর্ভ প্রভৃতিও সমার্থবোধক। কিন্তু ইংরেজীতে Essay শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। Locke-এর দার্শনিক তত্ত্ব ও যুক্তিতর্কসমন্বিত রচনাকে বলা হয়—*An Essay on the Human Understanding*; বেকন, কারলাইল ও ইমারসনের জ্ঞানগর্ভ ও গভীর চিন্তাপূর্ণ নিবন্ধও Essay, আবার Lamb-এর লঘু মেজাজের রচনাকেও Essay বলা হয়েছে। একটা বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য-রচনা অর্থে Essay শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ফরাসী লেখক Montaigne দ্বারা ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে। Essay শব্দটি মূলে একটি ফরাসী শব্দ। এর অর্থ attempt বা test. ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে Montaigne-এর *Essaies* প্রকাশিত হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে এক নূতন-জাতীয় রচনাকে Montaigne 'essay' আখ্যা দিয়েছিলেন। সাহিত্যে এক

নূতন স্বষ্টির attempt বা experiment হিসাবেই তিনি তাঁর রচনাকে গ্রহণ করেছিলেন। Montaigne তাঁর রচনার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্বের অকপট প্রকাশকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"... Thus, reader, myself am the matter of my book." Montaigne এই মন্ময় ব্যক্তিগত প্রবন্ধ-রীতির প্রথম শিল্পী। ক্রমে Montaigne-এর রীতি একটা বিশেষ ধরনের সাহিত্য-স্বষ্টি বলে সর্বত্র স্বীকৃত ও অনুস্থত হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য দেশের এবং বর্তমানে আমাদের সাহিত্যেও প্রবন্ধের দুটি শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। একটি তথ্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, যুক্তিতর্কমূলক স্নসংবদ্ধ রচনা—যার মধ্যে লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠককে কোনো নূতন বিষয়ে জ্ঞানদান করা, যুক্তি-তর্কের দ্বারা তার বুদ্ধিকে নবতম চিন্তার পথে চালনা করা, তার দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিমার্জিত ও দৃঢ়তর করা। অপরজাতীয় প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিচিত্তের একটা বিশেষ সংযোগ বর্তমান,—তাঁর ভাব-কল্পনার রঙে তা অনুরঞ্জিত, তাঁর অনভূতির রসে অভিষিক্ত, তাঁর নিজস্ব জীবন-প্রত্যয় ও দৃষ্টিভঙ্গীর তন্তুতে সে রূপায়িত। প্রথম-জাতীয় রচনার উদ্দেশ্য তথ্যের উপস্থাপন, তত্ত্বের স্বরূপ-নির্ধারণ ও সত্যের প্রতিষ্ঠা; এর প্রকাশ-পদ্ধতিতে যুক্তির শৃঙ্খলা, চিন্তাধারার স্নসঙ্গতি ও পরিচ্ছন্নতাই কাম্য; দ্বিতীয়-জাতীয় রচনার উদ্দেশ্য বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যকে লেখকের আত্মগত ভাবরসে জারিত করে তার গুরুভার হরণ করা এবং মননশীলতার সঙ্গে হৃদয়ানুভূতির মিশ্রণে বক্তব্যকে 'কান্তাসম্মিত' এবং 'সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য' করা। এইজাতীয় প্রবন্ধ বিষয়বস্তুর তথ্য-বিবৃতি বা স্বরূপ-উদ্ঘাটন নয়, এ একপ্রকার নূতন আবিষ্কার। প্রথম-জাতীয় প্রবন্ধ-সাহিত্যকে ইংরেজীতে বলা হয়েছে—Literature of Knowledge—জ্ঞানের সাহিত্য, আর দ্বিতীয়-জাতীয় প্রবন্ধ-সাহিত্যকে বলা হয়েছে—Literature of Power বা Pleasure—আনন্দমূলক বা রসসমৃদ্ধ সাহিত্য। প্রথম-জাতীয় প্রবন্ধকে বলা যায় বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় প্রবন্ধ—Informative Essay, দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধকে ভাবনিষ্ঠ, মন্ময় বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ—Familiar বা Intimate Essay,—একটি জ্ঞানমূলক রচনা, অপরটি আনন্দমূলক রচনা। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধই প্রকৃত সাহিত্যিক রচনা—লেখকের একপ্রকার স্বতন্ত্র স্বষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিকে এই দ্বিতীয়প্রকার রচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু Montaigne ও Lamb-এর রচনা বা আধুনিককালের তথাকথিত রম্যরচনা

বা *Belles-Lettres*-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর রচনার তুলনা হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ লঘু কল্পনার বিলাসলীলার হাস্যোজ্জ্বল দিবাস্বপ্ন রচনা নয় বা একপ্রকার সৌখীন সাহিত্যিক খেলাও নয়। এমনকি 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর মধ্যেও ঠিক এইজাতীয় রচনা মেলে না। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর প্রবন্ধগুলির মধ্যে লেখকের একটা বিশেষ বক্তব্য আছে, আছে তাঁর বিশিষ্ট ভাবানুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর রূপায়ণ এবং নিজস্ব জীবনদর্শনের প্রতিফলন। কেবল অসাধারণ বাণীশিল্পীর অনবদ্য প্রকাশভঙ্গী ও অপূর্ব কবিত্বময়তা বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও মননশীলতার কঠোরতা দূর করে এদের এমন স্বাদু ও লঘুপথ্য ভোজ্যসামগ্রীতে পরিণত করেছে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যেই বিষয়বস্তুর গৌরব ও মহিমা আছে, কিন্তু তার মধ্যে তথ্য-তর্ক-যুক্তি-সমন্বিত জ্ঞান বা সত্যপ্রচারের প্রয়াস নেই, পাণ্ডিত্যপ্রচারের উদ্দেশ্যও নেই। বিষয়বস্তু তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি, তাঁর সহজাত সংস্কার ও আশৈশব বিশ্বাস, তাঁর কল্পনার মধ্য দিয়ে যেভাবে তাঁর চিত্তে রূপ ধারণ করেছে, তারই প্রকাশ হয়েছে তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে। বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের চিত্তবস্তুতে পরিণত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধগুলি তাঁর কবি-সত্তারই বহিঃপ্রকাশ—তাঁর কবি-মানসেরই অভিব্যক্তি। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সাহিত্য-সমালোচনা, সাহিত্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের প্রবন্ধে অনেক তত্ত্ব-দর্শন ও গভীর চিন্তাধারার প্রকাশ আছে, কিন্তু তা অন্যনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও মননশীলতায় পর্যবসিত হয়নি ; রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি, কল্পনা ও ধ্যানের রূপ ও রসে তা এক বিশিষ্টভাবে রূপায়িত ও রঞ্জিত হয়েছে। শক্তিশালী স্রষ্টার এই প্রবন্ধগুলি একপ্রকার সৃষ্টি—অভিনব সাহিত্যকর্ম। তত্ত্ব-দর্শন-চিন্তা তাদের নিজস্ব সত্তা পরিত্যাগ করে রবীন্দ্র-কবি-মানসের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে—অনুপম কাব্যধর্মিতা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্যের আলোচনায় একটি কথা মনে রাখতে হবে। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে যাঁর কিছু পরিচয় আছে, তিনিই এই রহস্য জানেন যে কবির কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ একই কবি-মানসের বিভিন্ন রূপাভিব্যক্তি। যে ভাব-কল্পনা, বিশিষ্ট অনভূতি বা আইডিয়া বা তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে কবির কাব্যে, তাই একটা ভিন্ন রূপ ধরে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নাটকে, আবার নাটকে বা কাব্যে যে কথাটি প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তার কতকটা ভাষ্য, তাৎপর্য বা টীকা রূপে আলোচিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধে। প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন ও রূপায়ণ বিচিত্র হলেও, দেখা যায় সর্বক্ষেত্রেই ভাবের মূলগত ঐক্য বর্তমান রয়েছে।

কেবল রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতেই আত্মপ্রকাশ করেনি, তাঁর কর্মের মধ্যেও রূপায়িত হয়েছে। শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কবির যে মনোভাব, একান্ত বিশ্বাস ও কল্পনা, প্রাচীন আদর্শের যে অনুপ্রেরণা, শিশুচিত্তরহস্য, যা তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং ভাব-কল্পনার এক অভিনব জাল বুনেছে তাঁর সৃষ্টিকুশলী মনে, তারই বহিঃপ্রকাশ তাঁর শান্তিনিকেতন। কবির সাহিত্যসৃষ্টির মতো এটাও এক সৃষ্টি। অনেকগুলি প্রবন্ধ কবির কাব্য-নাটকের ভাষ্য। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'খেয়া' থেকে 'গীতালি' পর্যন্ত কাব্যধারা এবং 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর' প্রভৃতি নাটকের মূল বক্তব্য বা তত্ত্ব-দর্শনের ব্যাখ্যা আছে। তাঁর সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধগুলিতে যে-সব সূত্রের আলোচনা আছে, তার দৃষ্টান্ত তাঁরই সাহিত্যরীতি। এই ভাবে সবগুলি প্রবন্ধই তাঁর কবি-সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ—তাঁর ভাবানুভূতির রূপায়ণ।

প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু ও রচনাকৌশল আলোচনা করলেই আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে।

'ধর্ম', 'সঞ্চয়', 'শান্তিনিকেতন', 'মানুষের ধর্ম', 'আত্মপরিচয়' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরানুভূতির বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-চেতনা বা ধর্মবোধ কোনো বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে উদ্ভূত নয়। তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক হলেও, ব্রাহ্মসমাজের সুনির্দিষ্ট ধর্মমত, অনুশাসন, উপাসনা-পদ্ধতি ও ধর্মসম্বন্ধীয় আচার-ব্যবহার প্রভৃতি পূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি। "আমাদের পরিবারের যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।" [জীবনস্মৃতি]। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ বা ঈশ্বরানুভূতি তাঁর জীবনের মধ্য থেকেই একটা বিশিষ্ট রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মমার্গের বিশিষ্ট মতবাদের প্রভাব নেই বা কোনো দার্শনিক তত্ত্বভিত্তিক সাধনের অনুসরণ নেই। এই ঐশী-চেতনার প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা যায় যে এর মূল উপনিষদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে উপনিষদের জ্ঞান ও তত্ত্বকে তিনি সামগ্রিকভাবে এবং গতানুগতিক ব্যাখ্যার বন্ধুর পথে গ্রহণ করেননি। উপনিষদের কতকগুলি শ্লোকের মর্ম কবির সমুন্নত কল্পনায় ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, রস-চেতন ও সৃষ্টিকুশলী কবি-মনে যে রূপ ধারণ করেছে, তাই তাঁর অধ্যাত্মচেতনার রূপ। এই আধ্যাত্মিক চেতনা একান্তভাবে তাঁর হৃদয় ও কল্পনা থেকে, তাঁর নিজস্ব ধ্যান

থেকে উদ্ভূত। শুষ্ক জ্ঞান ও তত্ত্ব তাঁর হৃদয়রসে জারিত হয়ে এক নবমূর্তি ধারণ করেছে। দর্শন অপূর্ব কাব্যে পরিণত হয়েছে। তাঁর ধর্মবোধ তাঁর কবি-মানসেরই একটা অঙ্গ। উপনিষদের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের মূর্তিনিরপেক্ষ লীলাবাদ এসে মিশেছে, বৈষ্ণব-প্রেমতত্ত্বেরও প্রভাব পড়েছে। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকদের ভাবধারাও তাঁর এই অনুভূতিকে পুষ্ট করেছে। সমস্ত মিলে রবীন্দ্রনাথের একটা বিশিষ্ট ভগবদনুভূতির রূপ গড়ে উঠেছে। কবি-মানসের এই বিশিষ্ট অনুভূতি, এই মানুষ ও ভগবানের লীলারসোপলব্ধি 'শান্তিনিকেতন', 'ধর্ম', 'সঞ্চয়', 'আত্মপরিচয়', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির প্রবন্ধের মধ্যে, 'নৈবেদ্য', 'খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি', 'বলাকা'র কতকগুলি কবিতায়, 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট' প্রভৃতি গদ্যকবিতাগ্রন্থে এবং শেষজীবনের কাব্যগ্রন্থগুলিতে ব্যাখ্যা, সংকেত, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা ও আভাসে সাহিত্যরূপ লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরানুভূতি জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমে সমুজ্জ্বল এক অপূর্ব অনুভূতি। জগৎ-ব্যাপারের বিচিত্র বাস্তবধারা ও বিভিন্ন কর্ম ও চিন্তা এবং প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও নিয়মকে স্বীকার ক'রে, উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তি, দর্শনের যুক্তিবাদকে গভীর অনুভূতি ও কবি-শিল্পীর হৃদয়-রস দিয়ে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্মিলিত এবং জারিত ক'রে এক অপূর্ব অধ্যাত্মবাদ ও জীবন-দর্শন নির্মাণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এতে জগৎ ও ব্রহ্ম, অদ্বৈত ও দ্বৈত, বিশেষ ও নির্বিশেষ, বিজ্ঞান ও ধর্ম, বাস্তব-চেতনা ও অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীম, অনিত্য ও নিত্য, ইহকাল ও পরকাল একসঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে আছে।

'শান্তিনিকেতন'-এর প্রবন্ধগুলি মূলত ধর্মব্যাখ্যা হলেও তা ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা নয় বা উপনিষদের মন্ত্রের বিশ্লেষণ নয়। এগুলি কবির সত্যানুভূতি—বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে ঐশী-চেতনা কবির হৃদয়ে যে নবরূপ ধারণ করেছে, তারই প্রকাশ এই প্রবন্ধগুলি। এই সত্যানুভূতিই তাঁর কাব্যানুভূতি। জীবনের অনুভূতি ও কাব্যের অনুভূতি একত্র মিলে গিয়েছে।

দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে, কিন্তু তা নিছক দার্শনিক চিন্তা বা তত্ত্বকথারূপে প্রকাশ পায়নি। কবি তত্ত্ব-দর্শনকে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি ও কল্পনায় একেবারে নির্বিশেষ থেকে বিশেষে রূপান্তরিত করেছেন। Abstract থেকে, বিমূর্ত ভাব থেকে Concrete—মূর্ত, রূপময় প্রকাশ কাব্য-রূপান্তরের প্রধান রহস্য। রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য-রচনার মধ্যে

বিশেষীকরণের কৌশল সর্বত্র দেখা যায়। একটি অমূর্ত তত্ত্ব বা চিন্তাকে বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের মধ্য প্রসারিত করে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধে মূর্তিদান করে তাকে সাহিত্যসীমানাভুক্ত করেছেন। এই Abstarct-কে Concrete করবার প্রধান উপায় উপমা ও সাদৃশ্য (Analogy) প্রয়োগ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় অজস্র উপমা ও সাদৃশ্য-ব্যঞ্জনার ব্যবহার করেছেন। এগুলি তাঁর সচেতন উপমা, দৃষ্টান্ত, বা নিদর্শনা প্রভৃতি সাদৃশ্যবাচক অলংকার-প্রয়োগ-চাতুর্য নয়, এগুলি তাঁর রচনার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি—এর নিজস্ব ধর্ম। উপমাই রবীন্দ্রনাথের কবিভাষা। ভাষায় যদি চিত্রধর্ম না থাকে, অর্থাৎ ভাব যদি চিত্ররূপ ধরে আমাদের মনে ভেসে না ওঠে, তবে তা জ্ঞান হতে পারে, তত্ত্ব হতে পারে, কাব্য-সাহিত্য হয় না। কারণ, হৃদয়ের উপর রেখাপাত না করলে, কোনো বস্তু বা বিষয়ের প্রতিচ্ছবি মনে উদিত না হলে, আমাদের সৌন্দর্যবোধ ও রসানুভূতি জাগ্রত হয় না। উপমার দ্বারা অমূর্ত ভাব ও চিন্তা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের বোধ ও চিত্তকে স্পর্শ করে। তাই রবীন্দ্র-রচনায় উপমার এত ছড়াছড়ি। আর উপমাগুলি এত সুচিন্তিত ও অব্যর্থ যে, একটা চমক উৎপাদনের সঙ্গে এগুলি মনে গভীর রেখাপাত করে। উপমার উৎকর্ষ-নির্ণয়ে এতকাল আমরা 'উপমা কালিদাসস্য' বলে এসেছি, এখন 'উপমা রবীন্দ্রনাথস্য' বললে নিঃসন্দেহে উপমার চরম উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত দেওয়া হবে।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই উপমা কিভাবে বিষয়বস্তুকে সহজ, সরস ও হৃদয়গ্রাহী করেছে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে।

ক্রমাগত ত্যাগের মধ্য দিয়েই জগৎ অগ্রসর হচ্ছে, এই আলোচনা উপলক্ষ্যে কবি বলছেন—

> "ত্যাগ করিতেই হইবে এবং ত্যাগের দ্বারাই আমরা লাভ করি। ইহা জগতের মর্মগত সত্য। ফুলকে পাপড়ি খসাইতেই হয়, তবে ফল ধরে, ফলকে ঝরিয়া পড়িতেই হয়, তবে গাছ হয়। গর্ভের শিশুকে গর্ভাশ্রয় ছাড়িয়া পৃথিবীতে ভুমিষ্ঠ হইতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া শরীরে মনে সে নিজের মধ্যে বাড়িতে থাকে ; তখন তাহার আর কোনো কর্তব্য নাই। তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি তাহার বুদ্ধি-বিদ্যা বাড়ার একটা সীমায় আসিলে তাহাকে আবার নিজের মধ্য হইতে সংসারের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এইখানে পুষ্ট শরীর, শিক্ষিত মন ও সবল প্রবৃত্তি লইয়া সে পরিবার ও প্রতিবেশীদের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়। ইহাই তাহার দ্বিতীয় শরীর, তাহার বৃহৎ

কলেবর। তাহার পরে শরীর জীর্ণ ও প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া আসে, তখন সে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনাসক্ত প্রবীণতা লইয়া আপন ক্ষুদ্র সংসার হইতে বৃহত্তর সংসারে জন্মগ্রহণ করে; তাহার শিক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধি একদিকে সাধারণ মানবের কাজে লাগিতে থাকে, অন্যদিকে সে অবসন্নপ্রায় মানবজীবনের সঙ্গে নিত্যজীবনের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকে। তাহার পরে পৃথিবীর নাড়ির বন্ধন সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া দিয়া সে অতি সহজে মৃত্যুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ও অনন্তলোকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে সে শরীর হইতে সমাজে, সমাজ হইতে নিখিলে, নিখিল হইতে অধ্যাত্মক্ষেত্রে মানবজন্মকে শেষ পরিণতি দান করে।" [ ততঃ কিম্, ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩ ]

প্রেমের সাধনায় রসের আধিক্যে আমাদের একটা নেশায় পেয়ে বসতে পারে এই আলোচনা-প্রসঙ্গে বলছেন—

"চিনি মধু গুড়ের যখন বিকার ঘটে তখন সে গাঁজিয়ে ওঠে, তখন সে ম'দো হয়ে ওঠে, তখন সে আপনার পাত্রটিকে ফাটিয়ে ফেলে। মানসিক রসের বিকৃতিতেও আমাদের মধ্যে প্রমত্ততা আনে, তখন আর সে বন্ধন মানে না; অধৈর্য-অশান্তিতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এই রসের উন্মত্ততায় আমাদের চিত্ত যখন উন্মথিত হতে থাকে তখন সেইটেকেই সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। কিন্তু নেশাকে কখনোই সিদ্ধি বলা চলে না, অসতীত্বকে প্রেম বলা চলে না, জ্বরবিকারের দুর্বার উত্তেজনাকে স্বাস্থ্যের বলপ্রকাশ বলা চলে না।" [ বিকার-শঙ্কা, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩ ]

আমাদের আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধটিকে কবি লৌকিক পরিণয়-ব্যাপারের সাদৃশ্য-ব্যঞ্জনায় সরস কাব্যের সীমানায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন।—

"পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন—তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আর কিছু বাকি নেই কেননা তিনি একে স্বয়ং বরণ করেছেন। কোন্ অনাদিকালে সেই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। বলা হয়ে গেছে—যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। এর মধ্যে আর ক্রমাভিব্যক্তির পৌরোহিত্য নেই। তিনি 'অস্য' 'এষ' হয়ে আছেন। তিনি এর এই হয়ে বসেছেন, নাম করবার জো নেই। তাইতো ঋষি কবি বলেন—

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমো লোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

পরিণয় তো সমাপ্তই হয়ে গেছে, সেখানে আর কোনো কথা নেই। এখন কেবল অনন্তপ্রেমের লীলা। যাঁকে পাওয়া হয়ে গেছে তাঁকেই নানারকম করে পাচ্ছি—সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, লোকে-লোকান্তরে। বধূ যখন এই কথাটা ভাল করে বোঝে তখন তার আর কোনো ভাবনা থাকে না। তখন সংসারকে—তার স্বামীর সংসার বলে জানে, সংসার তাকে আর পীড়া দিতে পারে না—সংসারে তার আর ক্লান্তি নেই, সংসারে তার প্রেম।" [ পরিণয়, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪ ]

কিরূপে অহং আত্মার স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করে, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোভাবটি একটি উপমার সাহায্যে চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন—

"এই উপলক্ষ্যে আমি একটি উপমার অবতারণ করতে চাই। নদীর ধারাটা চিরন্তন। সে পর্বতের গুহা থেকে নিঃসৃত হয়ে সমুদ্রের অতলের মধ্যে প্রবেশ করছে। সে যে-ক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সেই ক্ষেত্র থেকে উপকরণ-রাশি তার গতিবেগে আহৃরিত হয়ে চর বেঁধে উঠছে—কোথাও নুড়ি, কোথাও বালি, কোথাও মাটি জমছে, তার সঙ্গে নানা দেশের কত ধাতুকণা এবং জৈব পদার্থ এসে মিলছে। এই চর কতবার ভাঙছে, কতবার গড়ছে, কত স্থান ও আকার পরিবর্তন করছে। এর কোথাও বা গাছপালা উঠছে, কোথাও বা মরুভূমি। কোথাও জলাশয়ে পাখি চরছে, কোথাও বা বালির উপর কুমিরের ছানা হাঁ করে রোদ পোয়াচ্ছে।

এই চিরপরিবর্তনশীল চরগুলিই যদি একান্ত প্রবল হয়ে ওঠে তাহলেই নদীর চিরন্তন ধারা বাধা পায়। ক্রমে ক্রমে নদী হয়ে পড়ে গৌণ, চরই হয়ে পড়ে মুখ্য। শেষকালে ফল্গুর মতো নদীটা একেবারেই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

আত্মা সেই চিরস্রোত নদীর মতো। অনাদি তার উৎপত্তিশিখর, অনন্ত তার সঞ্চারক্ষেত্র। আনন্দই তাকে গতিবেগ দিয়েছে, সেই গতির বিরাম নেই।" [ নদী ও কূল, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪ ]

উপনিষদের 'আত্মানং বিদ্ধি' কথাটি রবীন্দ্রনাথ নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে কেমন আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন! ব্যক্তিগত আবেগ ও কল্পনার উত্তাপে দ্রবীভূত হয়ে শুষ্ক নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান রূপান্তরিত হয়েছে একটি বিশিষ্ট আস্বাদ্যরূপে।—

"কয়েকদিন হল পল্লীগ্রামে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের

ধর্মের বিশেষত্বটি কী আমাকে বলতে পার?' একজন বললে, 'বলা বড়ো কঠিন, ঠিক বলা যায় না।' আর-একজন বললে, 'বলা যায় বৈকি—কথাটা সহজ। আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জানতে হয়। যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর লোককে সবাইকে শোনাও না কেন?' সে বললে, 'যার পিপাসা হবে সে গঙ্গার কাছে আপনি আসবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই কি দেখতে পাচ্ছ। কেউ কি আসছে।' সে লোকটি অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বললে, 'সবাই আসবে। সবাইকে আসতে হবে।'

আমি এই কথা ভাবলুম, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের শাস্ত্রশিক্ষাহীন এই বাউল, এ তো মিথ্যা বলেনি। আসছে, সমস্ত মানুষই আসছে। কেউ তো স্থির হয়ে নেই। আপনার পরিপূর্ণতার অভিমুখেই তো সবাইকে চলতে হচ্ছে, আর যাবে কোথায়। আমরা প্রসন্নমনে হাসতে পারি—পৃথিবী জুড়ে সবাই যাত্রা করেছে। আমরা কি মনে করছি সবাই কেবল নিজের উদর-পূরণের অন্ন খুঁজছে, নিজের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের চারিদিকেই প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে? না, তা নয়।" [ আত্মবোধ, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬ ]

কর্মের দ্বারা আনন্দময় ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য একটি চমৎকার দৃষ্টান্তের সাহায্যে অব্যর্থভাবে উপস্থাপিত করেছেন—

"কর্মযোগের একটি লৌকিক রূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসারকর্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম, স্বামীর প্রতি আনন্দ। সেইজন্যে, সংসারকর্মকে তিনি স্বামীর কর্ম জেনেই আনন্দ বোধ করেন—কোনো ক্রীতদাসীও তাঁর মতো এমন করে কাজ করতে পারে না। এই কাজ যদি তাঁর নিজের প্রয়োজনে কাজ হত তাহলে এর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হত। কিন্তু এই সংসারকর্ম তাঁর পক্ষে কর্মযোগ। এই কর্মের দ্বারাই তিনি স্বামীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্ছেন। গীতায় একেই বলে কর্মযোগ।" [ কর্ম, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪ ]

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ভগবানকে কেবল অসীম অনন্ত বলে জানলে চলবে না; তাঁকে রসময়, প্রেমময়, সৌন্দর্যময় বলে জানতে হবে। সুতরাং জ্ঞানের সঙ্গে রসের যোগ করতে হবে, নিষ্ঠার সঙ্গে প্রেমের যোগ করতে হবে, নইলে

সে জ্ঞান হবে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ। তাই জ্ঞানের সঙ্গে রসের সম্বন্ধটি তিনি যে-ভাবে নির্দেশ করেছেন উপমা ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে, তা আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়কে যুগপৎ চমৎকৃত করে।—

"এই জীবধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে—এর ভিত্তি অনেক পাথরের স্তর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা না থাকলে এর উপরে আমরা এমন নিঃসংশয়ে ভর দিতে পারতুম না, কিন্তু এই কাঠিন্যই যদি পৃথিবীর চরম রূপ হত, তা হলে তো এ একটি প্রস্তরময় ভয়ংকর মরুভূমি হয়ে থাকত।

এর সমস্ত কাঠিন্যের উপর একটা রসের বিকাশ আছে—সেইটেই এর চরম পরিণতি। সেটি কোমল, সেটি সুন্দর, সেটি বিচিত্র। সেইখানেই নৃত্য, সেইখানেই গান, সেইখানেই সাজসজ্জা। পৃথিবীর সার্থক রূপটি এইখানেই প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্যগতির লীলা না থাকলে তার সম্পূর্ণতা নেই। পৃথিবীর ধাতুপাথরের অচল ভিত্তির সর্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্যের প্রবাহ—তার চলাফেরা আসা-যাওয়া মেলামেশার অন্ত নেই।

রস জিনিসটি সচল। সে কঠিন নয় ব'লে, নম্র ব'লে, সর্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে। এই জন্যেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে উঠে জগৎকে পুলকিত করে তুলছে, এই জন্যেই কেবল সে আপনার অপূর্বতা প্রকাশ করছে, এই জন্যেই তার নবীনতার অন্ত নেই।

এই রসটি যেখানে শুকিয়ে যায় সেখানে আবার এই নিশ্চলতা কঠিনতা বেরিয়ে পড়ে, সেখানে প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা ও কমনীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে আড়ষ্টতা তাই উৎকট হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্মসাধনার মধ্যেও এই রসময় গতিতত্ত্বটি না রাখলে তার সম্পূর্ণতা নেই, তার যেটি চরম সার্থকতা সেইটিই নষ্ট হয়ে যাবে। ...

কাঠিন্য ধর্মসাধনার অন্তরালদেশে থাকে। তার কাজ ধারণ করা, প্রকাশ করা নয়। অস্থিপঞ্জর মানবদেহের চরম পরিচয় নয়—সরস কোমল মাংসের দ্বারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়। সে যে পিণ্ডাকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে না, সে যে আঘাত সহ্য করেও ভেঙে যায় না, সে যে আপনার মর্মস্থানগুলিকে সকলপ্রকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করে, তার ভিতরকার কারণ হচ্ছে অস্থিকঙ্কাল। কিন্তু আপনার এই কঠোর শক্তিকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখে এবং প্রকাশ করে আপনার রসময় প্রাণময় ভাবময় গতিভঙ্গীময় অথচ সতেজ সৌন্দর্যকে।

ধর্মসাধনারও চরম পরিচয় যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিসটি রসের জিনিস। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্বচনীয় মাধুর্য ও তার মধ্যে নিত্য-চলনশীল প্রাণের লীলা। শুষ্কতায়, অনম্রতায় তার সৌন্দর্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তার বেদনাবোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গভীর বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্যের নিত্যবিকাশ।" [ রসের ধর্ম, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫ ]

নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই জগতের চিরনবীনতা ও চিরসৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ আছে, এই শুষ্ক তত্ত্বকথাকে কী অপরূপ কাব্যময় ভাষায় রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন তাঁর 'চিরনবীনতা' প্রবন্ধে! এই তত্ত্বই 'বলাকা' কাব্যে ও 'ফাল্গুনী' নাটকে সাহিত্যরূপ লাভ করেছে। এই প্রবন্ধ ও কাব্য-নাটকের মধ্যে মূলতঃ বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই।

'শান্তিনিকেতন'-এর প্রায় সব প্রবন্ধই ব্যক্তিনিষ্ঠ মন্ময় রচনা, তত্ত্ব বা দর্শন কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি ও কল্পনার মধ্য দিয়ে যে রূপ ধারণ করেছে, তারই প্রকাশ হয়েছে এই প্রবন্ধগুলিতে। কতকগুলি প্রবন্ধ তো গদ্যকাব্য। 'বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা' সেইরকম একটি রচনা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলিও এক নূতন সৃষ্টি। সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাহিত্যের সৌন্দর্য ও তাৎপর্য উদ্ঘাটনের দ্বারা পাঠককে এক নবতর আনন্দলোকে—রসলোকে প্রবেশ করানো। পাঠক সাহিত্য পাঠ করে যে আনন্দ পেয়েছে, সমালোচনা যদি সেই আনন্দের স্বরূপ উদ্ঘাটন ক'রে তার সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণ মাত্রাটি পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করতে পারে, তবেই সেটা হবে সার্থক সমালোচনা। এইরূপ সমালোচনাই যথার্থ সৃষ্টিমূলক। বিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য সমালোচক Middleton Murry বলেন—

"If criticism gives this delight, criticism is creative, for it enables the reader to discover beauties and significances which he had not seen, or to see those which he had himself inglimpsed in a new and revealing light."

লেখক অবশ্য তাঁর ভাব-কল্পনার দ্বারা জগৎ ও জীবনের নূতন সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন, সমালোচকও সেই সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্য ও মর্মকে নিজের হৃদয়-রসে রসায়িত ও কল্পনায় রঞ্জিত করে এক নূতন সৃষ্টির রূপ প্রকটিত করেন। লেখক যে-ভাব ব্যক্ত করেছেন, যে-সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন, প্রকৃত সমালোচক কেবল

তারই মূল্য নির্ধারণ করে ক্ষান্ত হন না, তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাবলে তারও উর্ধ্বে উঠে নবতর ইঙ্গিত ও সম্ভাবনীয়তার কথা প্রকাশ করেন। অনেকসময় সমালোচক না বুঝিয়ে দিলে কোন্ সাহিত্যসৃষ্টি কতখানি সুন্দর বা সার্থক, তা পাঠক বুঝতে পারেন না। সমালোচকই সাহিত্যের মর্মগত সৌন্দর্য ও তাৎপর্য নির্দেশ ক'রে পাঠকচিত্তে এক অভিনব বিস্ময় ও আনন্দের সৃষ্টি করেন। এইপ্রকার সাহিত্যসমালোচনা একপ্রকার নূতন সাহিত্যসৃষ্টি এবং কাব্য-নাটক-সৃষ্টির সমপর্যায়ভুক্ত। তাই Middleton Murry বলেছেন— "A good criticism is as much a work of art as a good poem." এইশ্রেণীর সমালোচক হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।

আমরা দেড়হাজার বছর ধরে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা' পড়ে আসছি। মল্লিনাথ প্রভৃতি বড়ো বড়ো পণ্ডিত এর উপর টীকা টিপ্পনী লিখেছেন। তাঁরা কেবল বাচ্যার্থ, ব্যাকরণ ও অলংকারের আলোচনাই করেছেন। এই দুই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের কথা কেউ বলেননি। রবীন্দ্রনাথই প্রথম সমালোচনাসূত্রে এদের মর্মকথা উদ্‌ঘাটন করলেন, কিন্তু এ সমালোচনা কাব্যের দোষ-গুণ বিচার নয়। তিনি এদের মর্মবাণী ও তাৎপর্য নির্দেশ করে এক অভাবনীয় বিস্ময় ও আনন্দে আমাদের অভিভূত করলেন, তাঁর এ সমালোচনা এক নূতন সাহিত্যসৃষ্টি—এক অপূর্ব রসসৃষ্টি।

নর-নারীর দেহ-ভিত্তিক, আত্মকেন্দ্রিক, ভোগসর্বস্ব প্রেম ত্যাগ-তপস্যার দ্বারা পরিশোধিত না হলে জীবনে কোনো সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও পরিপূর্ণ সার্থকতা আনতে পারে না। কেবল প্রবৃত্তির তাড়নায় মিলন পরিণামে দুঃখদায়ক হয়। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমতত্ত্বের দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করেছেন। কালিদাসের কাব্য-নাটক রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ও কল্পনার মায়ারশ্মিপাতে এক নূতন সৌন্দর্য ও তাৎপর্যে দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে।—

> "যে প্রেমের কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযমদুর্গের ভগ্ন প্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। শকুন্তলার কাছে যখন আতিথ্যধর্ম কিছুই নহে, দুষ্মন্তই সমস্ত,

তখন শকুন্তলার সে প্রেমে আর কল্যাণ রহিল না। ... পর্যাপ্ত যৌবনকুঞ্জে অবনমিতা উমা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় আসিয়া গিরিশের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ... হাতে হাতে ঠেকিয়া গেল। বিচলিতচিত্ত যোগী একবার উমার মুখে, উমার বিম্বাধরে, তাঁহার তিন নেত্রকেই ব্যাপৃত করিয়া দিলেন। উমার শরীর তখন পুলকাকুল, দুই চক্ষু লজ্জায় পর্যস্ত এবং মুখ একদিকে সাচীকৃত। ... কিন্তু অপূর্ব সৌন্দর্যে অকস্মাৎ উদ্‌ভাসমান এই-যে হর্ষ দেবতা ইহাকে বিশ্বাস করিলেন না, সরোষে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। নিজের ললিতযৌবনের সৌন্দর্য অপমানিত হইল জানিয়া লজ্জাকুণ্ঠিতা রমণী কোনোমতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। ৮০

যে ত্রিলোচন বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরীকে এক মুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তিনি দিবসের শশিলেখার ন্যায় কর্শিতা শ্লথলম্বিতপিঙ্গল-জটাধারিণী তপস্বিনীর নিকট সংশয়রহিত সম্পূর্ণ হৃদয়ে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। ... শকুন্তলাতেও প্রথম অঙ্কে প্রেয়সীর সহিত দুষ্মন্তের ব্যর্থ প্রণয় ও শেষ অঙ্কে ভরতজননীর সঙ্গে তাঁহার সার্থক-মিলন কবি অঙ্কিত করিয়াছেন।" [ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, প্রাচীন সাহিত্য ]

'কুমারসম্ভব', 'শকুন্তলা'র চেয়েও যে কাব্যখানি রবীন্দ্র-কবি-মানসের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে, সে হচ্ছে 'মেঘদূত'। দীর্ঘদিন ধরে কবি গদ্যে-পদ্যে 'মেঘদূত'-বিষয়ে তাঁর বিচিত্র অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'মেঘদূত' কবিতা, 'চৈতালি'র 'মেঘদূত', 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর 'নববর্ষা' নামক প্রবন্ধ, 'লিপিকা'র 'মেঘদূত' গদ্যকাব্য, 'পুনশ্চ'-এর 'বিচ্ছেদ' কবিতা, 'শেষসপ্তক'-এর আটত্রিশ-সংখ্যক কবিতা ও 'যক্ষ' নামক কবিতা, 'সানাই'-এর 'যক্ষ' নামক কবিতা প্রভৃতির মধ্যে বহুবিচিত্ররূপে 'মেঘদূত' কাব্যের ভাব-রস-রহস্য-ব্যঞ্জনাকে ব্যক্ত করেছেন। কালিদাসের 'মেঘদূত' রবীন্দ্র-কবি-মানসের মধ্যে প্রবেশ করে তার রঙে ও রসে সিক্ত ও রঞ্জিত হয়ে 'নবমেঘদূত' আকারে বের হয়ে এসেছে। 'প্রাচীন সাহিত্য'-এর 'মেঘদূত' প্রবন্ধ ও 'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতা একেবারে রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'মেঘদূত' হয়ে গেছে।

কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যখানিও আমরা দেড় হাজার বছর ধরে পড়ে আসছি। মল্লিনাথের ব্যাখ্যায় কতগুলি শ্লোকের 'ধ্বনি' আবিষ্কৃত হয়েছে বটে, কিন্তু সে ধ্বনি সবই আদিরসাত্মক—স্থূল সম্ভোগের। কালিদাসের 'মেঘদূত' প্রকৃতপক্ষে সম্ভোগের কাব্য—বিরহের কাব্য নয়। 'মেঘদূত'-এর যক্ষ প্রেমিক নয়, তার প্রেমের ধারণা শৃঙ্গার-কামনায় সীমাবদ্ধ। বিরহকে উপলক্ষ্য করে

যক্ষের সম্ভোগ-বাসনা চেতন-অচেতন-সমন্বিত বিশ্বপ্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতকে দেখেছেন নূতন আলোকে—নূতন ভাব-কল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি এর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন চিরন্তন বিরহ-বেদনা—জন্মজন্মান্তরের প্রিয়-বিচ্ছেদের ব্যথা।

"... প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ।

আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানস-সরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে; সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। ...

এই চিরবিরহের কথা উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন—

দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। ..."

[ মেঘদূত, প্রাচীন সাহিত্য ]

'কাব্যের উপেক্ষিতা' কোনো সাহিত্য-সমালোচনা নয়—এ একপ্রকার সৃষ্টি। উর্মিলা, অনসূয়া-প্রিয়ম্বদা, পত্রলেখাকে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ, শকুন্তলা-নাটক ও গদ্যকাব্য কাদম্বরীর অনাদৃত কোণ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে রক্তমাংসের নারীরূপে গড়ে তুলেছেন তাঁর হৃদয়ের সমস্ত মণ্ড ও রস দিয়ে। এরা যে বাস্তবিকই বাল্মীকি, কালিদাস ও বাণভট্ট কর্তৃক উপেক্ষিতা, তা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা পড়েই প্রথম বুঝলাম।

'লোকসাহিত্য'-এর 'ছেলেভুলানো ছড়া'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়ার সঙ্গে শিশুমনের সম্বন্ধ-বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন, তাতে তাঁর শিশুমনস্তত্ত্বের গভীর জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু সেই শুষ্ক, তত্ত্বময় জ্ঞান হৃদয়ের অনুভূতির উত্তাপ ও অন্তর্দৃষ্টির প্রখর আলোকে গ'লে অপূর্ব সাহিত্যিক-রূপ ধারণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ও কল্পনার মধ্য দিয়ে ছড়ার সঙ্গে শিশুমনের সম্বন্ধটি আমরা এক নূতন আনন্দের সঙ্গে উপলব্ধি করি।—

"... শিশুর মতো পুরাতন আর-কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন। কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য; তাহারা মানবমনে

আপনি জন্মিয়াছে। ... বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না—সে সম্প্রতি মাত্র নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছে। আমাদের মতো সুদীর্ঘকাল নিয়মের দাসত্বে অভ্যস্ত হয় নাই, এইজন্য সে ক্ষুদ্রশক্তি-অনুসারে সমুদ্রতীরে বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ায় ছবি স্বেচ্ছামত রচনা করিয়া মর্তলোকে দেবতার জগৎলীলার অনুকরণ করে। এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের কার্যের সহিত বালকের লীলার সর্বদা তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে, উভয়ের মধ্যেই একটা ইচ্ছাময় আনন্দের সাদৃশ্য আছে।" [ ছেলেভুলানো ছড়া, লোকসাহিত্য ]

'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রভৃতি গ্রন্থের সাহিত্য-তত্ত্বমূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তা অনেকাংশে তাঁর নিজের সাহিত্যসৃষ্টিরই ব্যাখ্যা। এগুলি কোনো তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নয়, নিজের অনুভূত সত্য ও গভীর প্রত্যয়ের রূপায়ণ।

রবীন্দ্রনাথ সমস্ত সৃষ্টির মূলে পরম একককে দেখেছেন। সেই 'এক' দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে বিরাজ ক'রে সমস্ত বৈচিত্র্য, সমস্ত অসামঞ্জস্য, সমস্ত খণ্ডতাকে এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত করেছেন। এই পরম 'এক'ই চরম সত্য। এই সত্য পরম সুন্দর। এই পরম সুন্দরকে উপলব্ধি করাতেই যথার্থ আনন্দ।

তাই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সংজ্ঞা এইভাবে নির্দেশ করেছেন—

"আধুনিক কবি বলিয়াছেন: Truth is beauty, beauty is truth. ... উপনিষদও বলিতেছেন: আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্তই truth and beauty, সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্।

সত্যের এই আনন্দরূপ অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্য-সাহিত্যের লক্ষ্য। সত্যকে যখন শুধু আমরা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই, তখন নয়, কিন্তু যখন তাহাকে হৃদয় দিয়া পাই তখনই তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারি। তবে কি সাহিত্য কলাকৌশলের সৃষ্টি নহে, তাহা কেবল হৃদয়েরই আবিষ্কার? ইহার মধ্যে সৃষ্টিরও একটা ভাগ আছে। সেই আবিষ্কারের বিস্ময়কে, সেই আবিষ্কারের আনন্দকে হৃদয় আপনার ঐশ্বর্যদ্বারা ভাষায় বা ধ্বনিতে বা বর্ণে চিহ্নিত করিয়া রাখে, ইহাতেই সৃষ্টিনৈপুণ্য; ইহাই সাহিত্য, ইহাই সংগীত, ইহাই চিত্রকলা।" [ সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্য ]

বিশুদ্ধ সাহিত্যরসসৃষ্টিমূলক অনেক প্রবন্ধ 'পঞ্চভূত' ও 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এ

সংকলিত হয়েছে। ঐজাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রকাশভঙ্গী বা রচনাশিল্পের উৎকর্ষই এখানে আমাদের চিত্তকে বেশি আকৃষ্ট করে।

'পঞ্চভূত'-এর পাঁচটি মানব-চরিত্র পঞ্চভূতের—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের প্রতিনিধি। এরা সাহিত্য, সৌন্দর্য, মানব-স্বভাব, প্রকৃতি-রহস্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে যে সরস আলোচনা করেছে, সেইগুলিই এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু। চরিত্রগুলির মধ্যে ক্ষিতি, সমীর (মরুৎ), ব্যোম পুরুষচরিত্র ও স্রোতঃস্বিনী (অপ্), দীপ্তি (তেজ) নারীচরিত্র। এই পাঁচটি চরিত্রের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য কবি চমৎকারভাবে নির্দেশ করেছেন।

এই পাঁচটি বিভিন্ন চরিত্রকে কবি ভাব-চিন্তায়, আলাপ-আলোচনায়, আচার-ব্যবহারে একটা ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য দান ক'রে তাদের জীবন্ত ক'রে তুলেছেন এবং এক নূতন উপায়ে আলোচ্য বিষয়ের গুরুভার হরণ ক'রে তাকে মনোরম রসপ্রতিষ্ঠ করেছেন।

'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এদের মূল্য "বিষয়বস্তুগৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে"। কিন্তু 'লাইব্রেরি', 'পরনিন্দা', 'মন্দির', 'রঙ্গমঞ্চ', 'ছবির অঙ্গ', 'সোনার কাঠি' প্রভৃতি প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর গৌরব কম নয়। তবে তাদের প্রকাশ হয়েছে অনুপম কবিত্বময়, সরস বাণী-ভঙ্গীতে, তাতেই রচনারসসম্ভোগ সম্ভব হয়েছে।

সমাজবিষয়ক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রসিকতা বা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ প্রবন্ধগুলিকে বিশেষ উপভোগ্য করেছে। যেখানে গতানুগতিক জীবনযাত্রা ও সংস্কার-জীর্ণ জীবন-বোধ অযৌক্তিকতা ও মূর্খতাকে আশ্রয় করেছে, কবি সেখানে ঈষৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত হাস্যচ্ছটা নিক্ষেপ করে তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে আমাদের মনের কাছে প্রকট করেছেন।

আমাদের সমাজ শাস্ত্রোক্ত বিধি-ব্যবস্থা, আচার-বিচারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দিতে গিয়ে মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ ও ধর্মনীতি থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। সামাজিক নিষেধগুলি অমান্য করা আর নরহত্যা প্রভৃতি নৈতিক পাপও একপর্যায়ভুক্ত হয়েছে। আমাদের সমাজে প্রায়শ্চিত্তের নানা পথ খোলা, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত করলেই সকলপ্রকার পাপ ক্ষালন হয়—এই বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"... অত্যন্ত বৃহৎ ভিড়ের ভিতর শ্রেণীবিচার দুরূহ হইয়া উঠে।

অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা, এবং সমুদ্রযাত্রা হইতে নরহত্যা পর্যন্ত সকল পাপই আমাদের দেশে গোলে হরিবোল দিয়া মিশিয়া পড়ে!

পাপ খণ্ডনেরও তেমনই শত শত সহজ পথ আছে। আমাদের বোঝা যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে, তেমনই যেখানে সেখানে তাহা ফেলিয়া দিবারও স্থান আছে। গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলাম, অমনি গাত্রের ধুলা এবং ছোটো বড়ো সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেল। যেমন রাজ্যে বৃহৎ মড়ক হইলে প্রত্যেক মৃতদেহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গোর দেওয়া অসাধ্য হয়, এবং আমির হইতে ফকির পর্যন্ত সকলকে রাশীকৃত করিয়া এক বৃহৎ গর্তের মধ্যে ফেলিয়া সংক্ষেপে অন্ত্যেষ্টিসংকার সারিতে হয়, আমাদের দেশে তেমনই খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে এত পাপ যে, প্রত্যেক পাপের স্বতন্ত্র খণ্ডন করিতে গেলে সময়ে কুলায় না; তাই মাঝে মাঝে একেবারে ছোটো বড়ো সকলগুলাকে কুড়াইয়া অতি সংক্ষেপে এক সমাধির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিতে হয়। যেমন বজ্র আঁটুনি তেমন ফস্কা গিরো।

এইরূপে পাপপুণ্য যে মনের ধর্ম, মানুষ সেটা ক্রমে ভুলিয়া যায়। মন্ত্র পড়িলে, ডুব মারিলে, গোময় খাইলে যে পাপ নষ্ট হইতে পারে এ বিশ্বাস মনে আনিতে হয়।" [আচারের অত্যাচার, সমাজ]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলির একটা স্বতন্ত্র গৌরব আছে। শিক্ষার যে-আদর্শ সম্বন্ধে কবি নানাভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সে-আদর্শের মূলনীতি হচ্ছে শিক্ষায় আনন্দ ও স্বাধীনতা। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উপরই শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা পড়ি অনেক, কিন্তু শিখি কম; যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে-পরিমাণে বিদ্যা পাইনে। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের যোগ নেই—আমাদের জীবনের যোগ নেই।

শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ উপমা ও দৃষ্টান্তের প্রচুর প্রয়োগদ্বারা বিষয়টি চিত্তাকর্ষক করেছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর রসিকতা ও প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের ঔজ্জ্বল্য প্রবন্ধগুলিকে মনোরম করেছে।—

"আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলা কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। যখন ইংরেজি ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি, তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদি বা ভাবগুলো একরূপ বুঝিতে পারি, কিন্তু

সেগুলাকে মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না; বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না।…

আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে, সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে, বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে-শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে-শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানীগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে-সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত তুলিয়া রাখিয়া দিই; আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনো ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।" [ শিক্ষার হেরফের, শিক্ষা ]

"শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্যন্ত হোলো না। যেন ক'নে রইল বাপের বাড়ির অন্তঃপুরে, শ্বশুরবাড়ি নদীর ওপারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়ানৌকাটা গেল কোথায়? …

বিলাতে যাতায়াতের প্রথম যুগে ইংরেজী নেশা যখন উৎকট ছিল, তখন সেই মহলে স্ত্রীকে শাড়ি পরালে প্রেস্টিজ হানি হোত। শিক্ষা-সরস্বতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালী বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে, শাড়ি-পরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতায় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা। …

ইংরেজি খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত এমন বাঙালীর ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি.এণ্ড.ও. কোম্পানীর ডিনার-কামরায় যখন খেতে বসে, তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটা-ছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত ব'লেই ভরপুর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের দাবি সম্পূর্ণ মিটতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা,—আছে সবই অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়।" [ বিশ্ববিদ্যালয় ]

রাজনীতি-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একটা বিশিষ্ট মতবাদ তাঁর দীর্ঘজীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে গেছেন। স্বাধীনতা লাভ করার অর্থ কোনোক্রমে

রাজনৈতিক অধিকার লাভ করা নয়। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছেন, স্বাধীনতার অর্থ অন্তরাত্মার সর্বপ্রকার বন্ধন ও দাসত্ব-মুক্তি। আমাদের আত্মশক্তির দ্বারা অন্তর-প্রকৃতিকে পরিবর্তিত ক'রে, তপস্যা ও কর্মের দ্বারা দেশকে নূতন ক'রে সৃষ্টি করলে আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করব, দেশকে স্বদেশ বলে ফিরে পাব। কেবল 'বয়কট' ও ইংরেজবিদ্বেষপ্রচারে স্বাধীনতা আসবে না, রাজদরবারে 'আবেদন-নিবেদনের থালা বহন' করলেও তা পাওয়া যাবে না। স্বাধীনতা নির্ভর করে অন্তরের মুক্তির উপর—মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনের উপর। রাজনীতিকে তিনি সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিয়েছেন। সংকীর্ণ জাতীয়তা ও শূন্যগর্ভ স্বাদেশিকতাকে তিনি কোনোদিনই প্রশ্রয় দেননি। জাতীয়তার উর্ধ্বে মানবতাকে তিনি স্থান দিয়েছেন। এ বিষয়ে ইংরেজী বাংলা বহু প্রবন্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ ও চরকা-আন্দোলনে যখন আসমুদ্র-হিমাচল কম্পিত, ব্যক্তিগতভাবে মহাত্মাজীর উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও রবীন্দ্রনাথ সেই কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি বৃহত্তর আদর্শের মাপকাঠিতে এই আন্দোলনকে বিচার করেছেন। কী আবেগময় দৃঢ়কণ্ঠে তিনি এই আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন!—

> "আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা—এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ সে তো কোনো বাহ্য প্রক্রিয়ার অন্ধ পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্যে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন। সেকি এই চরকা-চালনায়? চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকে ঐহিক পারত্রিক উপায় গণ্য করেই কি এতকাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে কর্মকে আড়ষ্ট করে রাখিনি? আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো দুর্গতির কারণ কি তাই নয়? আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাইনে, বিদ্যা চাইনে, প্রীতি চাইনে, পৌরুষ চাইনে, অন্তর-প্রকৃতির মুক্তি চাইনে, সকলের চেয়ে বড়ো করে একমাত্র করে চাই, চোখ বুঁজে, মনকে বুঁজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহুসহস্র বৎসর পূর্বে যেমন চালানো হয়েছিল তারই অনুবর্তন করে? স্বরাজ-সাধন-যাত্রায় এই হল রাজপথ? এমন কথা বলে মানুষকে কি অপমান করা হয় না?" [ রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত, কালান্তর ]

রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক বিষয়কেও যে নিজের অনুভূতি ও কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে সরস করে বলতে পারতেন তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তাঁর 'বিশ্বপরিচয়'। কেমন করে মাটি, জল, আগ্নেয় পাহাড়ের মধ্য থেকে অত্যাশ্চর্য প্রাণের সৃষ্টি হল, তার বর্ণনা কী চিত্তাকর্ষক !—

> "আদিকালে পৃথিবীতে জীবনের কোনো চিহ্নই ছিল না। প্রায় সত্তর-আশি কোটি বছর ধরে চলেছিল নানা আকারে তেজের উৎপাত। কোথাও অগ্নিগিরি ফুঁসছে তপ্ত বাষ্প, উগ্‌রে দিচ্ছে তরল ধাতু, ফোয়ারা ছোটাচ্ছে গরম জলের, নিচের থেকে ঠেলা খেয়ে কাঁপছে ফাটছে ভূমিতল, উঠে পড়ছে পাহাড়-পর্বত, তলিয়ে যাচ্ছে ভূখণ্ড।
>
> পৃথিবীর শুরু থেকে প্রায় দেড়শো কোটি বছর যখন পার হল তখন আদিযুগের মাথা-কুটে-মরা অনেকটা থেমেছে। এমন সময়ে সৃষ্টির সকলের চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা দেখা দিল। কেমন করে কোথা থেকে প্রাণের ও তারপরে ক্রমশ মনের উদ্ভব হল তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। তার আগে পৃথিবীতে সৃষ্টির কারখানা-ঘরে তোলাপাড়া ভাঙাগড়া চলছিল প্রাণহীন পদার্থ নিয়ে। তার উপকরণ ছিল মাটি, জল, লোহা, পাথর প্রভৃতি ; আর সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন, হাইড্রজেন, নাইট্রজেন প্রভৃতি কতকগুলি গ্যাস। নানারকমের প্রচণ্ড আঘাতে তাদেরই উলটপালট করে জোড়াতাড়া দিয়ে নদী-পাহাড়-সমুদ্রের রচনা ও অদল-বদল চলছিল। এমন সময়ে এই বিরাট জীবহীনতার মধ্যে দেখা দিল প্রাণ, আর তার সঙ্গে মন। এদের পূর্ববর্তী পদার্থরাশির সঙ্গে এর কোনোই মিল নেই।" [ ভূলোক, বিশ্বপরিচয় ]

সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব

[ "... বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয় ; তার যে রস সে অহৈতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার-কাঠি-ছোঁওয়া সামগ্রীকে জাগ্রত করে জানে আপনারই সত্তায়। তার সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানি নে। ..."

—রবীন্দ্রনাথ

বিশুদ্ধ সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাবে উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে। 'সাহিত্য' কথাটির তাৎপর্য হল অর্থ ও শব্দের নিবিড় সংযোগ। ভারতীয় আলংকারিকেরা কাব্যকে উপলক্ষ্য করে যে-সমস্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, তা কোথাও বা ধ্বনি, কোথাও বা ব্যঞ্জনা, কোথাও বা রসকে আশ্রয় ক'রে আছে। কাব্য বা সাহিত্যে 'রসব্যঞ্জনা'কেই প্রাচীন আলংকারিকগণের পরিণততম সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে। অর্থাৎ রসসৃষ্টিই কাব্যের চূড়ান্ত কথা। রসের সার্থকতার মধ্যেই কাব্যের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যতত্ত্বে 'রস'কেই প্রধান ব'লে গ্রহণ করেছেন। তবে তার প্রকৃতিগত পরিচয় ক্ষেত্রবিশেষে প্রাচীন আলংকারিকগণের রসসংজ্ঞা থেকে ভিন্নতর। রবীন্দ্রনাথের রসতত্ত্বের ভিত্তি হল আনন্দস্বরূপ। নিত্যপ্রবহমান জগৎ-লীলাস্রোতে মানুষের অমরতালাভের কামনা থেকে উৎসারিত যে আনন্দরস তা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ—তা অহৈতুক। সেই আনন্দরসকেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের লক্ষ্য ব'লে বিশ্বাস করেছেন। সে রস কোনো কাল বা দেশের সীমা দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের অনুভূতির সত্যের মধ্যেই তার অবস্থান। অনুভূতি কেবলমাত্র বাইরের কোনো একটা কিছুর প্রতিফলন নয়। তা হল 'অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে, বিশেষ রসে, বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব করা'। এই অনুভূতি মানুষের ব্যক্তিজীবনকে অতিক্রম

ক'রে আরও একটা কিছুর মধ্যে সম্পূর্ণতা পেতে চায়। সাহিত্য হল সেই অতিরিক্ত আনন্দচেতনার বাহন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

"আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ। অনুভূতির গভীরতা-দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনে আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে, অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা। ..."

যে আনন্দচেতনাকে ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বটি গড়ে উঠেছে, সে আনন্দের উৎস উপনিষদ। তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে 'দুঃখ আনন্দেরই অন্তর্ভূত'। মনীষী আরিস্টটলের পোয়েটিক্স্-এ বর্ণিত 'ট্র্যাজেডি'কে কেন্দ্র ক'রে পশ্চিমদেশে ট্র্যাজেডির যে ধারণা গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'দুঃখবাদ'কে তুলনা করা যেতে পারে না। এবং এ কথা সত্য ব'লেই মনে হয় যে, ট্র্যাজেডির রসকে ভালো লাগার কারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের বক্তব্য যথেষ্ট স্পষ্ট নয়।

রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ সাহিত্যে প্রত্যক্ষীভূত বাস্তবের অনুপ্রবেশকে অযথা ব'লেই রায় দিয়েছেন। তাঁর 'সত্য' বাস্তব এবং কল্পনার সত্যের সমন্বয়। এবং সেই কারণেই কল্পনার বা অনুভূতির সত্যকে তিনি বাস্তব ব'লে মনে করতে দ্বিধা করেননি। সাহিত্যে বাস্তবতা তার বিষয়বস্তুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়; তার নির্ভর অনেকখানি রচয়িতার সেই শক্তির উপর, যে শক্তি কল্পনাকেও অনুভূতির রাজ্যে সত্য করে তোলে।

"... বিষয় বাছাই নিয়ে তার রিয়ালিজ্‌ম্ নয়, রিয়ালিজ্‌ম্ ফুটবে রচনার জাদুতে। সেটাতেও বাছাইয়ের কাজ যথেষ্ট থাকা চাই, না যদি থাকে তবে অমনতরো অকিঞ্চিৎকর আবর্জনা আর কিছুই হতে পারে না। এ নিয়ে বকাবকি না করে সম্পাদকের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, প্রমাণ করুন রিয়ালিস্টিক কবিতা কবিতা বটে, কিন্তু রিয়ালিস্টিক ব'লে নয়—কবিতা ব'লেই। ..."

সাহিত্যে 'বাস্তব' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বা অভিমত অবশ্যই যুক্তি-তর্কের অতীত নয়। তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে যদি প্রবন্ধ-সাহিত্যকে বাদও দেওয়া যায়, তা সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাস-সাহিত্যে (যেগুলিকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে) এমন অনেক লক্ষণ হয়তো মিলবে যা কেবল

রচনার শক্তিতেই বাস্তব হয়নি, বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষগোচর বাস্তবতার মূল্যও অনেকখানি। প্রবন্ধ-সাহিত্যের অনেকাংশ শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয়ে জুড়ে আছে। সেখানে বক্তব্যও অল্পবিস্তর উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু উপন্যাস বা নাট্য-সাহিত্যকে নিশ্চয়ই সে-পর্যায়ভুক্ত করা সমীচীন নয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে বিশেষ একটি মতবাদ আছে। এবং বিশেষ মতবাদের সঙ্গে একদেশদর্শিতাও প্রায় অনিবার্য। তা সত্ত্বেও এ-কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের রাজ্যে আনন্দ দ্বারা পরিশুদ্ধ যে রসের কথা বলেছেন, তা মানুষের চিরকালের অনুভূতির বিষয়। খণ্ড বিক্ষিপ্ত সত্যের চেয়ে সত্যের সমগ্র রূপের প্রতিই তাঁর লক্ষ্য। কবির চরমতম সার্থকতা সেই সত্যের অখণ্ড-প্রকাশ-কর্মে।

ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের রচনা খুব ব্যাপক না হলেও, যতটুকু আছে, তার মূল্য বড়ো কম নয়। 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থখানি পড়লেই তা বোঝা যায়। বাংলাভাষার সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনায় তাঁর ভাষা-বিজ্ঞানের পাণ্ডিত্য অসাধারণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মাগধী প্রাকৃত থেকে জাত এই ভাষাটির গতিপ্রকৃতির যে বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তাতে পাণ্ডিত্যের দিকটা বৈঠকী কথাকারের সরস ভঙ্গিমার সঙ্গে মিশে এক সুন্দর রসের সৃষ্টি করেছে। ভাষাতত্ত্বের নীরস আলোচনাতেও রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় কাব্যিক বর্ণনাভঙ্গিটি সর্বত্র উজ্জ্বল। বাংলাভাষার সম্বন্ধে মুখ্যত আলোচনার অবতারণা হলেও, আর্যগোষ্ঠী-জাত প্রায় সব-কয়টি ভারতীয় ভাষার একটি তুলনামূলক আলোচনা তিনি করেছেন। এই প্রসঙ্গে কবির একটি মন্তব্য উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সমস্ত মানুষের কাছেই তার নিজস্ব ভাষার "একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে ; সে প্রয়োজন কোনো কাজ চালাবার জন্যে নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে"। তাই,

> "রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই-কি, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কাজ দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারি প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারই তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।"

ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ মানুষের অকৃত্রিম প্রয়োজনের দিকটিতেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী।]

# ভাষা-সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ

## সুকুমার সেন

জীবনের সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল ছিল, তাঁর মত পরিপূর্ণতার দৃষ্টিমানের যেমন থাকা উচিত। সর্বত্র সজাগ কৌতূহল থাকলেও তাঁর অনুসন্ধিৎসার প্রকাশ হয়েছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে, বাংলা ভাষায় এবং সেই সূত্রে ভাষাবিজ্ঞানে। বাংলা প্রাচীন কাব্যের ভাষার গঠন ও রীতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণের দিকে তাঁর ঝোঁক পড়েছিল বাল্যকালেই। প্রথমে জয়দেবের গানের ছন্দ, তারপরে বৈষ্ণব-কবিতার ভাষা পড়ুয়া রবীন্দ্রনাথের অসীম ঔৎসুক্য আকর্ষণ করেছিল। কৈশোরক পর্বের সঙ্গে সঙ্গে এ-কৌতূহল মিটে যায়নি। তাঁর সময়ে ইংরেজিতে বাংলা তথা ভারতীয় ভাষার যে দেশি ও পাশ্চাত্য মতে আলোচনা হয়েছিল তিনি তা মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন। এবং তৌলন ভাষাবিজ্ঞানের কয়েকখানি প্রামাণ্য বইও তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন।

শব্দতত্ত্বের শেষ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় তাঁর জিজ্ঞাসার ও বিশ্লেষণপ্রচেষ্টার সম্বন্ধে যা বলেছেন তার মধ্যে বিনয় প্রচুর আছে। সেকালের পাঠকেরা নিশ্চয়ই তাঁর বিনয়কেই স্বীকার করেছিলেন। তবে আজ আমাদের কাছে বিনয় ছাপিয়ে সত্যটুকু ফুটে উঠেছে।

> "বৈয়াকরণের যে সকল গুণ ও বিদ্যা থাকা উচিত তাহা আমার নাই,—শিশুকাল হইতে স্বভাবতঃই আমি ব্যাকরণ-ভীরু—কিন্তু বাংলাভাষাকে তাহার সকলপ্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এইজন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয় সাধনে আমি ক্লান্তিবোধ করি না। এই চেষ্টার ফলস্বরূপে ভাষার ভাণ্ডার হইতে যাহা কিছু আহরণ

করিয়া থাকি মাঝে মাঝে তাহার এটা-ওটা সকলকে দেখাইবার জন্য আনিয়া উপস্থিত করি, ইহাতে ব্যাকরণকে চিরঋণে বদ্ধ করিতেছি বলিয়া স্পর্ধা করিব না, ...”

ইস্কুলে তখন যা ব্যাকরণ বলে পড়ান হত ( এবং এখনও হয় ) তার উপর রবীন্দ্রনাথের অশ্রদ্ধা ছিল। তিনি ঠিকই লিখেছিলেন,

> “আমরা যেমন বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস নাম দিয়া মহম্মদ ঘোরী বাবর হুমায়ুনের ইতিহাস পড়ি তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ ভারতবর্ষ মিশ্রিত থাকে, তেমনি আমরা বাংলা ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া থাকি-তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ বাংলার গন্ধ থাকে মাত্র।”[১]

বীমস্ ও হোর্‌ন্‌লের পরে রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষা নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীর উপযুক্ত আলোচনা করেছিলেন। বিদেশী পণ্ডিতের আলোচনা যতই ‘বিজ্ঞানসম্মত’ হোক-না কেন, তাতে তাঁদের বাংলা ভাষাজ্ঞান—তখনকার দিনে অন্তত—সম্পূর্ণ অকুন্ঠিত ভাবে প্রকাশিত হবে এমন প্রত্যাশা অনুচিত, এবং রবীন্দ্রনাথও তা করেননি। কিন্তু তাঁদের আলোচনা যে আমাদের কাছে বাংলা ভাষার এমন অনেক সমস্যা তুলে ধরেছে যে-বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে সচেতনই ছিলুম না। রবীন্দ্রনাথই এ নিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রথম করলেন। বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ ( ১৮৯১ ) পড়বার আগেই এসব সমস্যা তাঁর মনে জেগেছিল। সতেরো-আঠারো বছর বয়সে যখন বিলাত গিয়েছিলেন তখন সেখানে এক ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াতে গিয়ে বাংলা উচ্চারণের কোন কোন বিসদৃশতা ও অসামঞ্জস্যের দিকে তাঁর নজর পড়েছিল ( ‘শব্দতত্ত্বে’ ‘বাংলা উচ্চারণ’ দ্রষ্টব্য )।

বাংলা শব্দের উচ্চারণ সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুকাল মাথা ঘামিয়েছিলেন এবং বুঝেছিলেন যে চলিত ভাষার “উচ্চারণ বিকারগুলি অনেক-স্থলেই নিয়মবদ্ধ”। সে নিয়ম তিনি ‘বালকে’ ও ‘সাধনা’য় প্রকাশিত প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন। কয়েকটি প্রবন্ধ শব্দতত্ত্ব বইটিতে সংকলিত আছে। উচ্চারণ ছাড়া বাংলা ভাষার অপর যে-সব ব্যাপারের আলোচনা তিনি করেছিলেন তার মধ্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অনুকার শব্দের বিশ্লেষণই প্রগাঢ় এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের পর এর চেয়ে বেশি আলোচনা হয়নি।

---

[১] ‘ভাষার ইঙ্গিত’ ( ১৩১৬ )

"বাংলা ভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ এক শ্রেণীর শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই, অথচ যেসকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে।"

এই কথা বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধ ( ১৩০০ ) শুরু করেছেন। শুধু অভিধানেই নয়, সাহিত্যের ব্যবহারেও ধ্বন্যাত্মক শব্দ অপরিগৃহীত ছিল। রবীন্দ্রনাথই এমন শব্দ ব্যাপকভাবে, এমনকি বিশেষ্য ও ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করে তাদের জলচল করে সাহিত্যের ভাষার বলবৃদ্ধি করেছেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। চলিত ( কথ্য ) ভাষায় 'কলকল' বিশেষণ ( যেমন, 'কলকল শব্দে নালা দিয়ে জল বেরিয়ে গেল' ) অথবা ক্রিয়ার বিশেষণ ( যেমন, 'নালা দিয়ে কলকল জল বয়ে যাচ্ছে' )। 'কলকল করে জল বয়ে যাচ্ছে'— এখানে 'কলকল করে' বহুপদ (periphrastic) ক্রিয়ার বিশেষণ। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ্যরূপেও ব্যবহার করেছেন ( যেমন, 'জল বহে যায় কলকলে'—এখানে কলকল = কলকল শব্দ ), ক্রিয়ারূপেও ব্যবহার করেছেন ( যেমন, 'চঞ্চল কলকলিয়া', 'ঝরনা ঝরে কলকলিয়ে' )।

'বাংলা শব্দদ্বৈত' প্রবন্ধে ( ১৩০৭ ) রবীন্দ্রনাথ এমন কিছু কিছু কথা বলেছেন যা তাঁর আগে এবং পরেও কেউ বলেনি। কার্ল ক্রুগ্‌মানের লেখা ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষার তৌলন ব্যাকরণ পড়তে পড়তে তিনি বাংলা শব্দদ্বৈত ব্যাপারের তাৎপর্য লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বলেছেন,

"যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশি, অন্য আর্যভাষায় তত নহে। বাংলা শব্দদ্বৈতের বিধিও বিচিত্র; অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃত ভাষায় তাহার তুলনা পাওয়া যায় না।"

তারপর বিভিন্নপ্রকার শব্দদ্বৈত শ্রেণীবিভক্ত করে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক শ্রেণীর শব্দদ্বৈতের বিশেষ অর্থ ও ব্যঞ্জনা নির্দেশ করেছেন। এবং তিনি অভারতীয় ভাষা থেকে অনুরূপ ব্যাপারের উদাহরণ দিয়েছেন। এই অংশটি উদ্ধৃত করছি।

"ঘোড়া-ঘোড়া ( খেলা ), চোর-চোর ( খেলা )—এইজাতীয়। অর্থাৎ সত্যকার ঘোড়া নহে, তাহারি নকল করিয়া খেলা।

এইরূপ ঈষদূনত্বসূচক অসম্পূর্ণতাবাচক শব্দদ্বৈত বোধকরি অন্য আর্যভাষায় দেখা যায় না। ফরাসী ভাষায় এক‌প্রকার শব্দ ব্যবহার আছে, যাহার সহিত ইহার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে।

ফরাসী চলিত ভাষায় কোনো জিনিসকে আদরের ভাবে বা কাহাকেও খর্ব করিয়া লইতে হইলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে শব্দদ্বৈত ঘটিয়া থাকে। যথা me-mere, মে-মেয়ার, অর্থাৎ ক্ষুদ্র মাতা; মেয়ার অর্থে মা, মে-মেয়ার অর্থে ছোট্টমা, আদরের মা, যেন অসম্পূর্ণ মা। Bete বেট্ শব্দের অর্থ পশু, কিন্তু be-bete বে-বেট্ শব্দের অর্থ ছোট্ট পশু; আদরের পশুটি। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে এই দ্বিগুণীকরণে প্রকর্ষ না বুঝাইয়া খর্বতা বুঝাইতেছে।"

প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"মহারাষ্ট্রী হিন্দি প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য আর্যভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষার সহিত তত্তৎভাষার শব্দদ্বৈতবিধির তুলনা করিলে একান্ত বাধিত হইব।"

প্রবন্ধটি প্রকাশের পর ষাটবৎসর কেটে গেছে। রবীন্দ্রনাথকে বাধিত করতে কেউ এগিয়ে এসেছিলেন বলে মনে হয় না।

'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেক নতুন উপাদান উপস্থিত করেছেন কলকাতার বাইরের কথ্যভাষা থেকে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই বলে রেখেছেন যে তিনি বৈয়াকরণ নন, "অনুরাগবশত বাংলা শব্দ লইয়া অনেকদিন ধরিয়া অনেক নাড়াচাড়া" করেছেন, "কখনো কখনো বাংলার দুই-একটা ভাষাতত্ত্ব মাথায় আসিয়াছে; কিন্তু ব্যাকরণ-ব্যবসায়ী" নন "বলিয়া সেগুলিকে যথাযোগ্য পরিভাষার সাহায্যে সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী" হননি, কেবল "শ্রমের দ্বারা যাহা যাহা সংগ্রহ" করেছেন তা পণ্ডিতেরা বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে শোধন করে নেবেন এই ভরসায় তাঁর প্রবন্ধ রচনা। ভাগ্যে তিনি ব্যাকরণ-ব্যবসায়ী ছিলেন না, তাই চেষ্টা ও পরিশ্রম করে বাংলা কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্ত শব্দের এই চমৎকার descriptive analysis দিতে পেরেছেন।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সব অপরিচিত শব্দ উদ্ধৃত করেছেন তার কিছু নমুনা দিই।

"বাঘ-আঁচ্ড়া গাছ, আছড়া (আঁটি হইতে ধান আছড়াইয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে), ঢালান (জলের), ঝোঁটন্ (ঝুঁটি হইতে), জঁাকুয়া (জেঁকো), আগোয়া, বাছনি (বাছাই), ছোটনা (ধান), দীঘলিয়া (দীঘ্‌লে), আগলিয়া (আগ্‌লে), পাছলিয়া (পাছ্‌লে), ছুট্‌লিয়া (ছুট্‌লে), মজাড়িয়া (মজাড়ে), লাফারু (কোন কোন প্রদেশে

খরগোসকে বলে ), দাবাড়ু ( দাবা খেলায় মত্ত ), হোঁৎকা, উচক্কা, ছোট্‌কিয়া ( ছুট্‌কে ), তল্‌তা ( তবল্‌তা, তবল বাঁশ ), বাসন্দা ( অধিবাসী ), মাকন্দা ( গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন ), ভরট্ট ( নদী ভরট্ট, খাল ভরট্ট জমি ), ঘেরাট্, বড়াং ( কোন কোন প্রদেশে অহঙ্কার অর্থে বড়াই না বলিয়া বড়াং বলে ), ধেড়েঙ্গে, বিরিঙ্গি ( বৃহৎ পরিবারকে কোন কোন প্রদেশে 'বিরিঙ্গগুষ্টি' বলে ), ফেনসা, ইত্যাদি।"

'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধটি সবিশেষ মূল্যবান্। কোন কোন শব্দগুচ্ছে বিশেষ বিশেষ ধ্বনির যে প্রতীক (symbolic) মূল্য আছে—সে-সত্যের দিকে ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি খুব সম্প্রতিকালে পড়েছে। এই প্রবন্ধে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি বাহান্ন-তিপ্পান্ন বছর আগে রবীন্দ্রনাথ আকর্ষণ করে গেছেন।

"আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মূল শব্দের বিকৃতিটাকে মূলের পশ্চাতে জুড়িয়া দিয়া বাংলা ভাষা একটা স্পষ্ট অর্থের সঙ্গে অনেকখানি ঝাপসা অর্থ ইসারায় সারিয়া দেয়—জলটল গানটান তাহার দৃষ্টান্ত।

এই সরকারী টয়ের পরিবর্তে এক এক সময় ফ একটিনি করিতে আসে, কিন্তু তাহাতে একটা অবজ্ঞার ভাব আনে—যদি বলি লুচিটুচি, তবে লুচির সঙ্গে কচুরি নিম্‌কি প্রভৃতি অনেক উপাদেয় পদার্থ বুঝাইবার আটক নাই—কিন্তু লুচিফুচি বলিলে লুচির সঙ্গে লোভনীয়তার সম্পর্কমাত্র থাকে না।

··· আমরা 'বিষ-মিষ' বলিতে পারি, কিন্তু 'সন্দেশমন্দেশ' যদি বলি তবে সন্দেশের গৌরবটুকু একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। 'দুটো ঘুষোমুষো লাগিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে' এ কথা বলা চলে, কিন্তু 'বন্ধুকে যত্নমত্ন' বা 'গরিবকে দানমান করা উচিত' এ একেবারে অচল ···। অতএব টয়ের ন্যায় ফ ও ম প্রশান্ত নিরপেক্ষ স্বভাবের নহে—ইহা নিশ্চয়।"

শব্দতত্ত্বে বাংলা বিভক্তির উৎপত্তি নিয়ে যে বিচার আছে তাতে এখনকার ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে গলদ বেরবে। কিন্তু তার মধ্যে এমন অনেক আশ্চর্য উক্তি আছে যা সমসাময়িক ভাষাবিজ্ঞানীরা জানতেন না। যেমন কর্তায় বহুবচনের বিভক্তির সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তির সম্পর্ক প্রসঙ্গে—

"পরন্তু সম্বন্ধ ও বহুবচনের মধ্যে নৈকট্য আছে। একের সহিত সম্বন্ধীয়গণই বহু। বাংলায় রামের শব্দ সম্বন্ধসূচক 'রামেরা' বহুবচনসূচক; রামেরা বলিতে রামের গণ, অর্থাৎ রামসম্বন্ধীয়গণ বুঝায়। নরা গজা প্রভৃতি শব্দে প্রাচীন বাঙ্গালায় বহুবচনে আকার প্রয়োগ

দেখা যায়, রামের শব্দকে সেইরূপ আকার যোগে বহুবচন করিয়া লওয়া হইয়াছে এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।[২]

১৯১০-১১ সালের পর রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা নিয়ে কোন প্রবন্ধ লেখেননি। একবারে শেষবয়সে একখানি বই লিখেছিলেন 'বাংলাভাষা-পরিচয়' ( ১৯৩৮ ) নামে। এই বইটিতে বাংলাভাষার ধাতুপ্রকৃতি বর্ণনার উপলক্ষ্য করে সাধারণ-ভাবে ভাষার প্রকৃতি শক্তি ও সম্ভাবনার বিষয়ে অনেক গভীর কথা মনোরম ও সহজ ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সে-সব কথার প্রয়োজনীয়তা শুধু ভাষাবিজ্ঞান-প্রবেশার্থীর ও বাংলাভাষা-পারগামীর পক্ষেই আবশ্যক নয়,—আজকের দিনের ভারতবর্ষে যে নিদারুণ ভাষা-সমস্যায় জাতির জীবনমরণের সংকটকাল ঘনিয়ে আসছে সে-বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ অভ্রান্তভাবে পথ নির্দেশ করেছেন।

"এই প্রসঙ্গে য়ুরোপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সেখানে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, অথচ এক সংস্কৃতির ঐক্য সমস্ত মহাদেশে। সেখানে বৈষয়িক অনৈক্যে যারা হানাহানি করে এক সংস্কৃতির ঐক্যে তারা মনের সম্পদ নিয়তই অদল-বদল করছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধারায় বয়ে নিয়ে আসা পণ্যে সমৃদ্ধিশালী য়ুরোপীয় চিত্ত জয়ী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।

তেমনি ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষসাধনে দ্বিধা করলে চলবে না। মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেইদিন য়ুরোপের বড়োদিন। আমাদের দেশের সেই বড়োদিনের অপেক্ষা করব—সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।"

কিন্তু কথায় বলে—চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী॥

---

[২] 'বাংলা বহুবচন' ( ১৩০৫ )

# সাহিত্যতত্ত্ব-বিচারে রবীন্দ্রনাথ

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই রচনা করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি সাহিত্যের আদর্শ নির্ধারিত করিতে এবং সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টার যথাযথ বিশ্লেষণ ও বিচার করা প্রয়োজন। তাঁহার প্রতিভার এই দিকটির সঙ্গে পরিচিত হইলে আমরা শুধু যে তাঁহার রচনার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিব তাহা নহে, সাহিত্যসৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য সম্পর্কেও স্পষ্টতর ধারণা লাভ করিতে পারিব।

রবীন্দ্রনাথ যে যুগে সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেই যুগে ইউরোপ বাস্তবতার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। জোলা তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লিখিয়াছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে; বার্নার্ড শ' রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা মাত্র পাঁচবৎসরের বড় ছিলেন; রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই মার্ক্‌স্‌-বাদী সাহিত্যচিন্তার উদগ্র আত্মপ্রকাশ দেখা গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে সত্যকে শিরোধার্য করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবকে স্বীকার করেন নাই। তিনি মনে করেন যে মানুষের যে বুদ্ধি বাস্তব প্রয়োজনে ব্যয়িত হয় এবং যে বুদ্ধির দ্বারা বিজ্ঞানের তথ্য আহৃত হয় তাহার অতিরিক্ত একটি শক্তি তাহার আছে; সেই শক্তিই সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মতকে অতিরিক্তত্ববাদ বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে। জীবনধারণের ক্লেশ স্বীকার করিয়া, শাস্ত্র-ইতিহাসাদির আলোচনা করিয়া মানুষের যে বৃত্তি নিঃশেষ হইয়া যায় নাই তাহার প্রকাশ অহেতুক সৃষ্টিতে। তাহার একমাত্র ফল আনন্দ,

তাহা শিক্ষাদান করেনা, প্রয়োজনসাধন করেনা, তাহা জ্ঞানবৃদ্ধি করেনা, তাহা শুধু আলস্যের সহস্র সঞ্চয় ; সেই জন্যই বাস্তবজগতে তাহা অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাহাই মানুষকে অমৃতত্বের সন্ধান দিতে পারে। যে আনন্দ বাস্তবজীবনে উপরি-পাওনা তাহা মানুষের অন্তরতম জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করে। মানুষের হৃদয়ে এই উপলব্ধি সতত সঞ্চারিত হইতেছে যে বাস্তবজীবনের লাভক্ষতির ঊর্ধ্বে, বিজ্ঞানবুদ্ধির অনায়ত্ত এক জগৎ আছে, যাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত বৃত্তি বা কল্পনার দ্বারা অধিগম্য এবং তাহাকে না পাইলে মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হইয়া যায়। প্রয়োজনাতিরিক্তের সন্ধানেরও প্রয়োজন আছে ; এই অ-লৌকিক প্রয়োজনসাধন কাব্য ও সাহিত্যের সার্থকতা। সাহিত্য অপ্রয়োজনের ঐশ্বর্য ; তাই সাহিত্যের বাক্য হয় অলংকৃত, যাহা অলং অর্থাৎ অতিরিক্ত তাহার মধ্যেই চরমের প্রতিরূপকে দেখা যায়, যে আকাশ প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ হয় নাই তাহার মধ্যেই আমাদের অন্তরাত্মা অবাধে পক্ষবিস্তার করিতে পারে।

অতিরিক্তত্ববাদকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে সত্য সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করিতে হইবে। যাহা অবাস্তব বা অতিরিক্ত তাহা অসত্য নহে। ব্যবহারিক জগতে আমরা যেসকল বস্তুর সংস্পর্শে আসি তাহাদের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু যেহেতু কোনো বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদেই তাহাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, সেইজন্য তাহাদের সম্পূর্ণ রূপ আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়না। এই যে খণ্ডিত, সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব, কবি ইহার নাম দিয়াছেন বাস্তব ; ইহা বাস্তব হইলেও সত্য নাও হইতে পারে ; ঘটে যে তা সত্য নয়। যে রাম কোনো বিশিষ্ট কালে বিশিষ্ট সময়ে অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ইতিহাসে যে বাস্তবতা আছে তাহা দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই, কাজেই তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি বাল্মীকি-বর্ণিত রঘুপতি রাম নহেন। বিজ্ঞান বস্তুর স্বরূপ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে ; যাহা কিছু সাময়িক বা আকস্মিক তাহা পরিত্যাগ করিয়া সে বস্তুর আসল রূপটি প্রকাশ করে। তাই মনে হয় বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধানী, প্রয়োজনের দাস নহেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিও সীমাবদ্ধ, কারণ তাহা নৈর্ব্যক্তিক, impersonal ; বৈজ্ঞানিকের দেখা পক্ষপাতশূন্য, নিছক দেখা, বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা। বৈজ্ঞানিক বস্তুকে লইয়া যান ল্যাবরটরিতে, যেখানে বাহিরের কোনো জঞ্জাল বস্তুর স্বরূপকে আচ্ছন্ন করিতে পারেনা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাঁহার ব্যক্তিগত পক্ষপাত, স্বকীয় আসক্তিকেও বাহিরে রাখিয়া

আসেন, তাহাও বাহিরের জঞ্জাল। স্নুতরাং বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিও সম্পূর্ণাঙ্গ নহে; ইহাও একটি অবচ্ছিন্ন বস্তু বা abstraction। এই জন্যই আজ যাহা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন, কাল অতি সহজে তাহা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনসাধনে নিয়োজিত হয়। বিজ্ঞানের সত্য এবং বাস্তবজীবনের সত্য—ইহাদের মধ্যে মৌলিক সঙ্গতি আছে; ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। উভয়েই সত্যকে খণ্ডিত করিয়া দেখে; ব্যবহারিক জীবনে মানুষ শুধু নিজের লাভক্ষতি ও আসক্তির দ্বারা চালিত হয় বলিয়া সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; বৈজ্ঞানিক সেই আসক্তিকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন বলিয়া সত্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেননা, তিনি বাস্তবকে চিনেন, কিন্তু সত্য তাঁহার কাছে অপরিচিত আগন্তককের মতো দূরেই থাকিয়া যায়।

। দুই ।

সাহিত্যে সত্যের যে পরিচয় পাই তাহার প্রধান গুণ অন্তরঙ্গতা। সেই সত্য আমাদের প্রয়োজনের জগতের ভৃত্য নয়, অর্ধপরিচিত আগন্তক নয়, তাহাকে দেখি বন্ধুর মোহন মূর্তিতে; 'তাই আপনি জেগে ওঠে ভাষায় অলংকার, কণ্ঠের স্নুরে অলংকার, হাসিতে অলংকার, ব্যবহারে অলংকার'। সাহিত্যের বাণী স্বয়ংবরা।

'সাহিত্য'কথার তাৎপর্যগত অর্থ হইতেছে শব্দ ও অর্থের নিবিড় সংযোগ বা সহিতত্ব। শব্দ ও অর্থের সংযোগ সর্বজনস্বীকার্য সত্য; শব্দ উচ্চারিত হওয়ামাত্র অর্থ প্রতিভাত হয়। এই 'সাহিত্য' সকলপ্রকার রচনায়ই পাওয়া যায় এবং ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ নাই। শব্দ ও অর্থের সহিতত্ব বা 'সাহিত্য' আকাশ-আলোর মতোই প্রত্যক্ষ, ইহা নিঃশ্বাসগ্রহণের মতোই সহজ। 'সাহিত্য'-শব্দের প্রকৃতিগত অর্থের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মৌলিক রহস্যের সন্ধান পাইয়াছেন। কবি জগৎকে আপনার করিয়া দেখেন, তিনি জগৎকে চেনেন আনন্দানুভূতির মধ্য দিয়া, জগতের সহিত মিলিত হইয়া। যাহা অতিরিক্ত তাহা অবান্তর নহে; কারণ এই অতিরিক্তের, অপ্রয়োজনীয়ের মধ্য দিয়াই মানুষ দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে, নিজের সঙ্গে অপরের সহিতত্ব অনুভব করিতে পারে, সীমা হইতে অসীমের মধ্যে পক্ষসঞ্চালন করিতে পারে। স্নুতরাং সাহিত্যই হইতেছে সেই বস্তু যেনাহং অমৃতং স্যাম্, কারণ এই যে অখণ্ড সহিতত্ব ইহার মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর পার্থক্য ঘুচিয়া যায়, মরণ বঁধুরূপে, শ্যামসমান হইয়া দেখা যায়।

ইংরেজ কবি ম্যাথু আর্নল্ড লিখিয়াছেন :

> Yes ; in the sea of life enisled,
> With echoing straits between us thrown,
> Dotting the shoreless watery wild,
> We mortal millions live *alone*.

মেঘদূতের আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটির উল্লেখ করিয়াছিলেন। মানুষ মানুষের সহিত মিলিত হইতে চায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনন্ত বিরহ এবং এই বিরহের কথাই কালিদাসের কাব্যে অপরূপ অভিব্যক্তি পাইয়াছে। এই বিরহ শুধু একবৎসরের জন্য নহে, ইহা অনন্তকালব্যাপী। ইহাকে অতিক্রম করিবার মন্ত্র রহিয়াছে কাব্যে ও সাহিত্যে, কারণ রসের জগৎ সম্পূর্ণ বাধাবন্ধহীন। এইজন্যই 'রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটি উপভোগ করিয়াছে আজও তাহা বাতিল হয় নাই। কিন্তু বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা-ওবেলা বদল হইতে থাকে'।

কবির কাব্যের সূত্রপাত হয় ব্যক্তিগত আসক্তিতে, কিন্তু তাহার পরিণতি এক সার্বভৌমিক সত্তায়, দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য যাহার নাম দিয়াছেন *Heart Universal*। 'আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।' যখন কবি তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বিশ্বের পটভূমিকায় বিস্তারিত করিয়া দেখেন তখন তাঁহার অনুভূতির মধ্যে আসক্তি ও নিরাসক্তির অপূর্ব সমন্বয় হয়। রবীন্দ্রনাথ কোথাও আনন্দবর্ধন বা অভিনবগুপ্তের নাম করেন নাই ; কিন্তু তিনি অতিরিক্তত্ব ও সাহিত্যের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার সঙ্গে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের, বিশেষ করিয়া ধ্বনিবাদীদের অ-লৌকিকত্ব-তত্ত্বের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সাহিত্যের অনুভূতি স্ব-গতও নয়, পরগতও নয় ; ইহা অ-লৌকিক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কবি বিশ্ববস্তুকে ও বিশ্বরসকে একেবারে অব্যবহিতভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার জোর।

## । তিন

এই যে বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে আপন অন্তরতম সত্তার উপলব্ধি—ইহারই নাম লীলা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি বৈষ্ণবকবিতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব কাব্য ও ধর্মের লীলাবাদের দ্বারা

তাঁহার সাহিত্যবিচার উদ্ভাসিত হইয়াছে। কবি অন্য কিছু কাজ না করিয়া শুধু মালঞ্চের মালাকর হইতে চাহিয়াছেন; তিনি প্রয়োজনের জগৎ হইতে ছুটি নিয়াছেন। তাই অনেকে মনে করিতে পারেন, তাঁহার মতে কাব্য ও সাহিত্য ক্ষণিক খেলনা মাত্র, ইহারা জীবনের দায়িত্বপূর্ণ কাজ হইতে পলায়নের পথের সন্ধান দেয়, ইহাই ইহাদের একমাত্র সার্থকতা। এইরূপ মনে করিলে সাহিত্যের রহস্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবেনা এবং রবীন্দ্রনাথকেও ভুল বোঝা হইবে। জীবনের চরমতম সত্য হইতেছে বাঁচিবার অহেতুক ইচ্ছা, ইহা বিজ্ঞান ও দর্শনও স্বীকার করে। এই অহেতুক ইচ্ছাই প্রকাশ পায় কাব্যে ও শিল্পে, কারণ কাব্য ও শিল্প অন্য কোনো প্রয়োজনের দাসত্ব করেনা। ইহাদের মধ্য দিয়া মানুষের অন্তরাত্মা নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে। এই প্রকাশের উৎসবেরই অপর নাম লীলা।

ভগবান্ এক ছিলেন; তিনি বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে বহু হইলেন। যুগে যুগে তিনি নানা অবতার রূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিবেন এই আবির্ভাবের উদ্দেশ্য দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ, সাধুলোকদের রক্ষা এবং ধর্মসংস্থাপন। লীলাবাদী বলিবেন, ঐসব প্রচেষ্টা গৌণ, কারণ সর্বশক্তিমান্ ভগবান ঐসকল কঠিন প্রয়াস ছাড়াও তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিতেন। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন নিজেকে বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করিবার জন্য এবং ইহার মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করিবার জন্যই তিনি জগতে অবতীর্ণ হয়েন। ইহাই সৃষ্টির লীলা। কবি বলিয়াছেন মেনকার কবরীতে যে পারিজাত ফুলটি রহিয়াছে তাহার মধ্যেই মুক্তির পূর্ণরূপের মূর্তিটি দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিধাতার রুদ্ধ আনন্দ ঐ পারিজাতের মধ্যে মুক্তি পাইয়াছে—সেই অরূপ আনন্দ রূপের মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে।

ইহাই বিশ্বসৃষ্টির রহস্য এবং ইহাই কাব্যসৃষ্টিরও রহস্য। আমাদের প্রাচীন আলংকারিকেরা বলিয়াছেন কবিরেব প্রজাপতিঃ; ইংরেজ সমালোচকেরাও কবির বিচিত্র সৃষ্টি দেখিয়া বলিয়াছেন, Here is God's plenty। কবি বিশ্বের বিপুল ঐশ্বর্যের সঙ্গে একান্তভাবে মিলিত হইতে পারেন; এই সানন্দ মিলনের মধ্যেই কবি বিশ্বের রহস্য ও আপন হৃদয়ের রহস্যের সন্ধান পান। কাজেই প্রজাপতির সৃষ্টির মতো কবির সৃষ্টিও আনন্দোজ্জ্বল। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান জীবনকে দেখে সংগ্রামের মূর্তিতে, মানুষে মানুষে লড়াই, প্রাণীতে প্রাণীতে লড়াই, জীবজগতের সঙ্গে জড়জগতের লড়াই, অণুতে পরমাণুতে লড়াই।

কিন্তু আমাদের কবি ও দার্শনিকেরা জীবনকে দেখিয়াছেন সুন্দরের লীলাময় অভিব্যক্তি রূপে; রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া দেখি, সেই যুদ্ধব্যাপার (যাহাকে বিজ্ঞান বলে অণুতে পরমাণুকে লড়াই) ফুল হইয়া ফোটে, তারা হইয়া জ্বলে, নদী হইয়া চলে, মেঘ হইয়া ওড়ে।' এইজন্যই তিনি মুক্তি খুঁজিয়াছেন জীবনের অসংখ্যবন্ধন মাঝে, বৈরাগ্যসাধনে নয়। এই মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে হইলে জগতের সঙ্গে মিলিত হইতে হইবে, তাহার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সহিতত্ব (বা 'সাহিত্য') বোধ করিতে হইবে, এবং এই সহিতত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে তাহাকে লোভীর মতো আপন সম্পত্তিতে পরিণত করিলে চলিবেনা, আবার বৈজ্ঞানিকের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিলেও চলিবেনা।

## চার

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসম্পর্কে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার দুই একটি ত্রুটির প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। প্রথমতঃ, এই মতবাদে ট্র্যাজেডির রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবেনা। দুঃখের কাব্যে অথবা বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যে কেন আমরা আনন্দ পাই ইহার সদুত্তর রবীন্দ্রনাথ দিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে দুঃখের মধ্যে একটা নিবিড় অস্মিতাবোধ আছে, দুঃখের মধ্যে আমরা নিজেকে গভীরভাবে জানি। কিন্তু দুঃখ তো সহিতত্বের কথা বলেনা, আনন্দ হইতে তাহার উদ্ভব হয়না, বরং তাহা তো জীবনবীণার ছেঁড়া তারেরই পরিচয় দেয়। ইহার মধ্যে যদি আমাদের নিবিড় অস্মিতাবোধ জাগ্রত হয় তবে তাহারই ব্যাখ্যার প্রয়োজন। অন্যত্র কবি বলিয়াছেন যে আমরা বাস্তবজীবনেও হিংস্র ব্যাপারে আনন্দ পাই; তাহা না হইলে দেবীর কাছে মহিষ বলিদান করিয়া ভক্তরা উন্মত্ত নৃত্য করিবে কেন? কুৎসিত বস্তুও আনন্দ দান করে; ভাঁড়ুদত্ত প্রভৃতি আমাদের মনে যে অবজ্ঞার ভাব উদ্রিক্ত করে সেই ভাবটাই উপভোগ্য। কিন্তু মহিষবলির আনন্দ অবজ্ঞার আনন্দ, ইহাদিগকে কি লীলা বলা যাইতে পারে? রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড আনন্দময় ঐক্যের সন্ধান করিয়াছেন, কাজেই যাহা বীভৎস, পাপাসক্ত—তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন নাই। বোধ হয় ইহা ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটা বৈশিষ্ট্য; এইজন্যই সংস্কৃত-সাহিত্যে ট্র্যাজেডি নাই; মদনভস্ম 'কুমারসম্ভব'-এর অঙ্গ মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্যের উদ্ভব হয় মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শে। কবি জীবনে যাহা তীব্রভাবে অনুভব করেন তাহাই কাব্যে প্রকাশ করেন, সুতরাং কাব্যের তাৎপর্য বাস্তবের তথ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেনা। প্লেটো হইতে কার্ল মার্ক্‌স্ প্রভৃতি নীতিবিদ্‌গণ সাহিত্যকে জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসাবে দেখিয়া এবং সাহিত্যের অতীত মানদণ্ডের দ্বারা সাহিত্যের বিচার করিতে যাইয়া ভুল পথে অগ্রসর হইয়াছেন। পেটার, ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আদর্শবাদীরা একেবারে বিপরীত দিকে গিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে, সাহিত্যের মধ্যে যে বিষয়বস্তু থাকে তাহা সাহিত্যের নিয়ামক নয়, আবার বিষয়বস্তুর মূল্যকে 'বস্তুপিণ্ডের ওজন' বলিয়া তাচ্ছিল্য করিলেও চলিবেনা। আমাদের দেশের প্রাচীন আলংকারিকেরা সাহিত্যের আস্বাদকে পানকরসের আস্বাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সুমিষ্ট পানীয়ের মধ্যে যেমন নানা বস্তুর আস্বাদনের সমন্বয় হয় এবং এই আস্বাদন-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই পানকরসের সমগ্রতা অনুভূত হয়, তেমনি সাহিত্যের মধ্যেও বাস্তব তথ্য ও কাল্পনিক আদর্শের সংযোগ হয়; এইজন্যই সাহিত্যের আস্বাদ অ-লৌকিক, ইহা একই সঙ্গে বাস্তব ও অবাস্তব। শাস্ত্র, ইতিহাসাদি ইহার ভিত্তিভূমি; এই ভিত্তিভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই ইহা ঊর্ধ্বমুখে বাহু সঞ্চালন করে। পদের অর্থের সঙ্গে বাক্যের অর্থের যে সম্পর্ক, দীপশিখার সঙ্গে আলোর যে সম্পর্ক—ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে কাব্যের ও সাহিত্যের সেই সম্পর্ক।

প্রত্যেক মতবাদের মধ্যে খানিকটা সঙ্কীর্ণতা থাকে; পরিপূর্ণ সত্য মানুষের আয়ত্তের অতীত। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব-ব্যাখ্যানের একদেশদর্শিতা স্বীকার করিলেও ইহাও মানিতে হইবে যে রবীন্দ্রনাথের আলোচনার মধ্যে সাহিত্যের রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে; বিশেষ করিয়া তিনি সাহিত্যের বিস্তৃতি ও সামগ্রিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয় তখনই আমাদের মনের সঙ্গে তাহার সহিতত্ব হয় বিশুদ্ধ ও বাধাহীন। ইহাই তাঁহার অতিরিক্তত্ববাদ ও 'সাহিত্য'বাদের সার কথা। তারপর মানবজীবনে আমরা যাহা কিছু জানি বা উপলব্ধি করি তাহার মধ্যে সুসংলগ্নতা নাই, আমরা সত্যকে দেখি খণ্ডিত করিয়া—'বহু অবান্তর বিষয় ও ব্যাপারের দ্বারা সে পরিচ্ছিন্ন'। কিন্তু সাহিত্যের জগতে

আছে শুধু প্রকাশের উৎসব; তাই যাহা কিছু বিচ্ছিন্ন বা অবান্তর তাহা অবলুপ্ত হইয়া যায় এবং সত্যের সমগ্র রূপ প্রতিভাত হয়। সেই রূপকে আমরা জানি অব্যবহিতভাবে, একান্ত প্রত্যক্ষমূর্তিতে, কারণ রূপের অভিব্যক্তিই সাহিত্যিকের উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য; এইজন্যই কবিকর্মের অপর নাম লীলা।

# ছোটোগল্প

[ রবীন্দ্র-সাহিত্যের সৃজনধর্মী শিল্পপর্যায়ে কাব্য এবং সংগীতের পরেই ছোটোগল্পের স্থান। সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা এবং ব্যাপক আবেদনের ক্ষেত্রে কবি ও সংগীতকারের অন্তরধর্মে যে সদৃশ 'মুড্' বা বিভাবনার কথা সংগীতপ্রসঙ্গে আলোচনা করা হ'য়েছে, রবীন্দ্র-মানসের সেই 'মুড্' কবিতা এবং গানের পরিধির বাইরে সবচেয়ে বেশী ক'রে বোধ হয় ধরা পড়েছে তাঁর ছোটো-গল্পগুলিতে। অথচ কবিতা বা গানের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশের যে তীব্র বাসনাটি কবির বহু রচনায় এবং চিঠিপত্রে বহুবার উল্লিখিত হ'য়েছে, তা ছোটো-গল্পকে কেন্দ্র ক'রে প্রগাঢ় হ'য়ে ওঠার মনোভাব তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যগুলির মধ্যে ঠিক ততখানি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়নি। বিশেষ ক'রে 'ছিন্নপত্র' এবং অন্যত্র বিক্ষিপ্তভাবে ছোটোগল্প সম্বন্ধে কবির আগ্রহসূচক কিছু কিছু কথা অবশ্য আছে। কিন্তু 'ছিন্নপত্র'র বক্তব্যগুলি থেকে আপাতবিচারে এমন ধারণা হওয়াও বিচিত্র নয় যে, ছোটোগল্প রচনার আগ্রহটা আত্মলীন কবিসত্তার অবসর-বিনোদনের খেয়ালী খেলা মাত্র।

> "… আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না ক'রে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভ'রে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। …"

১৮৯৪ সালের জুন মাসে লিখিত এই চিঠির মধ্যে কবির তৎকালীন ব্যক্তি-মনের যে বাস্তব পটভূমি আছে, তাকে অগ্রাহ্য করা চলে না। 'আসমানদারী'র কল্পলোকে বিভোর যে যুবকটির উপর 'জমিদারি' তদারকের দায়িত্ব পড়েছিল, তাঁর কবি-মনটি কেবলই একটুখানি ছুটির জন্যে ছটফট করেছে। পত্রাংশে উল্লিখিত ওই 'মনের সুখ' এবং 'অবসর ভ'রে রাখা'র সঙ্গে তার যোগাযোগ

হয়তো আছে। কিন্তু তাঁর ছোটোগল্প রচনার গূঢ়তম প্রেরণা অন্য উৎস থেকে এসেছে। মধ্যবঙ্গে পদ্মা অঞ্চলে প্রবাসকালে কবি-চিত্তে নব-উন্মেষিত জীবন-বোধ, প্রকৃতি-প্রেম এবং মানব-প্রীতির মিশ্র অনুভূতিগুলির প্রকাশ-ব্যাকুলতাই সেই আদি উৎস। পদ্মানদীকে কেন্দ্র ক'রে পতিসর, সাজাদপুর, শিলাইদহ এবং যাতায়াতের পথে বিভিন্ন জনপদের সাধারণ নরনারী, প্রকৃতিবৈচিত্র্য কবির মনের অনেকখানি জুড়ে নিয়েছিল। তার ভাবগ্রাহ্য (abstract) উপলব্ধিগুলি কাব্যলোকের পরিসরে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু চলমান জীবন-প্রবাহের যে বাস্তবতা কেবলমাত্র ওই ভাবরূপের মধ্যেই পূর্ণ প্রকাশিত হ'তে পারে না, তার জন্যে প্রয়োজন ছিল অন্য মাধ্যমের। ছোটোগল্পের অনুভূতি-গ্রাহ্য সজীব পরিবেশ এবং চরিত্রগুলির মুখ্য প্রয়োজন সেইখানে। বাস্তব-জীবন-বোধের সঙ্গে কল্পনাশ্রয়ী কবিধর্মের মিলনে গল্পগুচ্ছের নিটোল মুক্তোগুলি এই অন্তঃস্থ প্রেরণার ফসল।

> "আমাদের ঘাটে একটি নৌকো লেগে আছে, এবং এখানকার অনেকগুলি 'জনপদবধূ' তার সম্মুখে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় একজন কে কোথায় যাচ্ছে এবং তাকে বিদায় দিতে সবাই এসেছে। ··· একজন মেয়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে রৌদ্রে চুল এলিয়ে দশাঙ্গুলি দ্বারা জটা ছাড়াচ্ছে এবং নৌকোর আর-একটি রমণীর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ঘরকন্নার আলাপ হচ্ছে। শোনা গেল, তার একটি মাত্র 'ম্যায়া', অন্য 'ছাওয় ল নাই'—কিন্তু সে মেয়েটির বুদ্ধিসুদ্ধি নেই—'কারে কী কয়, কারে কী হয়, আপন পর জ্ঞান' নেই। আরও অবগত হওয়া গেল, গোপাল সা'র জামাইটি তেমন ভালো হয়নি, মেয়ে তার কাছে যেতে চায় না। ··· নৌকো যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই-একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চোখ মুছতে লাগল। একটি ছোট মেয়ে, খুব এঁটে চুল বাঁধা, একটি বর্ষীয়সীর কোলে চড়ে তার গলা জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। যে গেল সে বোধহয় এ বেচারির দিদিমণি, এর পুতুল-খেলায় বোধহয় মাঝে মাঝে যোগ দিত, বোধহয় দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে সে একে টিপিয়েও দিত। সকালবেলাকার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদে পূর্ণ বোধ হতে লাগল! সকালবেলাকার একটা অত্যন্ত হতাশ্বাস করুণ রাগিণীর মতো। মনে হল, সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ। এই অজ্ঞাত ছোটো মেয়েটির ইতিহাস আমার যেন অনেকটা পরিচিত হয়ে গেল। ···"

ঘটনার বাস্তব অংশটুকু কবির কাছে এনেছে জীবন-বৈচিত্র্যের আস্বাদ। তার সঙ্গে যে মুহূর্তে 'বোধ হয়' যুক্ত হয়েছে সেই মুহূর্তেই অজ্ঞাত ছোটো মেয়েটি কবির ভাবকল্পনায় নতুন মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে একটি ছোটোগল্পে।

> "ঠিক সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিলুম, একটা লম্বা নৌকোয় অনেকগুলো ছোকরা ঝপ্‌ঝপ্ ক'রে দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে তালে গান গাচ্ছিল—
>
> যোবতী, ক্যান বা কর মন ভারি।
> পাবনা থাক্যে আন্যে দেব ট্যাকা দামের মোটরি।
>
> স্থানীয় কবিটি যে ভাব অবলম্বন ক'রে সংগীত রচনা করেছেন আমরাও ও ভাবের ঢের লিখেছি, কিন্তু ইতরবিশেষ আছে। ··· মোটরি জিনিসটি কী তা বলা আমার সাধ্য নয়, কিন্তু তার দামটাও নাকি পার্শ্বেই উল্লেখ করা আছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে, খুব বেশি দুর্মূল্য নয় এবং নিতান্ত অগম্য স্থান থেকেও আনতে হয় না। ··· যুবতীর মন ভারি হলে জগতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় এই বিলের প্রান্তেও তার একটা সংবাদ পাওয়া গেল। ···"

অথবা,

> "··· অনেক দূরে দূরে এক একটা ছোট ছোট গ্রাম আসছে। গুটিকতক খোড়ো ঘর, কতকগুলি চালশূন্য মাটির দেওয়াল, দুটো-একটা খড়ের স্তূপ, কুলগাছ, আমগাছ, বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়, গোটা-তিনেক ছাগল চরছে, গোটাকতক উলঙ্গ ছেলেমেয়ে; নদী পর্যন্ত একটি গড়ানে কাঁচা ঘাট, সেখানে কেউ কাপড় কাচছে, কেউ নাইছে, কেউ বাসন মাজছে, কোনো কোনো লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙুলে ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক ক'রে ধ'রে কলসী কাঁখে জমিদারবাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে, তার হাঁটুর কাছে আঁচল ধ'রে একটি সদ্যস্নাত তৈলচিক্কণ বিবস্ত্র শিশুও একদৃষ্টে বর্তমান পত্রলেখক সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্তি করছে; তীরে কতকগুলো নৌকো বাঁধা এবং একটা পরিত্যক্ত প্রাচীন জেলেডিঙি অর্ধনিমগ্ন অবস্থায় পুনরুদ্ধারের প্রতীক্ষা করছে। ···"

সব জড়িয়ে পল্লীবাংলার এই জীবন-দৃশ্য কবির মনে কেবল সাময়িক প্রভাব বিস্তার ক'রেই মিলিয়ে যায়নি। নানা রূপে নানা ছন্দে এই প্রকৃতি, এই মানুষ এসেছে তাঁর কাব্যে, তাঁর ছোটোগল্পে।

ছোটোগল্প প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলেছেন, "মনে রেখো, গল্প

ফটোগ্রাফ নয়। যা দেখেছি, যা জেনেছি তা যতক্ষণ না মরে গিয়ে ভূত হয়, একটার সঙ্গে আর-একটা মিশে গিয়ে পাঁচটায় মিলে পঞ্চত্ব পায় ততক্ষণ গল্পে তাদের স্থান হয় না।"—৭ আশ্বিন, ১৩৩৮ [ পত্রধারা। 'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩৩৯ ]

বস্তুর সঙ্গে কবিকল্পনার সংমিশ্রণেই গল্পের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প রচনার প্রধানতম কাল ব'লে পদ্মা-প্রবাস-কালকেই ধরা যেতে পারে। ১৮৯১ সাল থেকেই তিনি নিয়মিতভাবে ছোটোগল্প রচনায় হাত দেন। কাব্য-জীবনের দিক দিয়ে এই সময়টি তাঁর 'সোনার তরী' এবং 'চিত্রা'র কালও বটে। শতাধিক ছোটোগল্পের মধ্যে চুয়াল্লিশটি গল্পেরই রচনাকাল ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ সাল। অনিবার্য কারণেই তাই 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র সমকালীন কবিধর্মের প্রতিফলন ছোটোগল্পগুলিতে দেখা যায়। এবং এই ছোটো-গল্পগুলিতে তাই মানব-মানবী আর প্রকৃতি সমভাবে স্থান পেয়েছে।

> "... আমার এই সাজাদপুরের দুপুরবেলা গল্পের দুপুরবেলা। মনে আছে, ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে ব'সে আপনার মনে ভোর হয়ে পোস্টমাস্টার গল্পটা লিখছিলুম। আমিও লিখছিলুম এবং আমার চারদিকের আলো বাতাস ও তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ ক'রে দিচ্ছিল। ..."

১৮৯৫ সালেই কবির ছোটোগল্প রচনায় ছেদ পড়েনি। সে ধারা বিচ্ছিন্নভাবে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। শেষ গল্পগ্রন্থ 'গল্পসল্প'র প্রকাশকাল ১৯৪১ সাল। 'তিনসঙ্গী'র গল্পত্রয় 'রবিবার', 'শেষকথা' এবং 'ল্যাবরেটরি'র প্রথম প্রকাশকাল যথাক্রমে বাংলা ১৩৪৬ ও ১৩৪৭ সাল। ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত ভিখারিনী গল্পটিকে প্রথম ছোটোগল্প হিসাবে গ্রহণ করলে, সর্বশেষ অসমাপ্ত রচনা 'শেষ পুরস্কার' ( রচনাকাল : জুন, ১৯৪১ ) পর্যন্ত সুদীর্ঘ চৌষট্টি-বছর-ব্যাপী কালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচিত ছোটোগল্পের সংখ্যা প্রায় একশো পঁচিশের কাছাকাছি ( এই হিসাবের মধ্যে অবশ্য 'সে' গ্রন্থের ১৪টি অনুচ্ছেদকে পৃথকভাবে ধরা হ'য়েছে )। অবশ্য রীতিমতো ভাবে গল্পরচনার আদিপর্ব ১৮৯১ সাল থেকে হিসাব করাই সঙ্গত। তাহ'লেও মোট কালপরিমাণ সাতান্ন-বছর।

রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যভাণ্ডারে কবিতা, গান, নাটক ইত্যাদির প্রাচুর্যের তুলনায় ছোটোগল্পের সংখ্যা অবশ্যই বেশী নয়। বিশেষত যে শাখার রচনাকালের বিস্তার সাতান্ন-বছরের মতো। আমরা আগেই বলেছি, কবিতা বা গানের জন্যে কবির যে তাগিদ তাঁর বহু রচনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে,

ছোটোগল্পের জন্যে ঠিক ততখানি দেখা যায়নি। অথচ ছোটোগল্পকে তিনি যে অবহেলা ক'রে পাশে সরিয়ে রেখেছিলেন, তাও নয়। তাঁর গল্পরচনার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, পত্র-পত্রিকার চাহিদা যখন প্রধান হয়ে উঠেছে তখন একাদিক্রমে অনেক গল্প তিনি লিখেছেন। পত্রিকা যখন বন্ধ হয়েছে অথবা চাহিদায় ভাঁটা পড়েছে তখন তিনিও গল্প-লেখা থেকে নিবৃত্ত হ'য়েছেন। প্রথমযুগে 'ভারতী', 'নবজীবন' ও 'বালক' পত্রিকায় তিনি কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন। তারপর 'হিতবাদী' পত্রিকার জন্যে পর পর ছ'সপ্তাহে ছ'টি গল্প লেখেন। যার মধ্যে পোস্টমাস্টার, গিন্নি প্রভৃতি কয়েকটি চিরায়ত গল্প উল্লেখযোগ্য। শোনা যায়, কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হবার পর 'হিতবাদী' কর্তৃপক্ষের ধারণা হয় যে, ছোটোগল্পের তেমন চাহিদা নেই। সে খবর রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছেছিল। 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' প্রকাশিত হবার পর তিনিও 'হিতবাদী'তে লেখা পাঠানো বন্ধ করলেন। পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত একখানি পত্রে কবি লিখেছেন—

> "... সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। ... সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটোগল্প সমালোচনা ও সাহিত্য প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটোগল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ..."

'হিতবাদী' পত্রিকায় ছোটোগল্প প্রকাশ বন্ধ হবার পর আবার তিনি 'সাধনা'র জন্যে লিখতে সুরু করেন। 'সাধনা' পত্রিকার প্রয়োজন মেটাতে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত প্রতিমাসে এক বা একাধিক ছোটোগল্প তিনি লিখেছেন। ১৮৯৫ সালের পর 'সাধনা' পত্রিকা উঠে যাওয়ায় গল্পরচনার তাগিদ ছিল না। তার ফলে পরবর্তী দু'বছর কাব্য এবং কাব্যনাট্য রচনাতেই কবি মগ্ন ছিলেন। 'সাধনা'র পর আবার 'ভারতী' কাগজের প্রয়োজনে ১৮৯৮ সালে কয়েকটি গল্প লেখেন। তারপর বিভিন্ন সময়ে পত্রিকার প্রয়োজনে গল্প লিখেছেন। 'ভারতী'র পর 'বঙ্গদর্শন', 'সবুজপত্র', 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রেই তাঁর অধিকাংশ ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়েছে।

যে 'ছোটোগল্প সাহিত্য' রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যতম প্রকাশ-ক্ষেত্র, তার পেছনে স্রষ্টার অন্তরের তাগিদের চেয়েও বাইরের তাগিদটাই বড়ো ছিল, এ-কথা সর্বাংশে সত্য না হ'লেও, কার্যকারণে অনেকখানি সত্য ব'লে প্রমাণিত হচ্ছে। প্রেরণার অন্তর্নিহিত উৎস সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। বহিরঙ্গের প্রেরণা শ্রেষ্ঠ কবির কাছে কখনই মূল প্রেরণা হ'তে পারে না।

অন্তরের তাগিদ ছিল প্রকাশের। কাব্যের মধ্যে সে তাগিদ বিপুল প্রশস্ত পথ পেয়েছে। বাকী যেটুকু ছিল, তা নানা ধারায় বিভক্ত হ'য়েছে। ছোটোগল্প তেমনি একটি শাখা।

ছোটোগল্প রচনায় মাঝে মাঝে ছেদ পড়লেও, তাঁর সৃষ্টির এই শাখাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ উদাসীন ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। বরঞ্চ সেগুলির যথার্থ রসিক সমঝদার জোটেনি ব'লে তাঁর মনে হয়তো বা ক্ষোভও একটু ছিল। যথার্থ জীবনপ্রেমিকের দৃষ্টি দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের প্রবহমান জীবনধারাকে দেখেছিলেন, তার ভেতরে ডুব দিয়ে অনেক রত্ন উদ্ধার ক'রে মালার মতো সাজিয়েছেন ছোটোগল্পগুলিতে। কিন্তু তাঁর প্রতি এককালের বিরূপ সমালোচকের বক্তব্যের উত্তর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

> "... লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে, 'উনি তো ধনী ঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে রুপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।' আমি বলতে পারি আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা। অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়। যথার্থ জানায় ভালোবাসা। ... আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। ... আমার রচনাতে পল্লী-পরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধাবুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। ..." [ বাঁকুড়ার জনসভায় অভিনন্দনের উত্তরে কথিত 'কবির উত্তর' ]

আর একখানি পত্রের একটি অংশ—

> "... আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পাননি বলে নালিশ করেন তাঁদের কাছে আমার কৈফিয়ৎ দেবার সময় এলো। ... একসময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা ক'রে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশ হয়নি। ..."

ছোটোগল্পগুলিকে লিরিক-ধর্মী ব'লে অভিহিত করায় কবি অনেকবার এই ব'লে প্রতিবাদ জানিয়েছেন যে, তাঁর রচনায় বাস্তবতাই প্রথম কথা। কল্পনা বা গীতিধর্মিতার লক্ষণ তাকে গ্রাস করেনি।

"আমি একটা কথা বুঝতে পারিনে, আমার গল্পগুলিকে কেন গীতিধর্মী

বলা হয়। এগুলি নেহাৎ বাস্তব জিনিস। যা দেখেছি, তাই বলেছি। ভেবে বা কল্পনা করে আর কিছু করা যেত; কিন্তু তা তো করিনি আমি। ...”

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির স্ববিরোধী উক্তিও আছে। ‘যা দেখেছি তাই বলেছি’—এই উক্তির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটোগল্পে বাস্তবমুখীন দৃষ্টিভঙ্গির বলিষ্ঠতার উপরেই জোর দিতে চেয়েছেন। ছোটোগল্পগুলি যে তাঁর কত প্রিয় সৃষ্টি ছিল তার অতি উজ্জ্বল প্রমাণ বিধৃত হয়েছে শ্রীহিরণকুমার সান্যালকে লিখিত একখানি পত্রে।—

“আমার বয়স তখন অল্প ছিল। বাংলাদেশের পল্লীতে ঘাটে ঘাটে ভ্রমণ করে ফিরেছি। সেই আনন্দের পূর্ণতায় গল্পগুলি লেখা। চিরদিন এই গল্পগুলি আমার প্রিয় অথচ আমাদের দেশ গল্পগুলিকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করে নেয়নি, এই দুঃখ আমার মনে ছিল। এবার তোমাদের ‘পরিচয়ে’ এতদিন পরে আমি যথোচিত পুরস্কার পেয়েছি। তার মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই। পুরোপুরি সম্ভোগের কথা। এই কৃতজ্ঞতা তোমাকে না জানিয়ে পারলুম না। ... ৯ জুন, ১৯৪১”

১৩৪৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ‘পরিচয়’-এ ‘গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ’ নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যিনি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁর কাছে একটি মাত্র প্রবন্ধের এ গুরুত্ব বিস্ময়ের। কিন্তু শেষজীবনে চিরকালের অতিপ্রিয় ছোটোগল্পগুলির প্রকৃত রসগ্রাহী আলোচনার মূল্য বিশ্বকবির কাছে যাই হোক, ছোটোগল্প-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল অনেকখানি। উদ্ধৃত পত্রাংশের প্রতিটি ছত্রে কবির সেই মনোভাবটি উজ্জ্বল। ]

# রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প

## শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প সব দিক দিয়াই এক অপূর্ব সৃষ্টি—নিবিড় কাব্যানুভূতি ও গভীর মানবচরিত্রাভিজ্ঞতা, জীবনসত্য ও কলাসুষমার এক অপরূপ সমন্বয়। এই অভিনব শিল্পপ্রকরণের ভিতর দিয়া তিনি একপ্রকার অভ্রান্ত সংস্কারবশে বাঙালী-জীবনের নিগূঢ় মর্মস্থলটিতে, উহার প্রাণলীলার রসকেন্দ্রে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। বাঙালী-জীবনরস দীর্ঘকাল হইতে যে সামাজিক ও পারিবারিক আধারে সঞ্চিত হইয়াছে, যে শত-সহস্র সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হইয়া আপনাকে উপলব্ধি ও আস্বাদন করিয়াছে, অন্তরের যে মৃদু, নীরব আবর্তন ও বাহিরের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া নিজ বিশেষ রূপছন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছোটোগল্পে সেই সমগ্র মানসপ্রক্রিয়া ও পরিণতিটি আশ্চর্যভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। বাঙালীর মানসপদ্মের সব-কয়টি দল যেন এই ছোটোগল্পের শিশিরবিন্দু-সিঞ্চনে ও সৌরকিরণসম্পাতে অপূর্ব রূপে ও গন্ধে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে শুধু কেবল বাস্তব জীবনের কাহিনী নহে, বাঙালীর অন্তর-রহস্যের সবটুকু অনির্বচনীয়তা যেন পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহার কল্পলোকের স্বপ্নকল্পনা ও বাহিরের আচরণ, তাহার কর্মের অঙ্কুরোদ্‌গমের পিছনে মানস-প্রেরণার অলক্ষ্য সঞ্চরণ, তাহার বস্তুভিত্তিক জীবন ও ঊর্ধ্বতন ভাবসংস্কার—যুগপৎ এই দিব্য দর্পণে প্রতিবিম্ব ফেলিয়াছে। বহু শতাব্দীর জীবনচর্যার ফলে বঙ্গজননীর যে স্তন্য-ক্ষীরধারা তাহার বাঙালী-সন্তানকে মাধুর্যরসে পরিপ্লুত করিয়াছে, তাহার স্নেহাতিশয্যে

একদিকে পুষ্ট ও অপরদিকে কল্পনাপ্রবণ ও আত্মশক্তিতে আস্থাহীন করিয়াছে, ছোটোগল্পের ক্ষুদ্র পেয়ালায় তাহার সবটুকু বিধৃত হইয়াছে। যে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরং' মহামন্ত্রে সাঙ্কেতিকবিভাভাস্বর তাহাই রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে কোনো ভাবোচ্ছ্বাস ব্যতিরেকে, নিছক জীবন-যাত্রার পটভূমিকারূপে, মানবকাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে প্রবহমান নদী, খাল, বিল প্রভৃতি জলধারার সর্বব্যাপী অস্তিত্বে জীবনের প্রেরণাদাত্রী শক্তিরূপে প্রতিভাত। বর্ষাপ্রকৃতি তাহার সমস্ত শ্যামকজ্জল মেঘসম্ভার, স্নিগ্ধ অশ্রুসজল স্পর্শ, ব্যাকুল, উন্মনা চিত্তের অনির্দেশ্য বেদনা ও উন্মুখ প্রতীক্ষা লইয়া রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের আকাশ-বাতাসকে আবিষ্ট করিয়াছে। তাঁহার কবিতার বর্ষা অনেকটা কাব্যের সৌখীন জিনিস; মেঘমন্দ্রিত ছন্দে, শিখীর কলাপবিস্তারে, মত্ত দাদুরীর কলকোলাহলে ইহা একটি বিশিষ্ট ভাবলোকের অনুষঙ্গী। ছোটোগল্পের বর্ষা সাধারণ জীবনের অনুগামী, কাজের সহায়ক, চিন্তার সহচর, প্রাত্যহিক মনোভাবের পোষক ও আকস্মিক চিত্তোৎক্ষেপের উত্তেজক।

## দুই

বাঙলার বহিঃপ্রকৃতির রূপ ও অন্তঃপ্রকৃতির ছন্দ উভয়ই এই ছোটোগল্পগুলিতে সমভাবে উপস্থিত। বাঙলাদেশের সমাজব্যবস্থা ও পরিবার-সংস্থার সমস্ত বিচিত্র সংঘাত ও সমস্যা ইহাদিগকে আশ্চর্যরূপ জীবনরসসমৃদ্ধ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কেবল যে সাধারণ সমস্যার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা নহে। এই সমাজ ও পরিবারজীবনের বিশেষ রীতি ও সংস্কার ব্যক্তিচরিত্রকে যে বিশিষ্ট-চিহ্নাঙ্কিত করিয়াছে সেই দিকেই তাঁহার সমধিক কৌতূহল এবং এই চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সূক্ষ্ম উপলব্ধিই তাঁহার ছোটোগল্পকে সমাজ-চিত্র হইতে উচ্চতর কলাপর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। কেবল সামাজিক প্রথার সমালোচনা তাঁহার ছোটোগল্পে অপ্রধান। সমস্যাকে অতিক্রম করিয়া, সমালোচকদের সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যের সীমা ছাড়াইয়া সমাজপ্রভাবিত, সমস্যাপিষ্ট ব্যক্তির অন্তররহস্য ভেদ করার দিকেই তাঁহার লক্ষ্য। কাজেই তাঁহার সমাজসংস্কারমূলক গল্পের মধ্যে এমন একটি গভীর সুরের স্পর্শ পাওয়া যায়, যাহা অমূর্ত প্রথা-সংস্কারকে ছাড়াইয়া সজীব, সংঘাত-দোলায় আন্দোলিত মানবহৃদয়ের অসাধারণত্বের ইঙ্গিতবাহী। তাঁহার সমাজ-সমালোচনাভিত্তিক গল্পগুলি সংখ্যায় অল্প ও উৎকর্ষের দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর নহে। তাঁহার 'দেনা-পাওনা' গল্পে ( ১২৯৮ ? ) শুধু করুণ রসের ঈষৎশ্লেষাত্মক

উৎসার হইয়াছে, কিন্তু চরিত্রগুলি মাত্র উদ্দেশ্যের বাহন, তাহাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতার দ্বারা অভিভূত। রায়বাহাদুর ও তাঁহার গৃহিণী শুধু নিষ্ঠুর নির্মম, অত্যাচারী বরকর্তার প্রতিনিধি। রামসুন্দর ও নিরুপমাও উৎপীড়নের পাত্র—ইহা ছাড়া তাহাদের অন্য পরিচয় নাই। নিরুপমার স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিবাহবাসরে একবার মাত্র স্বাধীন ইচ্ছার পরিচয় দিয়া সমস্ত গল্পের মধ্যে নিষ্ক্রিয় ও যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য। এখানে সামাজিক প্রথার প্রতি কশাঘাত করা হইয়াছে, কিন্তু উভয়দিকের পাত্রপাত্রীরা ব্যক্তিপরিচয়হীন। 'ত্যাগ' গল্পে (১২৯৯) যেমন একদিকে সমাজশাসনের মূঢ় নির্মমতা ফুটিয়াছে, তেমনি অপর দিকে কুসুমের মোহভঙ্গ ও প্রেমের অসারতার বিষয়ে নৈরাশ্যক্লিষ্ট প্রত্যয় তাহাকে শুধু সমাজপ্রথার বলিরূপে না দেখাইয়া মানুষরূপেও পরিচিত করিয়াছে। প্যারীশঙ্কর ঘোষালের সপ্রতিভতা ও মৃদু ব্যঙ্গপ্রবণতা তাহাকে সামাজিক নির্যাতনের অস্ত্রের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়াছে। বিশেষত প্রকৃতি-প্রতিবেশ-রচনার কুশলতা গল্পের শিল্পোৎকর্ষ ও রসনিষ্পত্তিকে আরও উপভোগ্য করিয়াছে।

প্রায়শ্চিত্ত গল্পে (১৩০১) বিলাতফেরত ঘর-জামাই অনাথবন্ধুর চিত্র এক সুপরিচিত শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এখানেও শ্বশুরবাড়ীর সমস্ত পারিবারিক আবহাওয়া ও অনাথবন্ধু-বিন্ধ্যবাসিনীর চরিত্র ও পারস্পরিক সম্পর্ক মামুলি ঘটনাধারার গায়েও একটু নূতনত্বের রং ধরাইছে। 'বিচারক'-এ (১৩০১) কুলস্ত্রীর ধর্মনাশকারী জজ মোহিতমোহনের প্রতি লেখকের কোনো তীব্র, বিচারক-সুলভ ঘৃণা নাই। সমস্ত ব্যাপারটি প্রথম, অনভিজ্ঞা কিশোরী হেমশশীর মধুর, অথচ পরিণামে তীব্রভাবে বিড়ম্বিত, স্বপ্নকল্পনার মরীচিকায় মেদুর ও শেষে নিশ্চিন্ত-আশ্রয়চ্যুতা, শূন্যতার গহ্বরে নিক্ষিপ্তা প্রৌঢ়া বারবনিতা ক্ষীরোদার নিঃসঙ্গতার দুঃস্বপ্নে বিভীষিকাময়। লেখক এক আশ্চর্য কৌশলে এই আকাশ-পাতালের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন বিচারক ও আসামীর পরিচয় পরস্পরের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া উভয়কেই এক মধুর স্মৃতিরোমন্থনের স্নিগ্ধচ্ছায়াতলে মিলিত করিয়াছেন। 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ'-এ জামাতৃ-শিবের কল্যাণকর হস্তক্ষেপে বিবাহানুষ্ঠানের দক্ষযজ্ঞে পরিণতি প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে ও সমাজ-সমালোচনার উপলক্ষ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এরূপ শুভপরিণতি নিতান্তই ব্যতিক্রমধর্মী। 'হৈমন্তী' (১৩২১) ঘটনার দিক দিয়া 'দেনা-পাওনা'র প্রায় অনুরূপ; কিন্তু এখানে হৈমন্তীর চরিত্রের নির্মল ঔদাসীন্য, উহার প্রতিবাদহীন, নীরব সহিষ্ণুতার

তপশ্চর্যা গল্পটিকে ভাবের ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত করিয়াছে। এখানে অক্ষম, প্রতিকারে অসমর্থ স্বামীর জবানীতে গল্পটি বিবৃত হইয়াছে বলিয়াও একটু নূতন সুর লাগিয়াছে। 'অপরিচিতা' ( ১৩২১ ) প্রত্যাখ্যাত বরের অনুতপ্ত আত্মনিন্দা কল্যাণী ও উহার পিতা শম্ভুনাথের চরিত্রের দৃঢ়তা ও আদর্শনিষ্ঠাকে সমুজ্জ্বল করিতে সহায়তা করিয়াছে। বরের মামার সন্দিগ্ধচিত্ত সতর্কতা ও লজ্জাকর পরাভবের কাহিনী অম্লমধুর শ্লেষের স্পর্শে উপভোগ্য হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এইজাতীয় একাধিক গল্পে অভিভাবক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করা হইয়াছে ও সেই আক্রমণ আসিয়াছে পিতৃ-ইচ্ছায়-বাধ্য পুত্রের নিকট হইতে। 'স্ত্রীর পত্র'-এ ( ১৩২১ ) এই সমাজের প্রতি শ্লেষাত্মক আক্রমণ চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে, অথচ যে পরিবারের পুরুষেরা এই শ্লেষের লক্ষ্য তাহাদের একমাত্র দোষ তাহাদের পরিবারে বহিরাগতা বিন্দু সম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতার অভাব। এই অপরাধে স্ত্রীর স্বামিগৃহ-পরিত্যাগ ও শ্বশুরালয়ের প্রতি চোখা চোখা বাক্যপ্রয়োগ একটু মাত্রাধিক্য বলিয়াই মনে হয়। 'পাত্র ও পাত্রী' ( ১৩২৪ ) ঠিক সমাজের দোষ-উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে লেখা নয়, তবে সমাজমনের প্রতিনিধি পিতৃদেব কিছুটা পরোক্ষভাবে ব্যঙ্গবিদ্ধ হইয়াছেন। ইহার সঙ্গে এক তরুণ-তরুণীর প্রেমের কাহিনী ও গল্প-বিবৃতিকারের মহানুভবতায় উহার বিবাহে সার্থক পরিণতির কথা সংযুক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ সমাজসংস্কারক নহেন, ও সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কারকে তিনি মাঝে-মধ্যে বিদ্রূপ করিলেও তাঁহার কবিমন উদ্দেশ্যমূলক ব্যঙ্গরচনার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। ইহা তাঁহার সমাজ-পর্যবেক্ষণ ও সমাজের অন্তর্নিহিত রসানুসন্ধানের একটা গৌণ উপজাত (bye-product) মাত্র।

## তিন

সমাজমন যেখানে সমাজদেহের সহিত অব্যবহিতভাবে সংলগ্ন, যেখানে স্থূল কর্ম ও স্বার্থকুটিল চিন্তা উহার বিকৃতি ঘটায়, তাহাকে ছাড়াইয়া যে গভীরতর স্তরে ব্যক্তিত্বের উৎস ও সুখদুঃখমিশ্র রসধারার উদ্ভব, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি প্রধানতঃ সেখানেই অনুপ্রবিষ্ট। সমাজবিধি অপেক্ষা পারিবারিক ও গোষ্ঠীজীবনের প্রভাবই ব্যক্তিসত্তার উপর বেশী। সমাজের নৈর্ব্যক্তিক সুদূরতা ব্যক্তিজীবনকে লঘুভাবে স্পর্শ করে। কিন্তু পরিবারজীবনের নিবিড় পরিবেশ যেমন একদিকে ব্যক্তিত্বস্ফুরণের সহায়ক, তেমনি অপরদিকে অসংখ্য সূক্ষ্ম

বাধানিষেধ-জাল বিস্তার করিয়া ব্যক্তির মনে অহরহ বেদনাসঞ্চারের হেতু হয় ও উহার অনুভূতি-বৈশিষ্ট্যকে উদ্দীপ্ত করে। ব্যক্তিমনের উপর পরিবার-সংস্থার এই নিগূঢ় ও সর্বব্যাপী প্রভাবই রবীন্দ্রনাথের অনেক শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প-রচনার প্রেরণা ও উপাদান যোগাইয়াছে। 'রামকানাই-এর নির্বুদ্ধিতা' ( ১২৯৮ ? ) এইশ্রেণীর সর্বপ্রথম গল্প। ইহাতে সত্যকথনের দুঃসাহসে রামকানাই-এর সঙ্গে তাহার স্ত্রীপুত্রের কিরূপ মর্মান্তিক সংঘর্ষ বাধিয়াছে তাহাই বর্ণনীয় বিষয়। এখানে কোনো চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ফোটে নাই বা সংঘাতও বাহির ছাড়িয়া অন্তরে প্রবেশ করে নাই। কেবল বরদাসুন্দরীর ভাই ও তাহার পক্ষের ব্যারিস্টার কেমন করিয়া রামকানাই-এর কৃতিত্ব আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহারই কৌতুকাবহ ইঙ্গিত আছে। 'দান-প্রতিদান' গল্পে ( ১২৯৯ ) গল্পের ধারা ও পরিণতি বিচিত্রতর ও মানবিক মনস্তত্ত্ব আরও গভীরশায়ী। বাঙলাদেশের একান্নবর্তী পরিবার ভিন্ন অন্য কোনো পরিবেশে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় শশিভূষণ ও রাধামুকুন্দের সম্পর্ক-জটিলতা উদ্ভূত হইতে পারিত না। এই সম্বন্ধবৈচিত্র্যের সঙ্গে উভয় ভ্রাতার চরিত্র-পার্থক্য সংযুক্ত হইয়া যে ঘটনাজাল পাকাইয়াছে তাহা বাঙালী-জীবনধারার একটি অচিরলুপ্ত দিককে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। কিন্তু ইহার প্রধান মনস্তাত্ত্বিক মৌলিকতা শশিভূষণের ভাব-পরিবর্তনের রহস্যে নিহিত ও শশিভূষণের মৃত্যুকালীন উক্তিতেই উহার সকরুণ বেদনাটি পরিস্ফুট।

'মধ্যবর্তিনী' ( ১৩০০ ) রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। এখানে শুধু ঘটনার অপ্রত্যাশিত চমকই নাই, তাহার সঙ্গে আছে নিগূঢ়তর মানসলীলার উদ্‌ঘাটন। নিবারণের মধ্যবিত্ত, অভ্যাস-জীর্ণ মনে অসাময়িক প্রণয়রসের মাদকতা যে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা একদিকে যেমন হাস্যকর, অন্যদিকে তেমনি সাংঘাতিক। তাহার শেষ-প্রৌঢ়জীবন এক স্বপ্নসঞ্চরণের বিহ্বলতার মধ্য দিয়া চলিয়া সর্বনাশের গহ্বরমুখে আসিয়া থামিয়াছে। হরসুন্দরীর মানস-পরিবর্তনই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ; কবি ও ঔপন্যাসিকের মিলিত দৃষ্টি ভিন্ন তাহার অন্তর-রহস্যের আবিষ্কার সম্ভব হইত না। রুগ্ন দেহে এক আকস্মিক ভাবাবেগের মুহূর্তে সে যে বিরাট ত্যাগস্বীকারের সঙ্কল্প করিয়াছে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যলাভের পর পুনর্জাগ্রত দেহক্ষুধা ও স্বত্ববোধ সেই ত্যাগের মন্দিরদ্বারে নিষ্ফল ক্ষোভে মাথা কুটিয়া মরিয়াছে। নবপরিণীতা দ্বিতীয়া স্ত্রীর সহিত নিবারণের প্রণয়কলানুশীলন তাহার সাংসারিক-তুচ্ছতা-বিড়ম্বিত মনে বঞ্চনার বেদনা, প্রেমের অলভ্য অমৃতপিপাসা জাগাইয়াছে। শৈলবালা

রূপকথা-রাজ্যের অধিবাসিনী, কিন্তু তাহার অবুঝ নিষ্ক্রিয়তার ফলেই সংসারে যে ঘোরতর বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অতিমাত্রায় বাস্তব। ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে চরিত্রের নব নব বিকাশ গল্পটির মধ্যে একটি অনবদ্য কলাকৌশলের সামঞ্জস্য রচনা করিয়াছে। 'শাস্তি' গল্পটিতে ( ১৩০০ ) নিম্নশ্রেণীর পরিবারের একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, অথচ অপ্রতিবিধেয় ট্র্যাজেডি বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী-সমাজের সর্বস্তরের সহিত পরিচিত ছিলেন না, এই গল্পটি সেই ভ্রান্ত ধারণার সম্পূর্ণ নিরসন করিবে। ছিদাম ও দুখিরাম ও তাহাদের স্ত্রীরা কেবল যে মজুর-শ্রেণীর প্রতিনিধি তাহা নয়, উহাদের প্রত্যেকেরই একটি স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে। দুর্ঘটনাটি একমুহূর্তের অন্ধ রোষোচ্ছ্বাসে ঘটিয়া গেল, কিন্তু গল্পের আসল রস হইল ইহার চরিত্রবৈশিষ্ট্যের অনুযায়ী বিভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়া। দুখিরাম আঘাত করিয়াই নির্বাক ও হতবুদ্ধি ; খুন চাপা দিবার সমস্ত কৌশল ছিদামের। কিন্তু খুনের ছোটোখাটো ট্র্যাজেডি মর্মান্তিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে চন্দরার দারুণ অভিমানপ্রসূত আত্মবলিদানে। সে নিজের গলায় নিজে ফাঁসি পরাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বাহিরের আকস্মিক ঘটনাকে চরিত্রের অনিবার্য প্রতিরূপে পরিবর্তিত করিয়াছে।

'সমাপ্তি' ( ১৩০০ ) রবীন্দ্রনাথের পরিবার-জীবন-বিষয়ক আর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। বিবাহের পর প্রেমের যাদুস্পর্শে দুর্দান্তপ্রকৃতি, পরুষস্বভাবা বালিকার প্রেয়সী তরুণীতে পরিবর্তন নারীমনস্তত্ত্বের একটা অতিপরিচিত সত্য। বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবির বয়ঃসন্ধিবিষয়ক পদে এই মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরেরই কাব্য-সুষমাময় বর্ণনা আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই মামুলি বিষয়েও নিজ প্রতিভার মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। মৃন্ময়ী দুরন্ত, ক্রীড়াচপল, পুরুষঘেঁষা বালিকা। অপূর্বের সঙ্গে তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় একদিকে ব্যঙ্গের উতরোল হাসি, অপরদিকে পদমর্যাদাহানির লজ্জার ভিতর দিয়া। অপূর্বের প্রতি তাহার এই বিরূপতা বিবাহের পর পর্যন্তও অবিচলিত ছিল। অপূর্বের সমস্ত মনোরঞ্জন-প্রয়াস এই ঔদাসীন্যের বর্মে ঠেকিয়া প্রতিহত হইয়াছিল। এমনকি এই নবলব্ধ সঙ্গীটির সহিত তুলনায় তাহার বাল্যখেলার সাথী রাখালও অধিকতর প্রার্থনীয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ মৃন্ময়ীর মানস-পরিবর্তনটির বিলম্ব দেখাইয়া ইহাকে বাস্তবানুগ করিয়াছেন। তাহার পিতার কর্মস্থান স্টীমার-স্টেশনের একত্র বাস ও অনুকূল পরিস্থিতিও তাহার ঔদাসীন্যের গায়ে আঁচড় কাটিতে পারে নাই। মৃন্ময়ী অপূর্বকে অন্ন পরিবেশন করিয়াছে। কিন্তু প্রেম পরিবেশন করে নাই।

বোধ হয় এই যাত্রায় পিতার প্রতি ভালবাসারূপ বড় গাছটির তলে প্রণয়ের ক্ষুদ্র বীজটি অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ পায় নাই। তাহার কলিকাতা যাইতে অসম্মতি, বিদায়ক্ষণে চুম্বন-প্রতিদানে অক্ষমতা ও ইহার করুণ, ভাবঘন প্রতিবেশকে অসাময়িক হাসির উচ্ছ্বাসে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেওয়া তাহার অবিকশিত নারী-প্রকৃতির সাক্ষ্য বহন করে।

কিন্তু অপূর্বের সহিত বিচ্ছেদ একমুহূর্তেই এই পরিবর্তনটিকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল। অপূর্বের উপস্থিতি যাহা পারে নাই, তাহার বিরহ তাহা অবিলম্বে সিদ্ধ করিল। মৃন্ময়ীর অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ হৃদয়ে প্রেমের আকস্মিক আবির্ভাব ও উহার সমগ্রসত্তাব্যাপী প্রসার লেখক অতি চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাহার কুমারীজীবনের সহিত প্রণয়োত্তর-জীবনের ব্যবচ্ছেদরেখাটির সুস্পষ্ট নির্দেশে ও এই দ্রুত-পরিবর্তনের কারণ-নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। স্বামীর নিকট অনুতাপপ্রকাশ ও নবস্ফুট প্রণয়-কলিকার সৌরভ-বার্তাপ্রেরণে তাহার অপটু, ব্যর্থ চেষ্টা তাহার মনোরাজ্য-বিপ্লবের ইঙ্গিত দেয়। লেখক এখানে মন্তব্য করিয়াছেন যে বৃহৎ প্রকৃতিই বৃহৎ পরিবর্তনের শক্তিসম্পন্ন। এই মন্তব্যের দ্বারাই তিনি মৃন্ময়ী-চরিত্রের অসাধারণত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অর্ধ-সমাপ্ত চুম্বনক্রিয়াকে সমাপ্ত করিয়াই এই নবোদ্ভিন্নপ্রণয়ার প্রেমরাজ্যে প্রবেশ সম্পন্ন হইল। মৃন্ময়ীর চরিত্রের বলিষ্ঠতা, নূতন আবির্ভাবকে বরণ করিতে তাহার অসঙ্কোচ-অগ্রগতি, অতীত জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ অতিক্রমণ—ইহাই সাধারণ বাধাবিড়ম্বিত প্রণয়োন্মেষকাহিনীর সঙ্গে ব্যক্তিত্ব-মহিমা যুক্ত করিয়া ইহাকে নূতন অর্থগৌরব মণ্ডিত করিয়াছে।

'দিদি' ( ১৩০১ ) রবীন্দ্রনাথের আর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। ছোটো ভাইকে রক্ষা করিতে গিয়া স্ত্রী স্বামীর সহিত যে সাংঘাতিক সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছে তাহা বাঙালী পরিবার-জীবনের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ সংঘর্ষ একদিনে ঘনীভূত হয় নাই। শশিমুখীর পতিপ্রেম ও জয়গোপালের আটপৌরে ভালবাসা কেমন করিয়া অনিবার্য ঘটনার চাপে বদ্ধমূল বৈরিতার রূপ গ্রহণ করিল তাহাই গল্পের মধ্যে দেখান হইয়াছে। শশির দিকে কোনো আক্রমণাত্মক মনোভাব ছিল না, নিতান্ত ভ্রাতৃস্নেহের প্রবল আকর্ষণে সে স্বামীর ষড়যন্ত্র প্রতিহত করিতে দাঁড়াইয়াছে। সে যখন স্বামীর নবজাগ্রত প্রেমের সমস্ত আকৃতি দিয়া আপনার করিতে চাহিয়াছে তখনই অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাসে তাহাকে স্বামীর বিরোধিতা করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একটি গভীরার্থক

সংক্ষিপ্ত উক্তিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মূল প্রেরণাটি পরিস্ফুট করিয়াছেন— স্ত্রীলোকের মুখ্য পরিবর্তন আসে প্রেমে আর পুরুষের আসে দুশ্চেষ্টায়। এই দাম্পত্য কলহ মোটেই প্রবাদোক্ত বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার পর্যায়ভুক্ত নহে।

'দৃষ্টিদান' ( ১৩০৫ ) রবীন্দ্রনাথের পরিপক্ব শক্তির অপূর্ব সৃষ্টি। কোমলস্বভাবা পতিপ্রাণা নারীর অন্তরলোকে কবির প্রবেশ আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাশক্তির পরিচয় বহন করে। অন্ধ স্ত্রীলোকের পূর্বস্মৃতিমন্থনের দ্বারা যে-সমস্ত সূক্ষ্ম ও সুকুমার অনুভূতির উদ্বোধন ঘটে তাহাই তাহার আলোকবর্জিত, দৃশ্যরূপবঞ্চিত মানসলোকের একমাত্র পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব কল্পনাবলে এই স্মৃতি ও গন্ধসর্বস্ব জগতের পুনর্গঠন করিয়াছেন। সহিষ্ণুতায়, ক্ষমায়, ক্ষোভে, রোষে, প্রতি ভাবের বিকাশে, প্রতিটি ঘটনার উপর মন্তব্যে রমণীচিত্তের মাধুর্য পূর্ণ সুষমায় প্রকাশিত। গল্পটি যেন ভাবসংহতির দিক দিয়া গীতিকবিতার অন্তঃসঙ্গতিবিশিষ্ট। 'পণরক্ষা' ( ১৩১৮ ) গল্পহিসাবে খুব উৎকৃষ্ট নয়—ইহা দ্বিকেন্দ্রিক। রসিকের সঙ্গে বংশীর সম্পর্ক অপেক্ষা রসিকের আত্মকেন্দ্রিকতা ও খেয়ালি মনোভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সৌরভীর সহিত তাহার কৈশোর-প্রণয়-মধুর সম্বন্ধটিও বংশীর স্নেহস্মৃতিবিজড়িত হইলেও একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। পরিবারের সহিত ব্যক্তির সংঘর্ষের সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত 'হালদার গোষ্ঠী'-তে ( ১৩১৮ ) উদাহৃত। কোনো অভিজাত পরিবারে প্রথা যখন এমন দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয় যে, ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাকে কঠোরভাবে অবদমিত করে, তখনই ব্যক্তিসত্তার ব্যথার দীর্ঘশ্বাস করুণতম হইয়া উঠে। বনোয়ারীর সঙ্গে হালদার-গোষ্ঠীর সংঘর্ষ শুধু বৈষয়িক স্বার্থে সীমাবদ্ধ নহে ; ইহা এক জীবননীতির বিরুদ্ধে বিপরীত এক জীবননীতির আপোষহীন সংগ্রাম। এই জীবননীতির মানদণ্ডে বাড়ীর বড় ছেলে ও ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর অপেক্ষা বাড়ীর সামান্য কর্মচারীর মূল্য বেশী, কেননা এই কর্মচারী নির্বিচার প্রভুভক্তির প্রতীক ও বে-পরোয়া বংশমর্যাদারক্ষার তীক্ষ্ণতম অস্ত্র। সামন্ততন্ত্রের গোষ্ঠীগত নীতিবোধ কোনও কোনও পরিবারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উন্মেষের পরেও অত্যন্ত প্রবল ছিল ও ব্যক্তিগত ভাববিলাসকে কোনোই আমল দিত না। এই সাধারণ সামাজিক সত্যকে রবীন্দ্রনাথ দাম্পত্য ভাববৈপরীত্যের রূপ দিয়া ইহাকে এক চরম অসঙ্গতির পরিণতি দিয়াছেন। কিরণ ও বনোয়ারীর জীবন-দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কোনো প্রকাশ্য সংঘর্ষে উদ্দীপ্ত না হইয়াও এক জীবনব্যাপী অ-সহযোগের মৃদুতর শিখায় ধিকিধিকি জ্বলিয়াছে ও বনোয়ারীর নীরব, অথচ

দুঃসহ মনোবেদনাকে জাগ্রত রাখিয়াছে। 'পয়লা নম্বর'-এ ( ১৩২৪ ) রবীন্দ্রনাথের মননাধিক্য গল্পের স্বভাব-সুষমা ও সাধারণ জীবনের সহিত সঙ্গতিকে কিছুটা ক্ষুন্ন করিয়াছে। অদ্বৈত বাঙলা-সমাজে নবাগত ব্যক্তি; সে পাশ্চাত্য গ্রন্থকীট পণ্ডিতের অনুসরণে জ্ঞানানুশীলনের আতিশয্যে স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহকে প্রায় উৎসাদিত করিয়াছে। এইজাতীয় বুদ্ধিসর্বস্ব ব্যক্তি কোনো ঐতিহ্যসূত্রে বাঙলা-সমাজমনের সহিত সম্পর্কিত নহে ও আমাদের অন্তঃকরণে কোনো সুদীর্ঘরোমন্থনপ্রসূত ভাবরসের উদ্রেক করে না। অনিলাও আর একটি অসাধারণ ব্যতিক্রম ও প্রতিনায়ক সিতাংশুমৌলিও ঠিক প্রতিনিধিস্থানীয় মানুষ নহে। এই তিনটি অসাধারণ চরিত্রের সমাবেশ ও লেখকের দ্বারা ইহাদের মনোলোকের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ আমাদিগকে যে পরিমাণে চমৎকৃত করে সে পরিমাণে রসনিবিড়তায় তৃপ্ত করিতে পারে না। এইজাতীয় উৎকেন্দ্রিক ও বন্ধনহীন চরিত্র বাঙলা-সমাজে ও সেখান হইতে উপন্যাস ও ছোটোগল্পে আবির্ভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে; ইহারা ভাবী কালের অগ্রদূত কিন্তু বর্তমান কালের সর্বাঙ্গীণ রুচিকরতা হইতে বঞ্চিত।

'নষ্টনীড়' ( ১৩০৮ ), 'কর্মফল' ( ১৩১০ ) ও 'শেষের রাত্রি' ( ১৩২১ )—এই তিনটি গল্প ব্যক্তিজীবনের উপর পরিবার-প্রভাবের বিভিন্ন দিক লইয়া লেখা। পরিবার-জীবনে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে অবৈধ প্রেমের উন্মেষ, অতি-প্রশ্রয় ও অত্যধিক নিঃস্নেহ আচরণের পর্যায়ক্রমিক প্রয়োগের ফলে তরুণচিত্তের উদ্‌ভ্রান্তি, ও পরলোকযাত্রী রোগীর নিকট তরুণী পত্নীর উদাসীন, মমতাহীন মনোভাবকে গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে মাসীর করুণ প্রবঞ্চনাময় কৌশলজাল-বিস্তার এই গল্পগুলির বর্ণনীয় বস্তু। প্রত্যেকটি গল্পে রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণনৈপুণ্য, ঘটনাগ্রন্থনের নিখুঁত পারিপাট্য ও জীবনসত্যের বিস্ময়াবহ উদ্‌ঘাটন তাঁহার অপূর্ব মানবচরিত্রাভিজ্ঞতা ও শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। 'নষ্টনীড়' শরৎচন্দ্রকে প্রভাবিত করিয়া আধুনিক উপন্যাসের একটি নূতন দিক উন্মোচন করিয়াছে। 'কর্মফল'-এ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ও ভাগ্যের আকস্মিক পরিবর্তন চমক সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু ইহার জীবনপর্যালোচনা খুব গভীর নহে। 'শেষের রাত্রি' রোগীর উত্তপ্ত মনোবিকার, অসুস্থ আত্মকেন্দ্রিকতা ও রুগ্ন কল্পনাতিশয্যের বদ্ধ আবহাওয়ায় শ্বাসরোধী—রুদ্ধদ্বার রোগকক্ষের নিখুঁত মানস-প্রতিরূপ। অদৃশ্য, অন্তরালবর্তিনী মণির মোহময় প্রভাব যেন সমস্ত গল্পের আকাশ-বাতাসে পরিব্যাপ্ত।

## চার

সমাজ ও পরিবার বহির্ভূত উদারতর মানবিক সম্পর্কের বিচিত্র রহস্য রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে মনোজ্ঞভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে ( ১২৯৮ ? ) সমাজ-বন্ধনের অস্বীকৃত স্নেহসম্পর্ক একটি করুণ বেদনাময় পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙলা-সমাজে পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই প্রায় সমুদয় সুকোমল মানবিক বৃত্তি বিকাশের একমাত্র ক্ষেত্র পায় বলিয়াই যেন পারিবারিক সনন্দের অনধিকারী মায়া-মমতা একটি ভীরু, শঙ্কিত আবেদন লইয়াই দেখা দেয়। ইহাদের বন্ধন-অসহিষ্ণু ক্ষণিকতাই ইহাদিগকে এত আকর্ষণীয় করে। 'ব্যবধান'-এ ( ১২৯৮ ? ) একটা দূর আত্মীয়তার অস্তিত্বই বনমালী-হিমাংশুমালীর বৈষয়িক বিরোধজাত ব্যবধানকে আরও মর্মান্তিক করিয়াছে—ভাঙা খাঁচা হইতে স্নেহপাখী পলাইয়াছে, এবং একপক্ষের ভালবাসা কেবল সেই ভগ্ন আশ্রয়স্থলের চারিদিকে ঘুরিয়া মরিয়াছে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এ ঘটনা-সন্নিবেশে খানিকটা অবিশ্বাস্যতা রহিয়াছে—পদ্মাকবলিত অনুকূলের পুত্র যে রাইচরণের সন্তানরূপে পুনরাবির্ভূত হইবে ও উভয়পক্ষের স্বীকৃতি লাভ করিবে ইহা একমাত্র মানসভ্রান্তি ও স্নেহাতিশয্যের অন্ধতায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের সম্ভাব্যতাবোধ ইহাতে সায় দিবে না। রাইচরণের মনোবিকারই সমস্ত ঘটনার মূল ; তাহার ভ্রান্ত সংস্কার তাহার চরিত্র হইতে প্রসূত ইহা প্রতিষ্ঠিত না হইলে গল্পটি অসম্ভব কল্পনাবিলাসের পর্যায়ে পড়ে। রাইচরণের প্রভুভক্তির আতিশয্য এরূপ অবাস্তব প্রত্যয়ের সঙ্গত কারণ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

'কাবুলিওয়ালা' ( ১২৯৯ ) রবীন্দ্রনাথের একটি অতি প্রসিদ্ধ গল্প। এখানে রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি জাতীয়তার সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবতাবোধে প্রসারিত হইয়াছে। পিতৃত্বের সাধারণ দুহিতাস্নেহ দুই ভিন্নজাতীয় ও বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে একটি একাত্মতার সৃষ্টি করিয়াছে। এই মূলরসের চারিদিকে ও উহাকে ঘনীভূত করিবার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি সঞ্চারী রস অতি নিপুণতার সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মিনির কৌতুকাবহ প্রগল্‌ভতা, রহমতের সরল হঠকারী মনে এই বালস্বভাবের প্রতিফলন লেখকের উদার, অথচ সংসার-সঙ্কীর্ণতার দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে সীমায়িত মনের প্রকাশ, অন্তরালবর্তিনী গৃহিণীর

অদৃশ্য আপত্তি ও প্রতিবাদ, শরতের সোনার রৌদ্রে বিগলিত আসন্ন বিচ্ছেদ-ব্যথার ভাবার্দ্রতা ও করুণ সাহানা রাগিণীর গীতমূর্ছনা—এই সমস্ত মিলিয়া যে প্রতিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে, কাবুলিওয়ালার রসনিষ্পত্তি তাহারই যৌগিক অভিব্যক্তি। অনতিস্ফুট, কিন্তু আভাসিত ব্যক্তিত্বের আধারে ধৃত বলিয়াই এই রস নিবিড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। 'ছুটি' গল্পটি আত্মীয়-পরিবারের মমতা-হীনতা ও কিশোর বালকের স্নেহের জন্য ব্যাকুলতার মর্মন্তুদ কাহিনী। কিন্তু ইহার আসল রসকেন্দ্র হইল প্রাপ্তকৈশোর বালকের মনোবিশ্লেষণ ও পরিবার-জীবনে উহার খাপছাড়া, বেমানান সত্তাস্ফীতির বর্ণনা। এই সত্তার মাত্রাতিরিক্ত বিস্তারের জন্যই ফটিকের মাতুলালয়ে বাস এত ক্লেশকর হইয়াছিল; তাহার উপর কলিকাতার শ্বাসরোধী সংকীর্ণতার সহিত পল্লীগ্রামের মুক্ত জীবনাবেগের বৈপরীত্য তাহার অবস্থার অসহনীয়তা বাড়াইয়াছে।

'অনধিকার প্রবেশ'-এ ( ১৩০১ ) গল্পাংশ অতি সামান্য—ব্রাহ্মণ বিধবা ও মন্দিরের অধিকারিণী জয়দুর্গার আচার-বিচারে অতি-সতর্ক, সঙ্কল্পে দৃঢ় ও ন্যায়পরতায় অবিচল চরিত্র-মহিমাই ইহার প্রধান আকর্ষণ। সেই কঠোরপ্রকৃতি জয়দুর্গা একদিন তাঁহার সমস্ত শুচিতার সংস্কার ভুলিয়া এক অপবিত্র শূকর-শাবককে নিজ মন্দিরে আশ্রয় দিলেন—তাঁহার অপরাধী ভ্রাতুষ্পুত্র যে প্রশ্রয় হইতে বঞ্চিত তাহা শূকরছানাকে স্নেহাঞ্চলে আবৃত করিল। ত্রুটিপূর্ণ মানব-সমাজের বিরুদ্ধে সদা-উদ্যত বিচারদণ্ড এক অবোলা পশুর রক্ষার্থ স্নেহনির্ঝরে দ্রবীভূত হইল—সংস্কারের বাধা অতিক্রম করিয়া হঠাৎ-উন্মেষিত হৃদয়াবেগ প্রাধান্যলাভ করিল। 'মেঘ ও রৌদ্র' ( ১৩০১ ) ঠিক ছোটোগল্পের পরিধির স্বল্পতা ও সুনিয়ন্ত্রিত কাল-মাত্রা রক্ষা করে নাই। ইহা অনেকটা ক্ষুদ্রাবয়ব উপন্যাসের সমধর্মী। কাহিনীটি গিরিবালা-শশিভূষণের অভিমান-অন্যমনস্কতার কৌতুকলীলার দ্বারা ঘনীভূত স্নেহ-সম্পর্কের প্রাথমিক বর্ণনার পর এই কৈশোর-নাট্যের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছে—এক বর্ষাসিক্ত, অশ্রুসজল প্রভাতে গিরিবালার শ্বশুরালয়-যাত্রার সহিত এই অধ্যায় শেষ হইয়াছে। ইহার পর গ্রাম্য সমাজ ও বিজাতীয় শাসনব্যবস্থা নিরীহ, আত্মভোলা, অথচ তীক্ষ্ণ জাতীয়তাবোধসম্পন্ন শশিভূষণের মাথার উপর বঞ্চনার নাগপাশ ও শাস্তির লৌহদণ্ড উদ্যত করিয়াছে—এই নির্যাতন-যজ্ঞে ঘরের লোকের কাপুরুষতা ও বিদেশী শাসকের উৎপীড়ন কাহার যে সমিধ-সংগ্রহ বেশী তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। গল্পের এই অংশগুলি উহার প্রাথমিক ভূমিকা হইতে অনেক দূরে সরিয়া

আসিয়াছে এবং গিরিবালা এই অংশে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মেঘ ও রৌদ্রের যুগ্ম ভূমিকার মধ্যে এখানে মেঘেরই একাধিপত্য। গল্পের একেবারে শেষের দিকে শশিভূষণের জেল হইতে মুক্তিলাভের পরে বৈধব্য-ব্রতধারিণী গিরিবালার আবার পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে। মেঘ কাটিয়া গিয়া রৌদ্র দেখা দিয়াছে, কিন্তু এই রৌদ্র বৈষ্ণব কীর্তনের সুরে এক অনির্দেশ্য বেদনায় কারুণ্যসিক্ত ও গিরিবালার শোচনীয় অবস্থান্তরের স্পর্শে বাষ্পভারাতুর ও মেঘম্লান। বালিকা গিরিবালা উদাসীন শশিভূষণের ঘরের জানালা দিয়া যে জামের আঁটিগুলি নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেগুলি শেষ পর্যন্ত অঙ্কুরিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির দাক্ষিণ্য-হীনতায় এই গাছে যে ফল ধরিয়াছে তাহার মিষ্ট অপেক্ষা কষায়েরই স্বাদাধিক্য। যে সম্পর্কের অঙ্কুর অনুকূল অবস্থায় প্রেমে পরিণত হইতে পারিত তাহা শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধাস্নেহ, উপকার-প্রত্যুপকার, আশ্রয় দান ও গ্রহণের শান্ত বিনিময়রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। গল্পটির সামগ্রিক রূপ হয়ত কিছুটা বিক্ষিপ্ত ও কেন্দ্রবিচ্যুত; কিন্তু ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী-জীবনযাত্রা ও প্রকৃতি-পরিবেশের সহিত যে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের নিদর্শন দিয়াছেন তাহাতে পরবর্তী যুগের পল্লীসমাজ-সচেতন লেখকদের সহিত তুলনায় তাঁহার প্রত্যক্ষজ্ঞানের কোনোই অভাব দেখা যায় না।

'আপদ' গল্পটি (১৩০১)—বাঙালী-সমাজের উদার আতিথেয়তার মুক্ত প্রাঙ্গণে কেমন করিয়া অনেক পরগাছা স্বচ্ছন্দে আশ্রয় পায় ও এই অনধিকার-প্রবেশের বিসদৃশতার জন্যই অনেক সমস্যা ঘনীভূত করিয়া তোলে তাহার চমৎকার দৃষ্টান্ত। এই গল্পটি মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ ও জীবনের সত্য-উদ্‌ঘাটনের দিক দিয়া অপূর্ব। যাত্রার দলের ছেলে নির্লজ্জ, শালীনতাবোধহীন ও নিজের দর বাড়াইতে অতি-উৎসুক নীলকণ্ঠ কেমন করিয়া স্নেহের যাদুদণ্ডস্পর্শে সূক্ষ্মতর রুচি ও আত্মসম্মানবোধ অর্জন করিয়াছে, কেমন করিয়া যাত্রাভিনয়ের সখী ও নর্তকীর স্ত্রীপুরুষভেদহীন মিশ্র ভূমিকা হইতে পুরুষোচিত মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছে, অভিনয়ের পরানুকৃতি হইতে প্রত্যক্ষ-জীবনোচিত স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার আস্বাদ পাইয়াছে, তাহা এই গল্পে আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। আবার সতীশের প্রতি তাহার ঈর্ষা ও সমকক্ষতার স্পর্ধা তাহার নবোন্মেষিত জীবনবোধের আর একটি আশ্চর্য, অথচ চরিত্রানুগ বিকাশ। কিরণের স্নেহ তাহাকে তাহার হীনম্মন্যতা ভুলাইয়া তাহাকে ধনী-পরিবারের আভিজাত্য-গৌরবের অধিকারবোধে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সে চুরি করিয়াছে, কিন্তু তাহা ঈর্ষার জ্বালায়, কোনো হীনতর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া নহে। নীলকণ্ঠের

পালিত অনাথ কুকুরটি যেন তাহারই আত্মপ্রতিবিম্ব, পশুজগতে তাহারই লাঞ্ছিত সত্তার প্রতিরূপ। এই কুকুরটির প্রবর্তনের একটা আশ্চর্য রূপক-সঙ্গতি আছে। আর নিঃসন্তানা, ধনী-পরিবারের বধূ কিরণের নীলকণ্ঠের প্রতি স্নেহাতিশয্য, তাহাকে সর্বপ্রকার কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিবার দৃঢ় পণ, তাহার অপরাধ-গোপনের জন্য বরাভয়-হস্ত প্রসারণ—এসমস্তই তাহার অবলম্বনহীন সন্তান-স্নেহ-বুভুক্ষার এক তির্যক, অসংবিদ্ (unconscious) প্রকাশ। তাহার সদ্যোরোগমুক্তি ও শারীরিক দুর্বলতাও এই স্নেহোচ্ছলতার পরোক্ষ ভিত্তি রচনা করিয়াছে। গল্পের মাধ্যমে এরূপ নিগূঢ় জীবনসত্যের আবিষ্কার ও কাহিনীর মধ্যে উহার সার্থক প্রয়োগ অতি বিরল কৃতিত্বের নিদর্শন।

'মাস্টার মহাশয়' ( ১৩১৪ ), পরিবারজীবনের সম্প্রসারিত পরিধির মধ্যে চরিত্রের পারস্পরিক সংঘাতে ও ঘটনার অনিবার্যতায় কেমন করিয়া অদৃষ্টের নিগূঢ় লীলা এক সাংঘাতিক পরিণতির হেতু হয়, তাহারই কাহিনী। কলিকাতার এক ধনী, অথচ রুচি ও সংস্কৃতিহীন পরিবারে এই ট্রাজেডির মূল সূত্র নিহিত। অধরবাবু, তাঁহার স্ত্রী, অভিমানী ও আত্মসংযমে অনভ্যস্ত বেণুগোপাল ও নিতান্ত নিরীহ, কুণ্ঠিত ও নিজ ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন মাস্টার হরলালের, এমনকি হরলালের অতিমাত্রায় স্নেহশীলা জননীর একক সন্নিবেশ জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রহ-নক্ষত্রাদির সমাবেশের ন্যায় নির্ভুল গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে এই শোচনীয় পরিণতি ঘটাইবে তাহা স্বতঃসিদ্ধভাবে সত্য। বেণুগোপাল ঠিক আলালের ঘরের দুলাল নহে, ভালোয়-মন্দে মেশা এক তরলমতি, হঠকারী যুবক। অধরবাবু একদা-প্রশ্রয়শীল, কিন্তু বেণুগোপালের মাতৃবিয়োগের পর কঠোরভাবে রাশ-টানা ও পুত্রের প্রতি সহানুভূতিহীন পিতা, ও অন্যান্য সকলের পক্ষে স্বার্থান্ধ, অন্যায় জেদের বশবর্তী মনিব। বেণুগোপাল ঠিক চুরি করিতে চাহে নাই; সে হরলালের নিকট অলঙ্কার গচ্ছিত রাখিয়াছিল ও মনে করিয়াছিল যে পিতা তাহার ঋণ পরিশোধ করিবেন। কিন্তু সে হরলালের নিষ্ক্রিয়, অসহায়, আত্মরক্ষায় অসমর্থ চরিত্র বোঝে নাই। কাজেই চরিত্রগুলির সামান্য একটু তারতম্যে যে অবস্থা-জটিলতার সাম্য হইতে পারিত তাহাই নিয়তির দুশ্ছেদ্য ফাঁদে পরিণত হইল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবল ঘটনার বিবৃতিকার ও মানবচরিত্রব্যাখ্যাতা নহেন; তিনি নিখিলরহস্যবেত্তা কবি। সেইজন্য তিনি হরলালের যে মানস-উদ্‌ভ্রান্তি ও উহার অতিপ্রাকৃত রহস্যময়তার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা ঘটনার রাজ্য ছাড়াইয়া অলৌকিক কল্পনার সীমা স্পর্শ

করিয়াছে। সমস্ত কলিকাতা সহরের জটিল ভৌগোলিক সংস্থার মধ্যে এক সর্বব্যাপী মাতৃমূর্তির অনুভব ও যে ঘোড়ার গাড়ীতে উত্তপ্তমস্তিষ্ক ও অপ্রকৃতিস্থ হরলাল অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল তাহার মধ্যে অনির্দেশ্য ভৌতিক রহস্যের ইঙ্গিত এই উপন্যাসসীমাতিসারী কবি-দিব্যদৃষ্টির শেষ দান।

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের মধ্যে প্রেমবিষয়ক গল্পের সংখ্যা খুব বেশী নাই। বাঙালী-জীবনযাত্রায় প্রেমের অবসর যেমন সঙ্কীর্ণ, উহার সাহিত্যিক প্রতিচ্ছবির মধ্যেও প্রেমের কাহিনীরও সেইরূপ স্বল্পতা। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা প্রেমের বন্দনাগানে বারে বারে মুখর হইয়া উঠিয়াছে; ছোটোগল্পে তাঁহার কাব্যানুভূতির প্রচুর প্রকাশ থাকিলেও ইহা মুখ্যতঃ প্রকৃতি ও অতিপ্রাকৃত বিষয়কে অবলম্বন করিয়াছে। 'একরাত্রি' গল্পে (১২৯৯) যে প্রেম নায়কের অবহেলায় ও অলীক আত্মশ্রেষ্ঠতাবোধের জন্য ব্যর্থ হইয়াছে, এক প্লাবনের প্রলয়রাত্রিতে প্রণয়াস্পদার ক্ষণিক নীরব সান্নিধ্যে তাহা আত্মগ্লানির উচ্ছ্বাসে, নিজ অন্ধতার প্রতি দারুণ শ্লেষ-কশাঘাতে উতরোল হইয়া উঠিয়াছে। 'জয়-পরাজয়' গল্পটি অতীতযুগের হিন্দু রাজসভার পটভূমিকায় সন্নিবিষ্ট। ইহার প্রধান ঘটনা কবি-যুদ্ধ; এক দাম্ভিক, দিগ্বিজয়ী, পাণ্ডিত্যপরুষ কবিযশঃস্পর্ধীর নিকট মুখচোরা, আত্মভাববিভোর, যথার্থ কবির পরাজয়স্বীকার ও মৃত্যুবরণ। কিন্তু এই সংঘাতের পিছনে আছে রাজকন্যা অপরাজিতার প্রতি পরাজিত তরুণ কবির কুণ্ঠিত, প্রকাশভীরু প্রণয়মুগ্ধতা। কবির অন্তিম মুহূর্তে রাজকন্যা এই প্রেমকে স্বীকৃতি দিয়া মৃত্যুপথযাত্রী লাঞ্ছিত কবির মাথায় জয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছেন। গল্পে রাজসভার প্রতিবেশ ও কবির কাব্যপ্রেরণার রহস্য চমৎকার রূপ পাইয়াছে ও একটি অবিমিশ্র রোমান্সের আবহাওয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। 'দালিয়া' গল্পেও ঐতিহাসিক আবেষ্টনে একটি আপাতদৃষ্টিতে অসম প্রণয়কাহিনী পল্লবিত হইয়াছে—সাহসুজার দুর্ভাগিনী, ধীবরগৃহে পালিতা কন্যা মূর্খ কৃষক-যুবকের ছদ্মবেশী আরাকান-রাজকুমারের প্রেমে পড়িয়াছে ও নিজ বংশমর্যাদা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অবজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া উহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছে। যখন সত্যপরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে তখন প্রতিশোধস্পৃহা কৌতুকরসসিক্ত প্রণয়াবেশে বিগলিত হইয়াছে।

'দুরাশা' (১৩০৫) রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার অপূর্ব সৃষ্টি। বদ্রাওনের

নবাবপুত্রী আধুনিক ইংরেজের শৈল-রাজধানী কুয়াশা-ঢাকা দার্জিলিং সহরের নির্জন পথপ্রান্তে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত সাহেবী মেজাজের বাঙালী-বাবুর নিকট তাহার আজীবন প্রণয়-সাধনা ও উহার উপহাস্য পরিণতির গোপন হৃদয়বেদনাটি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। পরিবেশ, কুশীলব, হৃদয়রহস্য-উন্মোচনের প্রেরণা, গল্পের আরম্ভ ও উপসংহার—সবই যেন কুয়াশার মতো অবাস্তব, অথচ অনুভূতির নিবিড়তা ও প্রকাশরীতির যাথার্থ্য ও আবেগময়তার জন্য তাহা প্রত্যয়ের দৃঢ় রেখায় হৃদয়পটে উৎকীর্ণ। আচার-আচরণের অভ্যস্ত সংস্কার ও প্রকৃত ধর্মবোধ যে এক নয় তাহা কেশরলালের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার বিসর্জন দিয়া ভুটিয়া রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণের মধ্যে হাস্যকরভাবে প্রকাশিত, কিন্তু উহা হিন্দুধর্মসাধনার ব্রতধারিণী নবাবনন্দিনীর পক্ষে মর্মান্তিক বিড়ম্বনার কারণ হইয়াছে। গল্পটি বাস্তব জীবনসমস্যার মধ্যে রোমান্টিক আদর্শকল্পনার সার্থক অনুপ্রবেশের চমৎকার দৃষ্টান্ত। 'অধ্যাপক' (১৩০৫) গল্পে কলেজের ছাত্র ও আপনার বৈদগ্ধ্য-গৌরবে আত্মশ্লাঘাস্ফীত মহীনের সমালোচনায় সূচবিদ্ধ হইয়া চুপসাইয়া যাওয়ার হাস্যকর কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রেমের মাদকতায় তাহার সমস্ত চেতনা যে ইন্দ্রধনুবর্ণরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতির বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্যের সহিত প্রণয়াস্পদার নারীরূপের সাধর্ম্য যে তাহার নিকট স্বতঃ-উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহাতে অন্ততঃ তাহার কাঁচা মননের মধ্যে কবিধর্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে যেমন একদিকে তরুণ প্রেমের আত্মজ্ঞান ও মাত্রাবোধের অভাব পরিস্ফুট, তেমনি অপরদিকে উহার অসামান্য অনুভূতি-গৌরবও প্রকটিত। আবার একই ব্যক্তি তাহার সাহিত্যিক খ্যাতি ও প্রণয়োন্মেষের আকাশে ধূমকেতুরূপে উদিত হইয়া তাহার জীবনের এই দুইটি দিককে একই ব্যর্থতার সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। কিরণবালা যেরূপ লঘু, অথচ সহৃদয় কৌতুকপ্রিয়তার সহিত মহীনের বুদ্ধির অহঙ্কার ও প্রেমনিবেদনের প্রতিরোধ করিয়াছে, যেরূপ তুচ্ছ গার্হস্থ্য ফাই-ফরমাস খাটাইয়া তাহাকে ভাবের উচ্চলোক হইতে সাংসারিকতার নিম্নভূমিতে অবতরণ করাইয়াছে তাহাতে একটি চমৎকার কলাকৌশলের পরিচয় মিলিয়াছে।

ছয়

মানবমনের সহিত প্রকৃতির নিগূঢ় আত্মীয়তাবোধ রবীন্দ্র-কাব্যের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই অনুভূতিটি কাব্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ছোটোগল্পের

বাস্তবতাপ্রধান আবহাওয়ার মধ্যে স্বচ্ছন্দে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনেকগুলি ছোটোগল্পে অত্যন্ত সহজে ও সাবলীলভাবে প্রকৃতি-প্রতিবেশ ও তৎ-সংশ্লিষ্ট মানবজীবনের মধ্যে এই রহস্যময় অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনকে মহিমান্বিত ও ব্যঞ্জনাগভীর রূপে দেখাইয়াছেন। 'সুভা' (১২৯৯) তাহার মূক, মূঢ় জীবনাকৃতি লইয়া যেন আত্মবিস্মৃত ও প্রকাশ-কুণ্ঠিত বহিঃপ্রকৃতির রাজ্য হইতে মানবজীবনের অভিব্যক্তিময় মুখরতার মধ্যে অতর্কিতভাবে প্রবেশ করিয়াছে। বাক্‌শক্তিহীন, আভাসে-ইঙ্গিতে মনোভাব-প্রকাশের প্রয়াসে উদ্‌ভ্রান্ত মানবী যেন প্রকৃতিরই সহোদরা, প্রাকৃতিক অব্যক্ত প্রাণলীলার সঙ্গে একই ছন্দে গাঁথা। অথচ তাহার মানবিক ও গার্হস্থ্য জীবন এমন সুনির্বাচিত তথ্য ও মনস্তত্ত্বসম্মত ভাবসঙ্গতির সহিত বর্ণিত হইয়াছে যে, সে অশরীরী কবিকল্পনা না হইয়া রক্তমাংসের মানুষ হইয়াছে ও সাংসারিক মানুষের জীবন-জটিলতার মধ্যে মোটেই বেমানান হয় নাই। যে কথা বলিতে পারে না, সে ভাবগোপনতার একটা উপায় হইতে বঞ্চিত; তাহার পরিবর্তনশীল ভাবসমূহ প্রত্যক্ষভাবে তাহার মুখে প্রতিবিম্বিত হয়। সেই দিক দিয়া সুভার মনোগহনের বার্তা আমাদের নিকট আরও সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয়। 'শুভদৃষ্টি' গল্পে (১৩০৭) আর একটি মূক বালিকা গৃহপালিত পশুপক্ষীর প্রতি অত্যন্ত মায়া দেখাইয়া তাহার স্বভাবকোমলতার পরিচয় দিয়াছে। এই বোবা মেয়েটি কিন্তু অতিমাত্রায় চঞ্চল ও বন্যজন্তুর ন্যায় বোধহীন। সে সুভার ন্যায় প্রকৃতির রহস্যলোকে প্রবেশ করে নাই; প্রকৃতির সহজ মহিমা তাহার মধ্যে স্ফুরিত হয় নাই। ইহাকে কেবল অপূর্ণ মানুষরূপেই দেখান হইয়াছে, আদর্শায়িত করিবার কোনো আয়োজন নাই। ১৩৩৫ সালে রবীন্দ্রজীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে লেখা 'বলাই' গল্পটিতে এই প্রকৃতি ও মানুষের অন্তরঙ্গতা একটি মাতৃহীন বালকের বাস্তব স্বভাবের বৈশিষ্ট্য রূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে; ইহাকে কবিত্বময়, সুকুমার ভাব-পরিমণ্ডলে স্থান দেওয়া হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যযুগ অতিক্রান্ত হইলেও তিনি যে তত্ত্ব হিসাবে এই ভাবটিকে আঁকড়াইয়া ছিলেন, সমাপ্তি-পর্যায়ে লেখা এই গল্পটি তাহারই প্রমাণ।

প্রকৃতিবিষয়ক গল্পগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'অতিথি' (১৩০২)। বহিঃপ্রকৃতি সব সময় যে মানবমনকে সূক্ষ্ম ভাবপ্রবণতা ও উন্নত আদর্শকল্পনার দিকে আকর্ষণ করে তাহা ঠিক নয়। সম্পূর্ণ সামাজিক ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট মানুষও কেবল উদার নির্লিপ্ততা ও সার্বভৌম সহানুভূতির

লক্ষণ-চিহ্নিত হইয়া প্রকৃতির নিরাসক্ত ও সদাচলমান প্রাণলীলার আধার হইতে পারে। তারাপদ শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনের অভিজ্ঞতার দিক দিয়া অতি সাধারণ পর্যায়ের—যে-কোনো ভবঘুরে, লক্ষ্যহীন ছেলের দলে তাহাকে ফেলা যায়। সে যাত্রা-পাঁচালির ও সার্কাসের দলে, উহার সমস্ত ইতরতা ও কুরুচির সংস্পর্শে তাহার বাল্যজীবন কাটাইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি তাহাকে যে সহজ পবিত্রতার বর্মে আচ্ছাদন করিয়া জীবনলীলায় যোগ দিতে আহ্বান করিয়াছে তাহা তাহাকে সমস্ত কলুষ-কলঙ্ক হইতে মুক্ত রাখিয়াছে। মানুষের নীতির শাসন ও অভ্যস্ত কর্মের বন্ধন না মানিয়াও যে মুক্ত নির্মল আত্মার শুভ্র জ্যোতি অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, তারাপদ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারাপদর মধ্যে কবিত্বের বাষ্প কোথায়ও নাই। সে শকুন্তলার মতো তপোবনলালিত, মিরাণ্ডার মতো নির্জন-দ্বীপচারী বা কাদম্বরীর মতো প্রেমের রোমান্স-লোকের অধিবাসী নয়, অথচ এসকলেরই কিছু-না-কিছু উপাদান তাহার মধ্যে বর্তমান। সে মানুষের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার নিয়মিত কক্ষাবর্তনে আবদ্ধ নয়, প্রতি মুহূর্তেই তাহার কাছে নূতন অগ্রগতির আহ্বান আনে। প্রকৃতির যে মুক্ত জীবনপ্রবাহ কোনো পিছনের বন্ধন স্বীকার না করিয়া, কোনো অভ্যাস-রোমন্থনের পুনরাবৃত্তিতে স্তব্ধ না হইয়া কেবল সম্মুখের দিকে, অজ্ঞাতের পানে ছুটিয়া চলে তারাপদ যেন তাহারই মানব-প্রতিরূপ। সাধারণ মানুষের গণ্ডীনিবদ্ধ, পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব বৃহত্তর পরিধি হইতে সঙ্কুচিত হইয়া আপনাকে স্বল্পপরিমিত স্থানে ঘন করিয়া তোলে; বহুর সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইয়া কয়েকটির সহিত নিবিড় আশ্লেষে আপনাকে বন্দী করে। তারাপদ কোথায়ও বাধা পড়ে নাই বলিয়া সকলকেই নিজ আত্মীয় করিয়া লইয়াছে—তাহার প্রবহমান জীবনধারা কোনো সরোবরের গভীরতায় সঞ্চিত হয় নাই বলিয়াই অবাধগতি নদীর বিস্তারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চারুর সহিত ঈর্ষানিবিড়, অভিমানমধুর, বিশেষ দাবীতে অস্বস্তিকর সম্বন্ধের আভাস তাহার উদাসীন মনে প্রথম মুগ্ধতার বর্ণালিম্পন আঁকিয়াছে। কিন্তু ঠিক সেই পরিবর্তন-মুহূর্তে বর্ষাতরঙ্গিণীর প্রথম গৈরিকজলোচ্ছ্বাস ও দুরন্ত গতিবেগ চারুর স্মৃতিমোহ মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে অজ্ঞাতের দিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। প্রকৃতি প্রেয়সী মানবকিশোরীর আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া ভাবী গৃহস্থকে আবার পথে বাহির করিয়াছে। প্রকৃতি আর কোথাও এমন আটপৌরে বেশে, এমন সম্পূর্ণ সূক্ষ্মব্যঞ্জনাহীন রূপে মানব-সংসারের ক্লেদাক্ত পথে এরূপ স্বচ্ছন্দবিচরণ করে নাই।

প্রকৃতির অপর পিঠ, উহার অন্ধকার, রহস্যময় দিক হইতেছে অতিপ্রাকৃত। প্রকৃতির যে প্রাণশক্তি নিগূঢ়, অলক্ষিত উপায়ে মানবচিত্তে সংক্রামিত হয়, তাহাই কখনও কখনও অত্যুগ্র হইয়া মানবচেতনাকে ভয়চকিত, আচ্ছন্ন-অভিভূত করে। ধীরছন্দে প্রবাহিত তরঙ্গ বিশেষ উত্তেজনার মুহূর্তে তীর-সীমা অতিক্রম করিয়া মানবমনের সন্নিহিত তটভূমিকে প্লাবিত করে। বাঙালী-জাতির মধ্যে এই অতিপ্রাকৃত চেতনা সাধারণতঃ দুই রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এক হইল, পারলৌকিক বিশ্বাস হইতে উদ্ভূত কতকগুলি অপ্রাকৃত সংস্কার-বিশ্বাস উহার মনে বদ্ধমূল আছে। দৈবকৃপায় গুপ্তধনপ্রাপ্তি, যখের ধন আগ্‌লান, জ্যোতিষ-গণনার অভ্রান্ততা, সন্ন্যাসগ্রহণ ও কৃচ্ছ্রসাধন, অলৌকিক শক্তিবিভূতির অধিকার প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের বাল্যে ও প্রথম যৌবনে এই সংস্কারগুলি সজীব ও সক্রিয় ছিল ও বাঙালী-সমাজের কর্ম ও চিন্তাকে বহু-পরিমাণে প্রভাবিত করিত। তাঁহার কয়েকটি গল্পে বাঙালী-মনের প্রান্তসীমাসংলগ্ন এই অপ্রাকৃত কুহেলিকাজাল কিছু ঘটনা-বৈচিত্র্য ও মনের প্রাঙ্গণে আলো-আঁধারি খেলার ছায়াচিত্ররচনার হেতু হইয়াছে। গল্প হিসাবে ইহাদের উৎকর্ষ খুব বেশী নহে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল-রস বিদ্যমান। 'সম্পত্তি সমর্পণ' ( ১২৯৮ ), 'স্বর্ণমৃগ' ( ১২৯৯ ), 'গুপ্তধন' ( ১৩১৪ ), 'তপস্বিনী' ( ১৩২৪ ), 'চোরাই ধন' প্রভৃতি এইজাতীয় গল্পের নিদর্শন। আধুনিক পাঠকের নিকট ইহাদের অলৌকিক অংশ অপেক্ষা ইহাদের বাস্তব জীবন-বেষ্টনীটিই অধিকতর উপভোগ্য। 'সম্পাত্তি সমর্পণ'-এ নিতাই পালের দুষ্টামি ও বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বরের দুরন্ত নাতির অত্যাচারে উদ্‌ব্যস্ততা, 'স্বর্ণমৃগ'-এ বেচারী বৈদ্যনাথের অসম্ভব প্রত্যাশার মরীচিকা-বিভ্রান্তি ও দাম্পত্য নির্যাতন, 'গুপ্তধন'-এ প্রহেলিকা-সমাধানের বিস্ময়-চমক ও অন্ধকার, বায়ুশূন্য ভূগর্ভপ্রকোষ্ঠের শ্বাসরোধী অস্বস্তিকরতা, 'তপস্বিনী'-তে স্বামিসঙ্গবঞ্চিতা, তরুণী বধূর ধর্মসাধনার আতিশয্য-অসঙ্গতি ও তাহার স্বর্গাভিমুখী প্রত্যয়ের ভূমিতলশায়ী দুরবস্থা—এইজাতীয় অলৌকিক ঘটনার লৌকিক মানস-প্রতিক্রিয়াই বেশী কৌতূহলোদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছে।

এইজাতীয় গল্পের মধ্যে 'কঙ্কাল' ( ১২৯৮ ) ও 'জীবিত ও মৃত' ( ১২৯৯ ) একটি মধ্যবর্তী স্তরে স্থান পাইয়াছে। 'কঙ্কাল'-এ অতিপ্রাকৃত যেটুকু আছে তাহা খোলাখুলি তথ্যস্বীকৃতি, কোনো কলাকৌশলসঞ্জাত নহে। কঙ্কাল যদি

বাক্‌শক্তিসম্পন্ন হইয়া অতীত জীবনের কথা বিবৃত করিতে পারে, তবে তাহার জীবন-অভিজ্ঞতায় কিছু অভিনবত্বের আস্বাদ থাকা সম্ভব। শুষ্ক অস্থিসংস্থার মুখমণ্ডলের দন্তহীন বীভৎসতার পিছনে যে এককালে অকল্পিত লাবণ্যসম্ভার পুঞ্জীভূত ও ভাবচঞ্চল ছিল ইহা আমাদের সঙ্গতিবোধকে এক তীব্রব্যঙ্গাত্মক আঘাত দিয়াছে। তার পর কঙ্কালের রূপের গর্ব, প্রণয়াবেশের আকুলতা ও জীবনবোধের উদ্দামতা এই ব্যঙ্গাত্মক বৈপরীত্যকে আরও উচ্ছল করিয়া তোলে। উহার চটুল প্রগল্‌ভতা কোনো ভয় জাগায় না, বরং বিশ্রম্ভালাপ-প্রবণতাকে আরও উদ্দীপ্ত করে। কাজেই এখানে সত্যকার অতিপ্রাকৃত কিছু নাই। 'জীবিত ও মৃত' গল্পে কাদম্বিনীর সমাজ-জীবনের অসহায়তাই বেশী করিয়া ফুটিয়াছে। শ্মশান হইতে ফিরিয়া সে যে চিরকালের জন্য গার্হস্থ্য জীবনের সীমাবহির্ভূত হইয়াছে ইহাই তাহার ভাগ্য-বিপর্যয়ের প্রধান কথা। ইহার সঙ্গে ভৌতিক অপরিচয়ের একটু হাল্‌কা পোঁচ লাগান হইয়াছে। মৃত্যুর দুস্তর ব্যবধান যে তাহাকে সমগ্র জীবলোকের অনুভূতি-সাম্য হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছে, এক অচল উদাসীনতার কুহেলি-আবরণে তাহাকে ঝাপ্‌সা, দুরধিগম্য করিয়াছে এই বিশ্বাস তাহার নিজের মন হইতে অপরের মনে সংক্রামিত হইয়াছে। কিন্তু যাহাকে মরিয়া প্রমাণ করিতে হয় যে সে পূর্বে মরে নাই তাহার জীবনাকৃতি যে যথেষ্ট প্রবল তাহা বলিয়া দিবার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই যখন এই হইলে-হইতে-পারিত ভূত সত্যকার প্রেতযোনিতে প্রবেশ করে, তখন আমাদের গায়ে কাঁটা দেয় না, চোখেই জল আসে।

সার্থকনামা অতিপ্রাকৃত গল্পে মনস্তত্ত্বের নিয়মশৃঙ্খলাকে মানিয়া লইয়া, বাহিরের ঘটনার সহিত অন্তরের অনুকূল সহযোগিতাকে একত্র গাঁথিয়া, বস্তুজগতের দিক দিয়া অবাস্তব, অথচ অনুভূতির দিক দিয়া নিশ্ছিদ্র-নিটোলরূপে যথার্থ, মনোবিকারের অনিবার্য প্রকাশরূপে ভৌতিক আবির্ভাবকে সূক্ষ্ম ও সুমিত কলাকৌশলের মাধ্যমে ফুটাইয়া তোলা হয়। রবীন্দ্রনাথের এইরূপ গল্পের মধ্যে 'নিশীথে' ( ১৩০১ ), 'ক্ষুধিত পাষাণ' ( ১৩০২ ) ও 'মণিহারা' ( ১৩০৫ )—এই তিনটির নাম করা যায়। ইহাদের মধ্যে 'নিশীথে' প্রথমা স্ত্রীর প্রতি শপথভঙ্গ ও কর্তব্যচ্যুতির অপরাধবোধে সাময়িকভাবে উদ্‌ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির মনোবিকারের রন্ধ্রপথে উৎক্ষিপ্ত আত্মদোষস্বীকৃতি অতিপ্রাকৃত শক্তির পরোক্ষ পরিচয়রূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। এখানে প্রকৃতপক্ষে অলৌকিকের আবির্ভাব ঘটে নাই—রাত্রির যাদুভরা মত্ততায় এক অসংবরণীয় হৃদয়াবেগ সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে বিধ্বস্ত

করিয়া যেন আত্মনিষ্ক্রমণের পথ রচনা করিয়াছে। অনিদ্রা ও মদ্যপান এই মানস-বিপর্যয়ের শারীরিক হেতুরূপে কার্যকরী হইয়াছে—পরলোকগতা স্ত্রীর সপত্নীসন্দেহমূলক আর্ত পরিচয়-জিজ্ঞাসা যেন ছুরির আঘাতের মতো তাহার মস্তিষ্কের কোষমধ্যে তীব্র বিদারণ-রেখায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। নিশীথের অন্ধকারে ইহা শব্দতরঙ্গরূপে ধ্বনিত হইয়া উঠে। এই গল্পের মনোবিকারের অংশ বাদ দিলে যে অংশটি আমাদের মনোযোগে সংসক্ত হইয়া থাকে তাহা প্রথমা স্ত্রীর চরিত্র-পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' উপন্যাসে মাতৃজাতীয় স্ত্রীর যে শ্রেণীবর্ণনা আছে, এখানে তাহার একটি সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শস্থানীয় পরিচয় পাই। এই মহিলার স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধ ও অক্ষুণ্ণ আত্মসংযম স্বামীর উচ্ছ্বাসের মাত্রাধিক্যকে লজ্জিত ও তাহার বিবেকদংশনজাত সেবাপ্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে। অথচ তিনি কোথায়ও একটি তিরস্কার-বাক্য বা নীতি-উপদেশবাণী উচ্চারণ করেন নাই, সস্নেহ স্বল্পভাষী প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়া এই আচরণের সমস্ত উপহাস্য আতিশয্যটুকু উপভোগ করিয়াছেন। রোগশয্যাশায়িনী, মৃত্যুর জন্য নীরবে প্রতীক্ষমাণা এই রমণীর অন্তর-রহস্য যেমন তাঁহার স্বামীর কাছে, তেমনি পাঠকের কাছেও অনুদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে। স্বামী তাঁহার মনের নাগাল পায় নাই—এই নিঃসন্তানা নারী—অস্থিরমতি, তরলপ্রকৃতি, উচ্ছ্বাসপ্রবণ মানুষটিকে লইয়া তাঁহার সন্তান-বাৎসল্যের শখ মিটাইয়াছেন। ডাক্তারের নিকট দক্ষিণাবাবু তাঁহাকে কেবল সুগৃহিণীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার সুগভীর ভালবাসার কোনো পল্লবিত বর্ণনা দেন নাই, সেদিকে চোখ মেলিয়া দেখিতেও যেন তাঁহার সঙ্কোচবোধ হইয়াছে। এই মহীয়সী মহিলা স্বামীকে অন্তর্দ্বন্দ্বক্লিষ্ট আত্মপীড়ন হইতে মুক্তি দিবার জন্য অবহেলায় নিজ প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। এই অ-বিজ্ঞাপিত, আত্মলীন চরিত্র-মহিমা সমস্ত গল্পের মধ্যে কেমন অনিবার্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'ক্ষুধিত পাষাণ' যথার্থ অতিপ্রাকৃত আবেশের আধার। ইহাতে ব্যক্তিগত মনোবিকারের কোনো ইঙ্গিত নাই। যে-কেহ এই লালসা-পিচ্ছিল, মদির কামনারসে রহস্যময় প্রাসাদের জঠরে প্রবেশ করিয়াছে সে-ই ইহার জারক রসে জীর্ণ হইয়া ইহার সহিত নিজ ব্যক্তিসত্তার অস্থিমেদমজ্জাকে মিশাইয়া দিয়াছে। যেমন কোনো কোনো আরণ্যক বৃক্ষ পাতার বর্ণবিলাসে মক্ষিকাকে প্রলুব্ধ করিয়া ঐ হতভাগ্য প্রাণীকে নিজ পত্র-কারাগারে চিরবন্দী করিয়া রাখে, এখানেও প্রাসাদের একটি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণশক্তি মানুষকে আত্মবিলুপ্তির অতল গহ্বরে

নিক্ষিপ্ত করে। এই গল্পে অতীত যুগের বিলাস-বিভ্রম, অতৃপ্ত কামনার আর্ত পিপাসা, নৃত্যগীতসুরার মোহাবেশ, রূপবহ্নিতে ঝাঁপাইয়া-পড়া মানব-পতঙ্গের দাহজ্বালা, বাদসাহী হারেমের লৌহ-কঠোর নিয়মের চক্রতলে নিষ্পিষ্ট মানবাত্মার চাপা রোদন-গুঞ্জরন—সমস্ত মিলিয়া যেন একটি আত্মিক সত্তা, একটি দেহাতীত চেতনা, একটি ক্রূর, নিয়তি-নিষ্করুণ, অলৌকিক শক্তিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। একজন বলিরূপে নির্দিষ্ট মানুষের প্রত্যাশা-চঞ্চল, প্রতীক্ষায় উদ্বেজিত চিত্তে এই অতীতের প্রাণপ্রবাহ কি অপরূপ বর্ণোজ্জ্বল চিত্র-পরম্পরায়, স্মৃতির কি সূক্ষ্ম-চেতনাবিধৃত, বাসনাসংস্কাররূপী উদ্বোধনে, বস্তু-অতিসারী রসের কি মদির স্বচ্ছতায় বহিয়া গিয়াছে! মুসলমানী জীবনচর্যার সমস্ত ভোগবিলাস-পঙ্কিল, অতৃপ্তি-আতিশয্যক্ষুব্ধ, স্বপ্ন-ইন্দ্রজালবিড়ম্বিত ইতিহাস যেন এখানে আপনার অন্তর-রহস্যটিকে ইন্দ্রিয়াতীত সংকেতে একটা নিবিড় স্মৃতি-রোমন্থনে পরিপূর্ণ-ভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। এই গল্পে লেখকের অপূর্ব বর্ণনাশিল্প, ধ্বনিব্যঞ্জনার আশ্চর্য প্রয়োগ ও ভাবলোকের চিত্রণে অসাধারণ অন্তঃসঙ্গতিবোধ কোনো ঘটনার সহায়তা ব্যতিরেকেই অতিপ্রাকৃত সত্তার উপস্থিতি আমাদের নিকট জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

'মণিহারা' গল্পটির ভৌতিক রোমাঞ্চ অনেকটা নূতন প্রক্রিয়ায় সঞ্চারিত হইয়াছে। এখানে কাহিনীর বক্তা একজন তৃতীয় ব্যক্তি, যিনি এই অপ্রাকৃত সংঘটনের সহিত প্রত্যক্ষযোগহীন। বক্তা একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বুদ্ধিজীবী ও আধুনিক যুগোচিত জীবন-দর্শনে আস্থাশীল মানুষ। তিনি সমস্ত ঘটনাটিকে তাঁহার নিজের দাম্পত্যসম্পর্কসম্বন্ধীয় মতবাদের পরিপোষকরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। যে দুর্দৈব ঘটিয়াছে তাহা স্ত্রীপুরুষের সহজ সম্পর্কের ব্যত্যয়ের জন্যই উদ্ভূত। মণিমালাকে হারাইয়া ফণিভূষণ নিজ পুরুষোচিত দৃঢ়তার অভাবের জন্য ন্যায্য শাস্তিই ভোগ করিয়াছে। সে নিজ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিলে মণিও মরিত না, তাহার অলঙ্কৃত কঙ্কালও স্বাভাবিকতার সমস্ত সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া, সমস্ত সহজ নিয়মকে বিপর্যস্ত করিয়া এই মরলোকের ধূলিতে পদক্ষেপ করিত না। সুতরাং বক্তার কৌতূহল ও আগ্রহ ভৌতিক আবির্ভাবে নহে, একটি সুস্থ দাম্পত্যনীতির প্রতিপাদনে। সে নিজেও তাহার গল্পের যথার্থতায় বিশ্বাস করে না, কেননা প্রকৃতিঠাকুরাণী উপন্যাস-রচয়িত্রী নহেন। গল্পের উপসংহারে ফণিভূষণ আত্মপরিচয় দিয়াছে ও তাহার স্ত্রীর প্রকৃত নাম যে কবিত্ব-সুরভিতা মণিমালা নহে, কিন্তু গদ্যকঠিনা নৃত্যকালী তাহাও প্রকাশ করিয়াছে।

সুতরাং বক্তার দাম্পত্যসম্পর্কবিশ্লেষণ যে বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক, ও নৃত্যকালী যে গহনা বাঁচাইতে জলমগ্ন হইয়া মরিয়াছিল ও তাহার প্রেতরূপান্তর যে সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত এরূপ ইঙ্গিতও ইহার মধ্যে আবিষ্কার করা কঠিন নয়। শ্রোতা ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করে নাই, তাহার স্ত্রীকে লইয়া যে কল্পনাজাল বোনা হইয়াছে তাহাকেই পরোক্ষভাবে বাতিল করিয়াছে।

এই সংশয়িত পরিবেশ সত্ত্বেও গল্পের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের ব্যঞ্জনাটি কোথায়ও নিবিড়তা হারায় নাই। বক্তার অবিশ্বাসী মন গল্পরসে নিমগ্ন হইয়া উহার সমস্ত সংশয়কে অতিক্রম করিয়াছে। যখন অনুকূল আবেষ্টনে ও বর্ণনা-কৌশলে ভৌতিক রস জমিয়া উঠে তখন অবিশ্বাসীরও দেহে কাঁটা দিয়া উঠে। এখানেও তাহাই ঘটিয়াছে। ফণিভূষণ সমস্ত প্রাণ দিয়া, অন্তরের সমস্ত অনুভব-শক্তি সংহত করিয়া, নির্জন ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া মণিমালাকে আবাহন করিয়াছিল। তখন বর্ষার রিমঝিম বৃষ্টিপাত, একটানা ঝিল্লীধ্বনি ও ভেককলরব ও গ্রামের সুদূর প্রান্ত হইতে ভাসিয়া-আসা যাত্রা-সঙ্গীতের অস্পষ্ট সুরের আভাস এই পরিচিত জগতের উপর এক দৃশ্য ও শব্দযবনিকা টানিয়া দিয়াছিল। ইহারই আড়ালে এক অশরীরী আত্মা অতল রহস্যলোক হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া ও কঙ্কালময় ছায়াদেহে নিজ ভয়াবহ দুর্ভাগ্যের চিহ্ন বহন করিয়া ফণিভূষণের সাধকদৃষ্টির নিকট আবির্ভূত হইল। মণিমালা ওরফে নৃত্যকালীর মনোভাব যাহাই হউক না কেন, ফণিভূষণের গভীর পত্নীপ্রেম তাহার অতীত জীবনের লীলানিকেতনে প্রত্যাবর্তনের দ্বারাই প্রমাণিত। সুতরাং এই একনিষ্ঠ প্রেম-সাধনার নিকট যে পরলোকের রহস্যযবনিকা খানিকটা উন্মোচিত হইবে ইহা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াও অশ্রদ্ধেয় নহে। ফণিভূষণের গল্পের সত্যতা-অস্বীকৃতিতেও পাঠকের বিশ্বাস বিচলিত হয় না। গল্পটি যেন সংশয়ের বৃন্তে ফোটা অপরূপ বিশ্বাসের ফুল।

রবীন্দ্রনাথের আরও কতকগুলি গল্প বিশেষ কোনো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। ইতিহাসে তাঁহার কল্পনা বিশেষ কোনো আকর্ষণ খুঁজিয়া পায় নাই। 'দালিয়া'-তে ইতিহাস নাই, আছে ইতিহাসের স্রোতে ভাসিয়া-আসা ও প্রাকৃত জীবন-তটে সংলগ্না বিস্মৃতগৌরবা এক শাহজাদীর বংশমর্যাদাহীন প্রণয়লীলা। বিবাহের ফলে যে পরিত্যক্ত আভিজাত্যসম্ভ্রম তাহার অজ্ঞাতসারে ফিরিয়া আসিয়াছে, নির্বোধ কৃষককে বরণ করিয়া সে যে ছদ্মবেশী রাজপুত্রেরই রাণী হইয়াছে, ইহা ইতিহাসের একটা আকস্মিক কৌতুক মাত্র। 'রীতিমত নভেল' প্রথাগত

ঐতিহাসিক কাহিনীর ব্যঙ্গানুকৃতি। 'মুক্তির উপায়' (১২৯৮) ও 'রাজটিকা' (১৩০৫) কৌতুক-হাস্যে প্রসন্ন-উজ্জ্বল। প্রথমোক্ত গল্পে রবীন্দ্রনাথ আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের লঘু-তরল দিক ও দাম্পত্য সম্বোধনের প্রাকৃত রীতি সম্বন্ধেও যে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন তাহার প্রমাণ মিলে। তাঁহার আর কতকগুলি গল্পে, যথা—'একটা আষাঢ়ে গল্প' (১২৯৯), 'অসম্ভব কথা' (১৩০০), 'একটা ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প' (১৩০০)—রূপকথার কাঠামো, রূপকের ইঙ্গিতময়তা ও ছোটোগল্পের কারুকলা-বিশ্লেষণের উপভোগ্য সমন্বয়ে গ্রথিত হইয়াছে। এইসবের মধ্যে তাঁহার জীবনসমীক্ষার বিচিত্র ভঙ্গী ও বহুমুখী গ্রহণশীলতা উদাহৃত। 'মহামায়া' গল্পে একটা অবিশ্বাস্য পটভূমিকায় এক রহস্যময়ী নারীর প্রখর ও অনমনীয় রোমান্টিক দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিয়াছে।

## আট

রবীন্দ্রনাথ যদিও বাঙালী-জীবনের সমস্ত দিক ও উহার প্রাণরসের নানা পথে সঞ্চরণশীলতার সহিত পরিচিত ছিলেন, তথাপি উহার বিশেষ একটি দিক—জমিদারী জীবনযাত্রার রূপ—তাঁহার সৃষ্টিপ্রেরণা ও রসানুভবশক্তিকে বিশেষভাবে উদ্রিক্ত করিয়াছিল। জমিদারী-প্রথা তাঁহার নিকট কেবল একটা অর্থনীতিক ব্যবস্থা ছিল না, ইহা ছিল একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শন ও চিরাভ্যস্ত নীতির মর্যাদাযুক্ত। বনিয়াদী বংশের চাল-চলন, রীতি-নীতি, অধিকার ও কর্তব্যবোধ, অবসর-প্রাচুর্য ও অলস ভাবরোমন্থন, সূক্ষ্ম ও অতিসতর্ক রুচি, সুকুমার বৃত্তিগুলির অনুশীলন-বৈশিষ্ট্য, আদর্শচেতনা ও সার্থকতার মানদণ্ড সমস্ত মিলিয়া জমিদারদিগকে বাঙালী-সমাজে এক স্বতন্ত্র ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে জমিদার-সন্তান ছিলেন বলিয়াই এই শ্রেণীর মনোগঠনের সমস্ত অসঙ্গতি ও বাস্তব-বিমুখতা তাঁহার নিকট অতিশয় স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পরবর্তী গল্পলেখকদের মধ্যে এক তারাশঙ্কর এই জমিদারগোষ্ঠী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হাতে এই ভূস্বামী-সম্প্রদায় কেবল পূর্বগৌরবের লুপ্তাবশেষ, আধুনিক যুগের সহিত সামঞ্জস্যহীনরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। তারাশঙ্কর যখন লেখকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন জমিদারেরা হৃতগৌরব ও স্মৃতিমাত্রসম্বল; লুপ্ত ক্ষমতার প্রেতাত্মা তাঁহাদের স্কন্ধে ভর করিয়া তাঁহাদিগকে নানা অলীক অভিমান ও ক্ষোভে অস্থির করিয়াছে। তাঁহাদের চরিত্র ভারসাম্যচ্যুত ও সহজচ্ছন্দভ্রষ্ট; জীর্ণ বংশগৌরবের

অবলম্বনে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব নিজ স্থাবরত্ব গোপনের বৃথা চেষ্টায় বিড়ম্বিত। রবীন্দ্রনাথের যুগে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে জমিদারী-প্রথা সজীব ও সুসঙ্গত জীবনবোধে আত্মপ্রতিষ্ঠ ছিল। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্ম-অবিশ্বাসের কীট তাহাদের সুখলালিত ও বিলাস-লালিত্যময় অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি করে নাই। আধুনিক যুগের সঙ্গে তাহাদের সংঘর্ষ সবেমাত্র সুরু হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মনোবল তাহাতে বিশেষ ক্ষুন্ন হয় নাই। কোথায় কে একজন বনোয়ারি পারিবারিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অবাঞ্ছিত অনধিকারীর ন্যায় পরিবার-দুর্গ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। নয়ানজোড়ের ঠাকুরদাদা একটা করুণ আত্মপ্রতারণার দ্বারা তাঁহার জীবনযুদ্ধে পরাভব-গ্লানিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আদর্শনিষ্ঠা ও চরিত্রমাধুর্য এতটুকু বিকৃত হয় নাই—দারিদ্র্যরাহুগ্রাসের মধ্যেও তিনি পূর্বের ন্যায় স্নিগ্ধচন্দ্রিকা বিকিরণ করিয়াছেন। তাঁহার রাজমুকুট ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার মনের উদার, রাজোচিত মহিমা সম্পূর্ণরূপে ধূলি-সংস্পর্শমুক্ত রহিয়াছে। এই গণতান্ত্রিক যুগে জমিদারের কথা উঠিলেই তাহাকে শোষক নামে অভিহিত করা ও তাহার পরাশ্রয়িত্ব ও শ্রমবিমুখতাকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করাই প্রথায় দাঁড়াইয়াছে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই জমিদারকে অর্থনীতির অনাবশ্যক আবর্জনারূপে না দেখিয়া তাহাকে একটি সুদীর্ঘ সমাজ-বিবর্তন ও মানস-অনুশীলনের পরিণত ফল রূপে দেখিয়া তাহার চাপা অন্তর-বেদনার স্বরূপটি প্রকটিত করিয়াছেন।

জমিদারসংক্রান্ত সমস্ত গল্পেই ঘটনার অভাবনীয়তা বা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা দেখা যায়। 'সমস্যাপূরণ'-এ ধর্মনিষ্ঠ, কাশীবাসী হিন্দু জমিদারের যবনী-প্রসক্তি যেমন বিস্ময়কর, সেইরূপ তাঁহার লজ্জাকর অপরাধস্বীকৃতিও তাঁহার বলিষ্ঠ সত্যনিষ্ঠার নিদর্শন। শিক্ষিত পুত্রের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের নামে প্রজাপীড়নও জমিদারী-প্রকৃতির আর এক দিকের পরিচয়। 'প্রতিহিংসা' (১৩০২) জমিদারী-জীবন-পরিবেশের একটি অসাধারণ হইলেও যথার্থ চিত্র। জমিদার ও তাঁহার কর্মচারীগোষ্ঠীর মধ্যে যে পুরুষানুক্রমিক প্রভুভক্তির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে তাহা মানবচরিত্রের একটি মহনীয় দিকের উপর আলোকপাত করে। এই প্রীতিমধুর, ভক্তিনম্র পারস্পরিক সম্পর্কের পিছনে কত নীরব আত্মোৎসর্গ, কত স্নেহ-শ্রদ্ধা-বিগলিত হৃদয়বৃত্তির দান-প্রতিদান, কত ব্রতসাধনার নিখুঁত নিষ্ঠার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা এই অর্থনীতিক একাধিপত্যের দিনে কল্পনা করাও দুরূহ। প্রভুভৃত্যের তুচ্ছ সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া কত আচরণ-মাধুর্য, পরকে

আপন করিবার ও মানুষকে দেবতা ভাবার কিরূপ চিরাভ্যস্ত সংস্কার, নিঃস্বার্থ সেবার কত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিকশিত হইয়া উঠিত, যাহা জাতীয় জীবনে অক্ষয় সম্পদ্‌রূপে সঞ্চিত হইয়া থাকিত। ইন্দ্রাণীর চরিত্রে বাঙালী-জীবনের এই অপূর্ব ভাবসাধনা মহিমান্বিত প্রকাশ লাভ করিয়াছে। তাহার অভিমান-অহঙ্কার, দৃপ্ত আত্মসম্মানবোধ, মনিববাড়ীর অপমানকর আচরণে তীব্র ক্ষোভের জ্বালা সবই এক বিরাট আত্মোৎসর্গের গৌরবে বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রভুর হিতে সমস্ত অলঙ্কার বিসর্জন দিয়া নিরলঙ্কারা ইন্দ্রাণী কি এক স্বর্গীয় জ্যোতির্মণ্ডিত হইয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে!

'রাসমণির ছেলে' (১৩১৮) জমিদারী-জীবনধারার ও অভ্যাস-সংস্কারের আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক অভিব্যক্তি। বিখ্যাত জমিদারবংশে জাত ও জ্ঞাতির বিশ্বাসঘাতকতায় অধুনা দারিদ্র্যগ্রস্ত ভবানীচরণের মানসগঠন মানব-মনস্তত্ত্বের এক জটিল প্রকাশ। আজীবনের অভ্যাস ও বিশ্বাস, জীবনচর্যার এক অদ্ভুত রীতি তাহাকে একটি সম্পূর্ণ অসহায়, বাস্তববিমুখ ও মিথ্যাকল্পনাপ্রবণ জীব করিয়া তুলিয়াছে। স্ত্রী রাসমণি তাহাকে সমস্ত বাস্তব আঘাত হইতে বাঁচাইয়া, তাহার বড়লোকী চালচলনের প্রশ্রয় দিয়া, তাহার ভ্রান্ত আশার পোষকতা করিয়া তাহাকে যেন মাতৃক্রোড়লালিত চিরশিশুর মতো দায়িত্ববোধহীন ও পরনির্ভর করিয়া রাখিয়াছে। ভবানীচরণ যেন নয়ানজোড়ের ঠাকুরদাদারই আর একটি সংস্করণ; তবে ঠাকুরদাদা জানিয়া-শুনিয়া আত্মপ্রতারণা করিতেন, আর ভবানীচরণ নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। ঠাকুরদাদা পূর্ব-ঐশ্বর্যের স্মৃতি বৃন্দাবন ছাড়িয়া কলিকাতার গণতান্ত্রিক ও বাস্তবসংঘর্ষরূঢ় পরিবেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। নয়ানজোড়ে ফিরিবার আশা বা ইচ্ছা তাঁহার কোনোটাই ছিল না; এই নৈরাশ্যের স্থির প্রতিষ্ঠাভূমি হইতেই তাঁহার সমারোহ-কল্পনা উৎক্ষিপ্ত হইত। ভবানীচরণ পূর্বস্থানে বাস করিয়া পূর্ব-ঐশ্বর্যের স্মৃতি ও উহার পুনরুদ্ধারের আশায় মশ্‌গুল থাকিতেন। ঠাকুরদাদার সমস্ত জীবন বাহিরের বন্ধুমহলেই কাটিত; তাঁহার ঘরের মধ্যে একমাত্র পৌত্রী কুসুম তাঁহার এই ঐশ্বর্যের অভিনয়কে মুগ্ধ দর্শকের সমর্থনই দিত। কিন্তু ভবানীচরণের সমস্ত গার্হস্থ্য প্রতিবেশ তাহার স্বপ্নবিলাসের রূঢ় প্রতিবাদই ধ্বনিত করিত। তাহার পুত্র কালীপদ কঠোর রিক্ততার মধ্যেই লালিত হইত এবং ভবানীচরণ জীবন-মানের এই পার্থক্যে ক্ষুণ্ণ হইলেও ইহার প্রতিবিধান করিবার মতো মানসশক্তি তাহার ছিল না। পিতার খেয়ালী-কল্পনা ও পুত্রের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার

নিরলস তপশ্চর্যা একই অবস্থা-প্রসূত জীবন-নীতির দুইটি বিপরীত দিক। মাঝে রাসমণি চতুর্ভুজা দেবীর মতো দাঁড়াইয়া এক হস্তে বরাভয় ও অপর হস্তে প্রশ্রয়হীন সাধনার নির্দেশ বহন করিয়া মিথ্যা সচ্ছলতা ও সত্য অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেন। কালিপদর কলিকাতা-জীবনের দৃঢ়সংকল্পময় কৃচ্ছ্রসাধন, শৈলেনের সঙ্গে তাহার একত্রবাসের দুঃসহ লাঞ্ছনা ও তাহার অকালমৃত্যুর করুণ পরিণতি সমস্ত গল্পটিকে একটি বিষাদ-গম্ভীর সুরে অনুরণিত করিয়াছে। সংসারের ভরসাস্থল একমাত্র পুত্রের মৃত্যু ভবানীচরণের ঐশ্বর্যের নেশা টুটাইয়া তাহাতে দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত ও পুনঃপ্রাপ্ত উইলের প্রতি উদাসীন করিয়াছে। রাসমণি তাঁহার অভ্যস্ত চিত্তসংযমের সহিত স্বামীর মুখ চাহিয়া এই নিদারুণ শোকও নীরবে সহ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ গল্পমধ্যে শৈলেনকে আনিয়া ও উহার মনের পরিবর্তন সাধন করিয়া জমিদারবংশের দুই সরীককে একত্রিত করিয়াছেন ও যুগব্যাপী অবিচারের প্রতিবিধান করিয়াছেন, কিন্তু এই দৈবপ্রসাদ এত বিলম্বে আসিয়াছে যে ইহাকে দ্বারপ্রান্ত হইতেই ফিরিতে হইয়াছে।

### নয়

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত শ্রেষ্ঠ গল্পে চরিত্রের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও গভীর জীবনসত্যের উদ্‌ঘাটন ঘটনাবিন্যাস ও বর্ণনাকৌশলের আকর্ষণকে ঘনীভূত করিয়াছে ও উহাদিগকে বৃহত্তর-তাৎপর্য-মণ্ডিত করিয়াছে। এই গল্পগুলি পড়িয়া আমরা শুধু কাহিনীর কথাই মনে করি না, কত স্বাতন্ত্র্য-সমুজ্জ্বল ব্যক্তিসত্তা আমাদের মনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া নারী-চরিত্রেই এই স্বাতন্ত্র্য-পরিচয় বেশী করিয়া অনুভূত হয়। রমণীর রূপবর্ণনাভঙ্গীর মধ্যেও এই স্বাতন্ত্র্যের ইঙ্গিত নিহিত। মহামায়া মেঘাচ্ছন্ন, বিদ্যুৎচকিত শ্রাবণ-নিশীথিনীর মতো রহস্যগম্ভীরা ও তড়িদ্দীপ্তির ন্যায় জ্বালাময়ী—কুলীন পরিবারের ফ্রেমে আঁটা অগ্নিশিখার ছবি। 'মানভঞ্জন'-এর গিরিবালা নিজের রূপে আত্মমগ্ন, আবেশ-বিভোর, তাহার অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছল স্রোতের ন্যায় লাবণ্যপ্রবাহ,—অধীর, অশান্ত, আবর্তচক্রে ঘূর্ণিত। এই রূপের নেশাই তাহার চোখে ঘোর লাগাইয়াছে ও তাহার আচরণে ফুলিয়া-ফাঁপিয়া-ওঠা আতিশয্যের আবেগছন্দ ফুটাইয়াছে। তাহার অপমানিত, প্রত্যাখ্যাত সৌন্দর্যের বিদ্যুৎশিখা গৃহকোণের স্নিগ্ধ অন্তরাল অতিক্রম করিয়া রঙ্গমঞ্চের শতদীপজ্বালা, সহস্র চক্ষুর মুগ্ধ অভিনন্দনরঞ্জিত বহ্ন্যুৎসবে আপনার সমস্ত দীপ্তি ও দাহ উজাড় করিয়াছে। গিরিবালার

কিশোরী-জীবনে যে অভিনয়ের উচ্ছ্বাস সুপ্ত ছিল তাহাই অবহেলার অঙ্কুশাহত হইয়া বাস্তব রঙ্গমঞ্চের অভিনয়শিল্পে উদ্ধত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নিজের যে রূপপ্রশস্তি এতদিন নিভৃত গৃহপরিবেশে পরিচারিকার একক কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে তাহাই এইবার শত শত দর্শকের মুগ্ধ আরতিতে পূর্ণাহুতি লাভ করিল। গিরিবালার কৈশোর-রূপসচেতনতার এই অনিবার্য পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও মানবচরিত্রের রহস্যভেদশক্তির অপূর্ব পরিচয় মিলে।

'প্রতিহিংসা'-র ইন্দ্রাণীও একই রূপের অধিকারিণী, কিন্তু তাহার প্রকাশের উচ্ছলতা অটল সম্ভ্রমবোধের দ্বারা সংযমিত ও সুরক্ষিত। ইহার অভিব্যক্তি আচরণের দৃপ্ত মহিমায়, শান্ত আত্মগৌরবে, কোনো চপলতার উচ্ছ্বাসে নহে। গিরিবালাতে যে সৌন্দর্য বাঁধ ভাঙ্গিতে সর্বদা উৎসুক, আপনাকে উৎক্ষিপ্ত করিতে, ছড়াইতে-ছিটাইতে পাগল, আভিজাত্যহীন আতিশয্য ও আত্মমুগ্ধ মদিরতায় সীমাতিসারী, ইন্দ্রাণীতে তাহাই স্থির, আত্মসমাহিত, তরঙ্গোৎক্ষেপ-হীন। 'অধ্যাপক' গল্পে কিরণবালা ও 'শুভা' গল্পে শুভা—এই উভয়েরই সৌন্দর্য প্রকৃতির সঙ্গে সুগভীর আত্মিক সম্পর্কে যুক্ত ও উহারই ছন্দে লাবণ্যময়, কিন্তু উভয়েরই সামগ্রিক আবেদনে চরিত্র ও পরিস্থিতি অনুযায়ী একটি পার্থক্য বিদ্যমান।

চরিত্রস্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়া হৈমন্তী, 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণী, 'অনধিকার-প্রবেশ'-এর জয়কালী, 'মধ্যবর্তিনী'-তে হরসুন্দরী, 'শাস্তি'-তে চন্দরা, 'সমাপ্তি'-তে মৃন্ময়ী, 'দিদি'-তে শশিমুখী, 'দৃষ্টিদান'-এ কুমুদিনী, 'হালদার গোষ্ঠী'-তে কিরণবালা, 'প্রতিহিংসা'-য় ইন্দ্রাণী, 'রাসমণির ছেলে'-তে রাসমণি—প্রত্যেকটিই আপন বিশিষ্টতায় স্মরণীয় ও কাহিনীপ্রবাহে সংযুক্ত থাকিয়াও কাহিনীর ঊর্ধ্বে নিজ স্বকীয়তার গৌরবে দণ্ডায়মান। পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে—'হালদার গোষ্ঠী'-র বনোয়ারিলাল, 'শেষের রাত্রি'-তে যতীন, ঠাকুরদাদা, 'রাসমণির ছেলে'-য় ভবানীচরণ, 'অতিথি'-তে তারাপদ, 'আপদ'-এ নীলকণ্ঠ প্রভৃতিও তীক্ষ্ণবৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ও অবিস্মরণীয়। তবে মোটের উপর পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী-চরিত্র-অঙ্কনেই রবীন্দ্রনাথের অধিকতর কৃতিত্ব।

২

# নাটক

[ "নিজের মধ্যে বেড়া দিয়ে আমি কখনই টিকতে পারব না—চিরদিন ঘোর বন্ধনদশার মধ্যেও আমার চিত্ত কেবলি মুক্তি চেয়েছে, সেই মুক্তিকে হারিয়ে আমি কি একেবারে ব্যর্থ হয়ে চলে যাব, কখনই না।

নিজের বাইরের আবেষ্টন ভেদ করে আপনার যথার্থ সত্য রূপটিকে লাভ করবার জন্যে ভারি একটা বেদনা বোধ করছি। সেই চিন্তা আমাকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম দিচ্ছে না। কেবলি বলছে, বেরও, বেরও—না বেরোতে পারলে অন্ধকারের পর অন্ধকার—আপনার প্রকাশ একেবারে আচ্ছন্ন ··· আমি যেন আর সহ্য করতে পারছিনে, বেরও, বেরও, বেরও—সমস্ত অসত্য থেকে, সমস্ত স্থূলত্ব, জড়ত্ব থেকে, বেরও বেরও—একবার নির্মল মুক্তির মধ্যে প্রাণ ভরে নিশ্বাস গ্রহণ কর—আর নয়—আর দিনের পর দিন এমন ব্যর্থতার মধ্যে কেবলি নষ্ট করে ফেলা নয়—কোথায় ভূমা কোথায়—কোথায় সমুদ্রের হাওয়া, আকাশের আলো, অপরিমিত প্রাণের বিস্তার।

আশ্বিন, ১৩১৮ রবীন্দ্রনাথ"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বা সংগীতে চিরন্তন সত্য এবং সুন্দরের সঙ্গে নিখিল মানবাত্মার নিরন্তর সংযোগের জন্যে অবারিত নির্মল মুক্তির যে অনবচ্ছিন্ন আহ্বান, সেই আহ্বান, সেই একই মুমুক্ষা-চেতনা নতুন নতুন ভাবে মূর্ত হয়েছে তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির ভাববস্তুকে আশ্রয় ক'রে। মানুষের চেয়ে মানুষের গড়া নিয়ম যখন বড় হয়ে ওঠে তখন মানুষ তার নিজের কারাগারে বন্দী হয়েই একটু আলো, একটু বাতাসের জন্যেই মাথা কুটে মরে। অনড় অচল সেই সংস্কারের কারাগার কখনো ধর্মগত, কখনো সমাজগত, কখনও বা দেশ বা জাতিগত পরিবেষ্টনীর মধ্যেই মানুষকে আবদ্ধ করে নির্মমভাবে। অসত্য, অন্যায়, স্থূলতা আর জড়তার দাসত্ব করতে করতে মানবাত্মা বারবার লাঞ্ছিত হয়। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির প্রধান ভাবসত্য এরই বিরুদ্ধে অভিযানের সত্য। ডাকঘর, অচলায়তন, ফাল্গুনী, ঋণশোধ (শারদোৎসব), মুক্তধারা, রক্তকরবী, তাসের দেশ—

সমস্ত নাটকেই প্রসারিত প্রাণ-সত্যের প্রতি তাঁর মানস-যাত্রা। নাটকগুলির পরিবেশগত পার্থক্য নিতান্তই বহিরঙ্গের বিষয়। 'অচলায়তন'-এর মহাপঞ্চক আর 'ডাকঘর'-এর মাধব দত্ত ভাবগতভাবে একই প্রতীক। 'অচলায়তন'-এর দাদাঠাকুর মুক্তির যে বার্তা এনেছেন, 'রক্তকরবী'র নন্দিনীও যক্ষপুরীতে সেই একই মুক্তির বার্তা এনেছে। 'মুক্তধারা'য় যন্ত্ররাজ বিভূতির লৌহযন্ত্র ভৈরব-মন্দিরের ধ্বজাকে অতিক্রম ক'রে আকাশে উঠতে চায়। মানুষের অবিরাম গতি, প্রাণের অব্যাহত বেগকে আচ্ছন্ন করতে চায় নিরঙ্কুশ যান্ত্রিকতা। 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয় বৈরাগীর উপলব্ধির প্রকাশ যে কথায়, সেই একই কথা অন্যভাবে বলে 'রক্তকরবী'র বিশু পাগলা। প্রত্যেকটি নাটকেরই পরিবেশগত পার্থক্য আছে, কিন্তু ভাবগত ঐক্যে সমস্ত রূপক-সাংকেতিক নাটকই সমধর্মী। 'রাজা' বা 'অরূপরতন'-এ রূপ ও অরূপ, বহিরঙ্গের সীমিত অনুভূতি আর অন্তরঙ্গের ধ্রুবসত্যোপলব্ধির যে প্রকাশ তারও কেন্দ্রীয় সত্য অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্তির সত্য। 'রাজা' নাটকে এ তত্ত্ব বলা হয়েছে অধ্যাত্ম-সত্যের পটভূমিকায়, 'অচলায়তন'-এ ধর্মাচারগত সংস্কারের পটভূমিতে, 'মুক্তধারা'য় মুক্তপ্রাণ ও যান্ত্রিক জীবন-ধারণার সংঘর্ষের মাধ্যমে, 'রক্তকরবী'তে স্বর্ণলোলুপ যক্ষপুরীর পটভূমিকায়—যেখানে মকররাজ অতিকায় লোভী এক দানবের মতো কেবলই বিত্ত সঞ্চয় করে চলেছে, খোদাইকর মানুষগুলি সেই লোলুপ শোষণযন্ত্রের অংশ হয়ে ব্যক্তিপরিচিতির পরিবর্তে পরিণত হয়েছে ক্রমিক সংখ্যায়। যক্ষপুরীর হৃদয়হীন, ধর্মহীন জড়শক্তি-প্রমত্ত রাজ্যে নন্দিনী এনেছে মুক্তির বার্তা। রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যে 'মুক্তধারা'র বিষয়বস্তু য়ুরোপের রাষ্ট্রকৈবল্যবাদী যান্ত্রিকতা আর 'রক্তকরবী'র বিষয়বস্তু কবির দেখা তৎকালীন আমেরিকার ধনতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর প্রধানত গ্রথিত। উভয়ক্ষেত্রেই মানবাত্মা অপমানিত, অবহেলিত, যন্ত্রস্বরূপ। এই দু'খানি নাটকের আঙ্গিক রূপক এবং সংকেতধর্মী হয়েও সমকালীন এমন একটি বস্তু-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে সত্য সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে। 'অচলায়তন' বা 'তাসের দেশ' আচার-অনুষ্ঠান-গত অনড় নিয়মতন্ত্রের পটভূমিতে রচিত। 'তাসের দেশ'-এ স্যাটায়ার-ধর্মিতা অপেক্ষাকৃত প্রকট। 'বিসর্জন' বা 'মালিনী' নাটক এদের পর্যায়ভুক্ত না হলেও, ভাববস্তুর দিক থেকে সে দু'খানি নাটকের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। 'শারদোৎসব' আর 'ফাল্গুনী'তে কবির মুক্তির বাণী নাট্য-আঙ্গিকের মধ্যে কাব্যগত অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবেরই আশ্রয় নিয়েছে বেশী।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির আঙ্গিকে এমন একটি মৌলিকতার পরিচয় আছে, যা রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়। প্রথমজীবনে তিনি শেক্সপীয়রের আদর্শে নাটক-রচনা আরম্ভ করেছিলেন। রাজা ও রানী, বিসর্জন এবং মালিনী—এই রোমান্টিক ট্র্যাজেডিগুলিতে সেই প্রভাবই বেশী। এ নাটকগুলির মধ্যে অতিনাটকীয়তা, ঘটনাগ্রন্থনে দুর্বলতার কথা কবি নিজেও স্বীকার করেছেন। সামাজিক নাটকগুলিতেও রবীন্দ্রনাথের মৌলিক নাট্য-প্রতিভার যথার্থ পরিচয় নেই। গৃহপ্রবেশ, শোধবোধ, বাঁশরী বা মুক্তির উপায়—ইত্যাদি সামাজিক নাটকে চরিত্রচিত্রণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ('গৃহ-প্রবেশ' নাটকে যতীন, 'বাঁশরী' নাটকে বাঁশরী, 'শোধবোধ' নাটকে নলিনী ইত্যাদি) অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্মী হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক নাটকের উপযোগী পরিবেশ এবং গভীরতা সর্বত্র আনুপাতিক হারে সমান নয়। কৌতুক-নাটকগুলি সেদিক থেকে শ্রেষ্ঠতর পর্যায়ের রচনা। 'গোড়ায় গলদ' বা 'শেষরক্ষা'য় অবাস্তব ঘটনা সংস্থানের কিছু সাহায্য নেওয়া হলেও, হাস্যরসের যথার্থ পরিবেশটি তৈরি হয়েছে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' বা 'চিরকুমার সভা' রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ হাস্যরস-সৃষ্টির অনবদ্য উদাহরণ।

রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম পরিচয় রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে। কবিধর্মের সঙ্গে মানবসত্যের উপলব্ধি সম্পৃক্ত হয়ে রচিত হয়েছে তাঁর এই পর্যায়ের নাটকগুলি। আঙ্গিকের তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে লাভ নেই, কারণ রবীন্দ্রনাথ যে আঙ্গিকে তাঁর এই নাটকগুলি সৃষ্টি করেছেন, তা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব। উপলব্ধির সত্যই তাঁর এই নাটকগুলির প্রাণবস্তু। আঙ্গিকের চেয়েও প্রাণের কথা এখানে অনেক বড়ো। তাই নাটক হিসাবে এগুলি অনেক বেশী সত্য।

ভবিষ্যৎকালের রুচি বা বিচারের সম্পর্কে এখনই কোনো রায় দেওয়া চলে না। তবু মানুষের হৃদয়ে চিরন্তন আবেদনের যে মূল সত্যটি আছে, তারই জোরে বলা যায়, যে মুক্তির বাণী রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে আছে, তার প্রসারিত পরিসরের মধ্যে ভবিষ্যতের মানুষ যদি নিজেকে পায় তবে অতীতের এক মহাকবির উপলব্ধির সত্যকে তারা এই নাটকগুলিতে দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে। আর মানবাত্মার এ বন্দীদশা যদি সেদিনও না ঘোচে তবে সেদিনের মানুষ এরই মধ্যে পাবে তাদের আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে বড়ো সত্যটিকে।]

# রবীন্দ্রনাট্যের পরিবেশ-সাপেক্ষতা

সাধনকুমার ভট্টাচার্য

এই প্রবন্ধে আমি যে-বিষয়টি প্রতিপাদন করতে চাই তা প্রবন্ধের নামের মধ্যেই বেশ খানিকটা স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে। আরো স্পষ্ট ক'রে নির্দেশ করতে গেলে বলতে হবে—আমি বলতে চাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যত বিস্ময়কর এবং অনির্বচনীয়কল্পই হোক, তা কোন অলৌকিক শক্তির প্রেরণা নয়—তাঁর রচনাগুলি জাতি-যুগ-পরিবেশ-নিরপেক্ষ কোন রহস্যময় সত্তার সৃষ্টি নয়। আমি দেখাতে চাই যে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি যে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রেরণায় রচিত হয়েছে তা তাঁর পরিবেশ এবং ব্যক্তিমানসের প্রকৃতি থেকেই এবং ঐ পরিবেশ এবং ব্যক্তিমানসও অহেতুক এবং অলৌকিক কোন কিছু নয়। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে চাই—রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট মন অর্থাৎ জ্ঞান-প্রেম-কর্মময় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট পরিবেশ—এই দুই বিশেষ শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। বলতে চাই—বিশেষ জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা-বিশিষ্ট রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিবেশের সঙ্গে যে আধিমানসিক অভিযোজন করতে চেষ্টা করেছিলেন সেই চেষ্টাই বিভিন্ন রচনার রূপে ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্র-রচনা আসলে বিশিষ্ট মনের বিশিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে বুঝাপড়ার ইতিহাস। জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার বিশিষ্টতায় রবীন্দ্রনাথের মন বা ব্যক্তিত্ব যেমন বিশিষ্ট, তেমনি ক্রমবিবর্তনশীল বাঙালী সমাজের বিশেষ একটি পর্ব হিসাবে রবীন্দ্র-পরিবেশও বিশিষ্ট। সুতরাং রবীন্দ্র-মানস যেমন নিরপেক্ষ নয়, রবীন্দ্র-পরিবেশও তেমনি অনির্দিষ্ট এবং অহেতুক কিছু নয়।

কিন্তু প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে—কেন এই প্রবন্ধ? সৃষ্টির পরিবেশ-সাপেক্ষতা কেউ কি অস্বীকার করেন? এখনও কি কেউ সৃষ্টিকে অহেতুক এবং দিব্য-প্রেরণার ফল ব'লে মনে করেন? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই—এইজাতীয় প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি এবং যায়নি তার কারণ সমালোচকদের মধ্যে এখনও বৈজ্ঞানিক সংস্কার বদ্ধমূল হয়নি; এখনও প্রতিভার সংজ্ঞা ও স্বরূপ, মনের গঠনে পরিবেশের প্রভাব, সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার ব্যক্তি-মানসের সম্পর্ক—এক কথায় সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে সমালোচকদের মধ্যে দার্শনিক বিবাদ রয়েছে। মোট কথা এই যে, এখনও অনেকে বস্তুবাদী দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ ও জীবন ব্যাখ্যা করতে কুণ্ঠা বোধ করে থাকেন, প্রতিভাকে বিধিদত্ত শক্তি এবং সৃষ্টিকে দৈবপ্রেরণার ফল ব'লে মনে করেন এবং তা করেন ব'লেই ঐতিহাসিক সমালোচনা-পদ্ধতি অবলম্বন করতে রাজি হন না—বৈজ্ঞানিক সমালোচনা-পদ্ধতি পরিহার ক'রে থাকেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাট্যের পরিবেশ-সাপেক্ষতা প্রমাণ করবার অর্থাৎ রবীন্দ্রনাট্যের আলোচনায় ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক সমালোচনা-পদ্ধতি প্রয়োগ করবার অবকাশ এখনও আছে। এই প্রবন্ধে আমি সামান্যভাবে সেই চেষ্টাই করেছি।

তবে এখানেই ব'লে রাখতে চাই—সৃষ্টিকে পরিবেশ-সাপেক্ষ বা স্রষ্টাকে সমাজনিয়ন্ত্রিত বললেই সৃষ্টির বা স্রষ্টার মহিমা ক্ষুণ্ণ করা হয় না। রবীন্দ্রনাট্যের আলোচনায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রয়োগ করছি ব'লে কেউ যেন এ কথা মনে না করেন যে আমি রবীন্দ্র-প্রতিভার অসাধারণত্ব অস্বীকার করছি—রবীন্দ্রনাথের সুদুর্লভ প্রজ্ঞাকে—জ্ঞান-প্রেম-কর্মের বিভূতিকে আমি ছোট করবার চেষ্টা করছি। বরং এর বিপরীত কথাই সত্য—আমি দেখাতে চাই যে, যে সৃষ্টির দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না—সেই বিস্ময়কর সৃষ্টিরাজি সামাজিক মানুষ রবীন্দ্রনাথেরই মনের কাজ—মানুষ রবীন্দ্রনাথেরই জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছাবৃত্তির সংযোগে তৈরি—তারা কোন অতিপ্রাকৃত দৈবসত্তার প্রেরণার ফল নয়—দৈব ক্রিয়াকলাপ নয়। রবীন্দ্রনাথ কোন দেবতার ইচ্ছাপূরণের উপায় বা 'নিমিত্ত মাত্র' নন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কর্তা—মানুষেরই জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছাশক্তির এক বিস্ময়কর অভিব্যক্তি। আমি মনে করি, রবীন্দ্রনাথকে দৈব-প্রেরণাধীন না ক'রে, স্বাধীন ব'লে স্বীকার করলেই তাঁকে বেশী সম্মান দেওয়া হয়। রবীন্দ্র-বাণীকে আমি 'রবীন্দ্রনাথের'ই বাণী হিসাবে দেখতে চাই, 'দৈববাণী' বলতে চাইনে—রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে আমি কোন দেবতাকেই ভাগ বসাতে দিতে চাইনে।

রবীন্দ্রনাথে আমি 'মানব-মহিমার ঈশ্বরকে' দেখতে চাই,—দেখাতে চাই কিন্তু কোন অতিপ্রাকৃত জগদীশ্বরের লীলা আরোপ করতে চাইনে।

কেন চাইনে, সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা ব'লে নেওয়া দরকার। কারণ, আমি আশা করি এই দু'একটি কথা শুনলে এবং বুঝলে পাঠকদের পক্ষে প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় গ্রহণ করা সহজসাধ্য হবে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, আমাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কার এখনও বদ্ধমূল হয়নি এবং তা হয়নি ব'লে আমাদের দার্শনিক দৃষ্টিতে নতুন আলো দেখা দেয়নি—আমাদের অনেকেই এখনও সেই অতি-পুরোনো ধর্মশাস্ত্রের বচন আঁকড়ে পড়ে আছেন। বলা বাহুল্য, ধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। মানবসভ্যতার অতি-শৈশবে যে অতিপ্রাকৃত-চেতনার বা অনুমানের ভিত্তির উপরে ধর্মদর্শন গড়ে উঠেছিল, বিজ্ঞান আজ সেই ভিত্তিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দিয়েছে। ধর্মদর্শনের আরম্ভ ও শেষ অতিপ্রাকৃত সত্তার স্বীকরণে, বিজ্ঞানের আরম্ভ অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্বীকারে। এ কথা আমাদের মানতেই হবে যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের তাৎপর্য মানতে গেলে, প্রাচীন ধর্ম-দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি—তাতে সাকার ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত হোন আর নিরাকার ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠিত হোন—মানা চলে না। গোঁজামিল দিয়ে চলার কথা বলছিনে, অনেকেই আমরা সেইভাবেই চলে থাকি, একই নিঃশ্বাসে বিজ্ঞান এবং ধর্মসূত্র আউড়ে থাকি। আমি বলছি সেই চলার কথা—সুসঙ্গত একটি চিন্তাতন্ত্রের কথা। স্বীকার করতেই হবে—বৈজ্ঞানিক সংস্কার বদ্ধমূল হওয়ার অর্থ—ধর্ম-দর্শনের সংস্কার বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। যদি কোন বৈজ্ঞানিকের তা না হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে বৈজ্ঞানিক তাঁর শৈশব-সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

বৈজ্ঞানিক সংস্কার বলতে কি বুঝায়, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে, যেহেতু বিজ্ঞান কোন অতিপ্রাকৃত সত্তা স্বীকার করে না—বিজ্ঞান কোন সাকার বা নিরাকার কোন ঈশ্বর বা বিধাতাপুরুষ স্বীকার করে না সেইহেতু বৈজ্ঞানিক জগৎ ও জীবনলীলা ব্যাখ্যা করতে, দৈবশক্তি বা দৈবপ্রেরণার কথা উল্লেখ করতে পারেন না; প্রাকৃত শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কোন শক্তি আরোপ করতে পারেন না। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে এই জগৎ—দেশকালমানাশ্রয়ী এক মহাবিবর্তন প্রবাহ, সেই বিবর্তনের ফলেই অজৈব ও জৈব জগতের বিচিত্র বিকাশ ঘটেছে, এবং আজও ঘটছে। বিবর্তনের বিশেষ এক পর্যায়ে অজৈব

জগৎ থেকে জৈব জগতের উদ্ভব ঘটেছিল এবং একটি বিশেষ পর্যায়ে জীবজগৎ থেকে মনুষ্যজগৎ উদ্ভূত হয়েছিল। বৈজ্ঞানিকের কাছে—জীবন, পরিবেশের সঙ্গে অবিরাম অভিযোজন। অভিযোজন-চেষ্টা থেকেই জীবনের সব কিছু এসেছে। জীবের যত আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সমস্তই অভিযোজন-চেষ্টার পরিণাম। চিন্তাবৃত্তি এবং কল্পনাবৃত্তি অভিযোজনেরই উপায়-বিশেষ। মানুষের চিন্তা এবং কল্পনা—তার সমস্ত দর্শনবিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য, পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে গিয়েই জীবনযাপনের উপায় হিসাবেই গড়ে উঠেছে। দর্শনে-বিজ্ঞানে মানুষ তার পরিবেশের অভিজ্ঞতাকে সূত্রাকারে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, শিল্পে সে পরিবেশের অভিজ্ঞতাকে উপভোগ্য করতে গোষ্ঠীর কাম্য বিষয়কে সরবরাহ করতে তথা গোষ্ঠীকে অধিকতর অভিযোজনক্ষম করতে চেষ্টা করছে।

নিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিক এই দৃষ্টিতেই মানুষের দর্শনবিজ্ঞানের ও শিল্পের সাধনাকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। বৈজ্ঞানিক সমালোচনা-পদ্ধতি অবলম্বন করলে আমাদেরও এই দৃষ্টিতে সবকিছু বিচার করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্য-শিল্প-সাধনাকে এই দৃষ্টি নিয়ে বিচার করতে গেলে, আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ যেসব নাটক লিখেছেন তাতে তাঁর অভিযোজন-প্রচেষ্টাই ব্যক্ত হয়েছে, তাঁর নাটকে পরিবেশের চাহিদায় তিনি যেভাবে সাড়া দিয়েছেন সেই ভাবটিই প্রকাশ পেয়েছে ; তাঁর নাটকে যে চিন্তা বা দার্শনিক ভাবনা ও দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে তা ঐ যুগেরই দার্শনিক সমস্যাকে, রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক সংস্কারকে প্রতিফলিত করেছে এবং সেই চিন্তায়, রবীন্দ্রনাথ বিশেষ একটি পক্ষে যোগ দিয়েছেন এবং অন্য পক্ষকে আক্রমণ করেছেন—এক কথায় তিনি পরিবেশের সঙ্গেই বুঝাপড়া করার চেষ্টা করেছেন। হিসাব করে দেখিয়ে দিতে হবে—কোন্ নাটকে কি পরিমাণে বাহ্যিক প্রেরণা এবং কি পরিমাণে আভ্যন্তরিক প্রেরণা মিশেছে—কোন্ নাটকে পরিবেশের চাহিদা অর্থাৎ বাহ্যিক প্রেরণা প্রবল, আর কোন্ নাটকে আত্মপ্রকাশের তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা প্রবল হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই বলতে চাই বাহ্যিক প্রেরণা এবং আভ্যন্তরিক প্রেরণা ( রবীন্দ্রনাথ নিজেই শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন )—এই দুটি কথার তাৎপর্য ভালো ক'রে বুঝতে না পারলে, ভুল বুঝার সম্ভাবনা আছে। অনেকেই ভাবতে পারেন যেসব নাটক বাহ্যিক প্রেরণায় লেখা, সেখানেই শুধু পরিবেশ-সাপেক্ষতা আছে, আর যেসব নাটক নিজের মনের

বিশেষ কোন কথা বা আবেগ ব্যক্ত করার জন্য লেখা সেখানে কোনরূপ পরিবেশ-সাপেক্ষতাই নেই—সেই সমস্ত সৃষ্টি পরিবেশ-নিরপেক্ষ। আগেই বলেছি—ব্যক্তিজীবন পরিবেশের সঙ্গে অবিরাম বুঝাপড়ার ইতিহাস, পরিবেশ-সম্পর্ক নেই এমন জীবন দেশকালাতীত সত্তার মতোই অসৎ। ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষ দেশ-কাল-সমাজের অন্তর্গত এবং ব্যক্তিমন দেশ-কাল-সমাজের জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তিমন বিশিষ্ট বা স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু পরিবেশ-সম্পর্কহীন নয়। বিষয়ের ধারণাতেই তার জ্ঞান, বিষয়কে নিয়েই তার আবেগ, বিষয়কে পাওয়ার কামনা ও সাধনাতেই তার ইচ্ছা এবং সেই বিষয় পরিবেশেরই নামান্তর। সুতরাং ব্যক্তিমনের যে বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ অনুভব এবং বিশেষ ইচ্ছা তারাও পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মনে রাখতে হবে—বিষয়কে জ্ঞানে-অনুভবে পেতে চায় ব'লেই—বিষয়-সাপেক্ষ ব'লেই আত্মাকে বলা হয়েছে 'বিষয়ী'। বিষয়শূন্য বিষয়ী নেই—পরিবেশ-সম্পর্কহীন ব্যক্তিমন নেই। মনে রাখতে হবে—পরিবেশই ব্যক্তিমনে প্রবেশ ক'রে, ব্যক্তির জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার অঙ্গীভূত হয়ে—আভ্যন্তরিক প্রেরণার রূপ ধারণ করে। আপাতদৃষ্টিতে আভ্যন্তরিক প্রেরণাকে যত ব্যক্তিগত ব'লেই অর্থাৎ যত পরিবেশ-নিরপেক্ষ ব'লে মনে হোক, আসলে তা তত ব্যক্তিগত বা পরিবেশ-নিরপেক্ষ নয়। তাতে ব্যক্তির পরিবেশ-সম্পর্কেরই বিশেষ রূপ বা উপলব্ধি ব্যক্ত হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে—পাপতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব—যত তত্ত্বই ব্যক্তির অভ্যন্তরে থাক, সবই আসে পরিবেশ থেকে—এবং পরিবেশের সঙ্গে নতুন বুঝাপড়ার চেষ্টা থেকে। এদের প্রেরণায় যখন কেউ কিছু বলেন বা লেখেন তখন পরিবেশ-নিরপেক্ষ কোন কাজ করেন না।

মুখবন্ধস্বরূপ এই কয়টি কথা ব'লে—এবার আমি রবীন্দ্রনাট্যের পরিবেশ-সাপেক্ষতা নির্ধারণ করতে চেষ্টা করছি। রবীন্দ্রনাথের জীবনী এবং রবীন্দ্রমানসের গঠন সম্বন্ধে এবং রবীন্দ্রনাথের পরিবেশের (অর্থনৈতিক+রাজনৈতিক+সামাজিক+সাংস্কৃতিক) প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবার অবকাশ এখানে নেই। এ কথা ঠিক বটে যে পরিবেশ-সাপেক্ষতাই যেখানে বিচার্য বিষয় সেখানে ব্যক্তি-মানসের এবং পরিবেশের বিশেষ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু সেই বিশেষ পরিচয় দিতে গেলে যে একখানি ছোটখাটো গ্রন্থের পরিসর আবশ্যক সে-কথাও, আশা করি, সকলে স্বীকার করবেন। আমি ধরে নিচ্ছি পাঠকরা মোটামুটি সব তথ্যই জানেন এবং বিশেষ বিশেষ নাটকের আলোচনার

সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ করলেই তাঁরা আসল কথাটি ধরতে পারবেন। অতি-জিজ্ঞাসু পাঠককে আমি লেখকের 'রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থের 'রবীন্দ্র-যুগ' এবং 'রবীন্দ্রমানস' এই দুটি অধ্যায় পড়ে নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আলোচনার প্রারম্ভে আমি রবীন্দ্র-নাট্যরচনার একটি কালানুক্রমিক তালিকা পাঠকের চোখের সামনে রাখতে চাই। পাঠক স্বচক্ষে দেখতে পাবেন—রবীন্দ্রনাথ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নাটক রচনা করেছেন এবং করেছেন তাঁর বাহ্যিক এবং—আভ্যন্তরিক প্রেরণার বশেই। এও দেখতে পাবেন যে যত সংখ্যায়, তত মৌলিক, বা নতুন রচনা নয়। রবীন্দ্রনাথ একাধিক পুরাতন নাটককে সংস্কৃত ক'রে নতুন নামে প্রকাশ করেছেন।

তালিকা :

১। ১৮৮১ — বাল্মীকি-প্রতিভা
২। " — রুদ্রচণ্ড
৩। ১৮৮২ — কালমৃগয়া
৪। ১৮৮৪ — নলিনী
৫। " — প্রকৃতির প্রতিশোধ
৬। ১৮৮৮ — মায়ার খেলা
৭। ১৮৮৯ — রাজা ও রানী
৮। ১৮৯০ — বিসর্জন
৯। ১৮৯২ — চিত্রাঙ্গদা
১০। " — গোড়ায় গলদ
১১। ১৮৯৪ — বিদায় অভিশাপ
১২। ১৮৯৬ — মালিনী
১৩। ১৮৯৭ — বৈকুণ্ঠের খাতা
১৪। ১৯০৭ — হাস্যকৌতুক ; ব্যঙ্গকৌতুক
১৫। ১৯০৮ — প্রজাপতির নির্বন্ধ
১৬। " — শারদোৎসব
১৭। " — মুকুট
১৮। ১৯০৯ — প্রায়শ্চিত্ত
১৯। ১৯১০ — রাজা

২০। ১৯১২ — ডাকঘর

২১। " — অচলায়তন

২২। ১৯১৬ — ফাল্গুনী

২৩। ১৯১৮ — গুরু ( অচলায়তন )

২৪। ১৯২০ — অরূপরতন ( রাজা )

২৫। ১৯২১ — ঋণশোধ ( শারদোৎসব )

২৬। ১৯২২ — মুক্তধারা

২৭। ১৯২৩ — বসন্ত

২৮। ১৯২৫ — গৃহপ্রবেশ

২৯। ১৯২৬ — চিরকুমার সভা

৩০। " — শোধবোধ

৩১। " — নটীর পূজা

৩২। " — রক্তকরবী

৩৩। ১৯২৭ — ঋতুরঙ্গ

৩৪। ১৯২৮ — শেষরক্ষা ( গোড়ায় গলদ )

৩৫। ১৯২৯ — পরিত্রাণ ( প্রায়শ্চিত্ত )

৩৬। " — তপতী ( রাজা ও রানী )

৩৭। ১৯৩১ — নবীন

৩৮। " — শাপমোচন

৩৯। ১৯৩২ — কালের যাত্রা

৪০। ১৯৩৩ — চণ্ডালিকা

৪১। " — তাসের দেশ

৪২। " — বাঁশরী

৪৩। ১৯৩৪ — শ্রাবণগাথা

৪৪। ১৯৩৬ — চিত্রাঙ্গদা [ নৃত্যনাট্য ]

৪৫। ১৯৩৮ — চণ্ডালিকা

৪৬। " — মুক্তির উপায়

৪৭। ১৯৩৯ — শ্যামা

এবার একে একে এই নাট্যরচনাগুলির বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রেরণা-এক কথায়, পরিবেশ-সাপেক্ষতা নিরূপণ করা যাক।

প্রথম নাটিকা—'বাল্মীকি-প্রতিভা'।

এই নাটিকা-রচনার বাহ্যিক প্রেরণা—'বিদ্বজ্জনসমাগম সভা'র বা ভারতী-উৎসবের তাগিদ। ১২৮১ সালের ৬ই বৈশাখ এই সভা স্থাপিত হয় এবং প্রথম অধিবেশন থেকেই আনন্দানুষ্ঠান কার্যসূচীতে স্থান পায়। এই বাহ্যিক প্রেরণাই বিষয়বস্তু নির্বাচনকেও প্রভাবিত করেছে। ভারতী-উৎসবে বাল্মীকির কবিত্বলাভ—"কবিতার জন্মবৃত্তান্ত" অপেক্ষা উপযুক্ত বিষয় আর কি হ'তে পারে? এই বিষয়বস্তুটি অন্য কারণেও রবীন্দ্রনাথের চিত্ত আকর্ষণ করেছিল। প্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায়—"এই কাব্যের ( সারদামঙ্গল—১২৮৭ ) আরম্ভ সর্গ হইতে বাল্মীকি সম্বন্ধীয় গীতিনাট্য রচনার ভাব রবীন্দ্রনাথের মনে উদিত হয়"। সারদামঙ্গল সুরে বর্ণনা, বাল্মীকি-প্রতিভা 'নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয়'—এই হিসাবে 'সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা'। কিন্তু বাল্মীকি-প্রতিভা 'কবিতার জন্মবৃত্তান্ত' বা 'সংগীতের নূতন পরীক্ষা' যাই হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধেরও নিদর্শন। এই নাটিকায় রবীন্দ্রনাথ শুধু যে প্রকাশতত্ত্ব বা শিল্পদর্শনকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন তা নয়, ইয়োরোপীয় কাব্যাদি প'ড়ে এবং গুরুস্থানীয়দের কাছ থেকে কাব্যের ব্যাখ্যাদি শুনে, ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে তিনি যে ধারণা করেছিলেন সেই ধারণাটিকেও তিনি বাল্মীকি-কাহিনীর মধ্যে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। রিপুর তাড়নায় মানুষ স্বভাব হারিয়ে অপ্রকৃতিস্থ ও বিকৃত হয়, একদিন স্বভাবকে ফাঁকি দেওয়ার ফাঁকি ধরা প'ড়ে আত্মা আর্তনাদ করে এবং আত্মহননের অসহ্য বেদনায় শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা ক'রে নিষ্কৃতি লাভ করে। এই ধারণাটি রবীন্দ্রনাথের মনে প্রথম থেকেই বদ্ধমূল হয়েছিল এবং একাধিক নাটকে তিনি ঐ ধারণাটি ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই ট্র্যাজেডি-বোধ ছাড়াও এই নাটিকায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের বা ধর্মদর্শনেরও আভাস ফুটে উঠেছিল। প্রেম ও প্রতাপের যে দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাটকের উপজীব্য হয়েছিল,—সেই দ্বন্দ্বটি মূলতঃ ধর্মদর্শনের দ্বন্দ্ব এবং ঐ যুগের একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মনৈতিক সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন এবং তা ছিলেন ব'লেই প্রাক্-পৌরাণিক উপনিষদ-যুগের নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাকেই—শান্ত প্রেম-ভক্তিকেই ধর্মীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন; পৌরাণিক সাকার ঈশ্বরের উপাসনাকে, বিশেষতঃ শাক্ত উপাসনাকে ধর্মবোধের বিকৃতি ব'লেই মনে করতেন। বৈষ্ণব ধর্ম প্রেমভিত্তিক এবং বৌদ্ধ ধর্ম করুণা-ভিত্তিক এবং অহিংসাভিত্তিক ব'লে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব এবং বৌদ্ধ আদর্শকে নিজের

ধর্মাদর্শের সঙ্গে যথাসম্ভব মিলিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু শাক্তধর্মকে তিনি ধর্মের বিকৃতি ব'লেই মনে করতেন। এই মনোভাবটি নানা রূপে তাঁর রচনায় ব্যক্ত হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তাঁর নাটকের অধিকাংশ বিকৃত বা অপ্রকৃতিস্থ চরিত্র শক্তির উপাসক, যেমন বাল্মীকি-প্রতিভার বাল্মীকি কালী-উপাসক, রুদ্রচণ্ডের রুদ্রচণ্ড কালভৈরবের উপাসক, বিসর্জন নাটকের রঘুপতি কালী-উপাসক, মালিনী নাটকের ক্ষেমংকর শক্তি-সাধক—পৌরাণিক ধর্মের সেবক। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের প্রতাপাদিত্য শাক্ত। উল্লিখিত নাটকে রবীন্দ্রনাথ বিকৃত ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন—এ কথা যেমন অবশ্যস্বীকার্য, তেমনি এ কথাও অস্বীকার করা চলেনা যে, ঐ সংগ্রামে সমসাময়িক সমাজের ধর্ম-দর্শনের দ্বন্দ্বই ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শনের মূল কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই ব'লে গেছেন ; বলেছেন—"আমার থাকাটা শক্তির প্রকাশ না প্রীতির প্রকাশ এইটে যে যেমন মনে করে সে সেইভাবে জীবনের লক্ষ্যকে স্থির করে। ··· শক্তির জগতে আমার অহংকারের যেদিকে গতি, প্রীতির জগতে আমার অহংকারের গতি ঠিক উল্‌টো দিকে।" [ কালান্তর—বাতায়নিকের পত্র ]। বাল্মীকি-প্রতিভা নাটিকার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের স্পর্শ লেগেছে এবং লেগেছে সেখানেই যেখানে তিনি দস্যু বাল্মীকিকে কালী-উপাসক ক'রে দাঁড় করিয়েছেন।

দ্বিতীয় নাটক—'রুদ্রচণ্ড'।

এই নাটিকার রচনাকাল সম্বন্ধে প্রভাতবাবু লিখেছেন—"··· তাহার রচনাকাল সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ" এবং প্রেরণা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—"আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বোলপুরে আসিয়া 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামে যে কাব্য রচনা করেন ( ১৮৭৩ মার্চ ), এই রুদ্রচণ্ড তাহারই রূপান্তর। ··· আমাদের মনে হয় বিলাত যাইবার পূর্বে তাড়াতাড়িতে নূতন কিছু সৃষ্টি-প্রেরণার অভাবে পুরাতন রচনাটিকে নূতন কলেবরে সাজাইয়া 'জ্যোতিদাদা'কে উপহার দেন।" জ্যোতিদাদাকে উপহার দেন নিশ্চয়ই অভিনয়ের আশা নিয়ে—এবং নিজের নাট্যকার খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই। বাড়ীর বা আত্মীয়-স্বজনের চাহিদা মেটাতেই তিনি নাটিকাখানি লিখেছিলেন। সুতরাং ঐ চাহিদাই এক্ষেত্রে বাহ্যিক প্রেরণা। আভ্যন্তরিক প্রেরণা খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে এই নাটিকায়, রবীন্দ্রনাথ 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' কাহিনীকে উপলক্ষ্য ক'রে অন্য একটি লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন। যদিও এ কথা ঠিক, এই সময়ে

রবীন্দ্রনাথ "একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস" করতেন, কিন্তু এ কথাও মিথ্যা নয় যে, বিদেশী কাব্য-কাহিনী-পাঠের সংস্কার থেকে তাঁর মনে কতকগুলি ছাঁচ গড়ে উঠেছিল এবং সেই ছাঁচে তিনি দেশীয় কাহিনী ঢালাই করতে চেষ্টা করেছিলেন। 'বনফুল' কাব্যের প্রেরণা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রভাতবাবু যে-কথা বলেছেন তা স্মরণীয়—"সে-যুগের বহু কবির কাব্যপ্রেরণার উৎস ছিল ইংরেজি কাব্য, ইংরেজি আদর্শ। বনফুল সেই আদর্শে গড়া; উহার নায়ক-নায়িকাদের প্রেমকাহিনীর পটভূমি পাশ্চাত্ত্য সমাজ।" রুদ্রচণ্ড-নাটিকার পরিকল্পনাতেও মনে হয় ঐরূপ কোন ছাঁচের প্রভাব আছে। তা ছাড়াও সঙ্গে সঙ্গে আছে—রবীন্দ্রনাথের ধর্মনৈতিক আদর্শের স্পর্শ এবং ট্র্যাজেডির একটি স্পষ্ট ধারণা। এখানেও প্রতিহিংসাপরায়ণ রুদ্রচণ্ড কালভৈরব-প্রতিমার উপাসক—শুধু রাজ্যভ্রষ্টই নয়, মনুষ্যত্বভ্রষ্টও। অহংকার তার বিকৃত—প্রতিশোধই ছিল ধ্যান-জ্ঞান—রুদ্রচণ্ডই তার একমাত্র পরিচয়। পৃথিবীতে আর কিছুই তার ছিল না। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুতে 'শূন্য হয়ে গেল সমস্ত জীবন'। 'রুদ্রচণ্ড' আত্মহত্যা ক'রে আত্মার শূন্যতা দূর করতে চেষ্টা করল।

যে বিকৃতবুদ্ধির বা অহংকারের প্রেরণায় মানুষ অন্ধ আবেগে শক্তির উপাসনা করে তথা মানুষের প্রকৃত স্বভাবকে রিক্ত ক'রে তোলে, তা শেষপর্যন্ত মানুষের জীবনকে শূন্যতার মহাসংকটের মধ্যে নিয়ে যায়—আত্মার সমূহ বিনাশ ঘটায়। শক্তি-উপাসনা মানুষকে অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে, জ্ঞানময়-প্রেমময় স্বভাবের হানি ঘটিয়ে জীবনের সামঞ্জস্য নষ্ট ক'রে দেয়—এই নাটিকায় রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাকেই পরোক্ষভাবে বলতে চেয়েছেন, যদিও প্রত্যক্ষভাবে আত্মার স্বভাব-হানিজনিত শূন্যতার ট্র্যাজেডিকেই রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।

তৃতীয় নাট্যরচনা—'কালমৃগয়া'।

এই নাটিকার বাহ্যিক প্রেরণা—'বিদ্বজ্জনসমাগম সভা'র বার্ষিক অধিবেশন। আভ্যন্তরিক প্রেরণা—'সংগীতের নূতন পরীক্ষা'—বাল্মীকি-প্রতিভার মতো 'সুরে নাটিকা'। এই নাটিকার "কয়েকটি গানের সুর (বনদেবীদের বিলাপে আইরিশ সুর) সম্পূর্ণ বিলাতী সুরে ঢালা"। তবে 'সংগীতের নূতন পরীক্ষা'র জন্য রবীন্দ্রনাথ যে কাহিনী বা বৃত্ত রচনা করেছেন তাতে রবীন্দ্র-মানসের কয়েকটি সংস্কার বেশ প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে—মানুষের সত্তা একদিকে প্রকৃতির সঙ্গে, অন্যদিকে মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে—এই ধারণাটি রবীন্দ্রনাথের মনে খুব অল্পবয়সেই

( কালিদাসের শকুন্তলা পাঠ করার ফলেই বোধ হয় ) স্থান ক'রে নিয়েছিল। 'বনফুল'-এর মধ্যে আমরা এই সংস্কারটির প্রথম অভিব্যক্তি দেখেছি। এখানে তা নাটিকার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।

চতুর্থ নাট্য—প্রকৃতির প্রতিশোধ।

এই নাটকখানি লেখা হয় কারোয়ারে। এই শৈলমালাবেষ্টিত নিভৃত এবং প্রচ্ছন্ন সমুদ্রবন্দর কারোয়ার রবীন্দ্রনাথের মনে 'আত্মকেন্দ্রিক বৈরাগ্যের' ছবি জাগিয়ে দিয়েছিল—এ অনুমান মিথ্যা নাও হতে পারে। তবে এ কথাটি পুরোপুরিই সত্য যে এইখানেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি'কে আক্রমণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর—"শেষ কথাটা এই দাঁড়াল শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায়, সেই যথার্থ পায়।" ( রবীন্দ্রনাথের নিজেরই মন্তব্য )। মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ ক'রে, সন্ন্যাসী হওয়া এবং শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ যে সত্যদর্শন হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি—তা কোন অহেতুক ব্যাপার নয় অথবা ব্রহ্মোপলব্ধির স্বাভাবিক পরিণামও নয়। ঐ যুগের প্রায় সকলেই বৈরাগ্যকে বর্জন করতে চেয়েছিলেন এবং চেয়েছিলেন সমাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদেই। জাতির ইহলোক-বিমুখতা তথা পলায়নী মনোবৃত্তি দূরীভূত না হ'লে জাতির মুক্তি নেই—পরাধীনতার অবসান ঘটবে না—এই মনোভাব থেকেই বৈরাগ্য-বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল—ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা দেখা দিয়েছিল। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে বৈরাগ্য-বিরোধিতা ব্যক্ত করেছেন তাতে পরিবেশের চাহিদাই ফুটে উঠেছে।

পঞ্চম নাটিকা—'নলিনী'।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহের পরে "আনন্দ-উল্লাসকে সম্পূর্ণভাবে সম্ভোগ করিবার জন্য একটি অভিনয় করিবার প্রস্তাব হইল ···" ; সেই প্রস্তাবই নলিনী গদ্য-নাটিকার বাহ্যিক প্রেরণা। কিন্তু নাটিকার আভ্যন্তরিক প্রেরণা 'ভগ্নহৃদয়'-এর এবং 'মায়ার খেলা'র আভ্যন্তরিক প্রেরণারই সমগোত্রীয়—জীবনতৃষ্ণা, বিশেষতঃ প্রেমতৃষ্ণার অন্তর্দাহ ব্যক্ত করার ব্যাকুলতা। যেমন 'কবি-কাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়'এ, তেমনি 'নলিনী', 'মায়ার খেলা' এবং 'রাজা ও রানী'তে রবীন্দ্রনাথ প্রেমতৃষ্ণার বিচিত্র রূপ ও পরিণতি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ইয়োরোপীয় রোমান্টিক কাব্য-কাহিনীর অভিজ্ঞতা এবং জীবনের অভিজ্ঞতা এক হয়ে এই

কাহিনীগুলি রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনী পাঠ করলেই এই রচনার প্রেরণা সম্যক উপলব্ধি করা যাবে। বিলাত যাওয়ার আগে, বিলাতে থাকাকালে এবং বিলাত থেকে ফিরে আসার পরে রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রেমের যে উপলব্ধি হয়েছিল তা এই কাহিনীগুলির সঙ্গে মিশে আছে। প্রেমের ও মোহের স্বরূপ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমের উপলব্ধিকেই [ অবদমিত বাসনাকেই ( ? ) ] ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

ষষ্ঠ নাটিকা—'মায়ার খেলা'।

বাহ্যিক প্রেরণা—'সখী সমিতি'র চাহিদা। এই বাহ্যিক প্রেরণার দ্বারা নাটিকার রূপটি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এতে 'নাট্য' মুখ্য নহে, 'গীত'ই মুখ্য। 'মায়ার খেলা' "নাট্যের সূত্রে গানের মালা"। আভ্যন্তরিক প্রেরণা সম্বন্ধে যা বলার আগেই বলেছি।

সপ্তম নাটক—'রাজা ও রানী'। ( 'তপতী' এই নাটকের সংস্কৃত রূপ, সুতরাং পৃথক আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই )। 'নলিনী', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি নাটকে সামাজিক পরিবেশে প্রেমতৃষ্ণার শোচনীয় আর্তি দেখানো হয়েছে, 'রাজা ও রানী' নাটকে একটি ঐতিহাসিককল্প পরিবেশে সেই একই প্রেমতৃষ্ণার ট্র্যাজেডি উপস্থাপিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তখন সোলাপুরে এবং 'মানসী'র দ্বারদেশে। তাঁর মনের অবস্থা তখন—"কিছু নেই পোড়া ধরণী মাঝারে বোঝাতে মর্মজ্বালা"। এই মর্মজ্বালাই বিক্রমদেবের মর্মজ্বালা হয়ে ব্যক্ত হয়েছে। বিক্রমদেবের শেষ আর্তনাদে কবির মর্মদাহই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। অবশ্য নাটকের বহিরঙ্গে—পরোক্ষ এবং আনুষঙ্গিক ভাবে বিদেশী কুশাসনের দিকে যে তীব্র শ্লেষের কটাক্ষ নিক্ষেপ করা হয়েছে তাও লক্ষণীয়।

অষ্টম নাটক—'বিসর্জন'।

বিসর্জন নাটকের বাহ্যিক প্রেরণা—বাড়ীর ছেলেদের, বিশেষতঃ সুরেন্দ্রনাথের আবদার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন নানা কাজে ব্যস্ত। নতুন আখ্যানবস্তু কল্পনার তাঁর সময় ছিল না। তাই রাজর্ষি উপন্যাসের গল্পাংশ নিয়ে নাটক রচনা করেছিলেন। যে আভ্যন্তরিক প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছিলেন তার সূচনা আমরা অনেক আগেই লক্ষ্য করেছি এবং দেখিয়েছি যে সে একটা ধর্মনৈতিক বিশেষ সংস্কার। সকলেই স্বীকার করেছেন—"বিসর্জন আমাদের ধর্মের একটা অর্থবিহীন নিষ্ঠুর সংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ" [ নীহাররঞ্জন রায় ]। বাস্তবিকই 'বিসর্জন' প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে—

হিংসাত্মক আচারের বিরুদ্ধে—এক কথায় শাক্ত-উপাসনা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র এবং সার্থক একটি প্রতিবাদ। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে নাটকখানিতে সমসাময়িক সমাজেরই ধর্মনৈতিক দ্বন্দ্বকে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং নাট্যকার বিশেষ একটি পক্ষ অবলম্বন করেছেন। সাকার এবং নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা নিয়ে তখন সমাজে একটি তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল; ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা ছিলেন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক—শান্ত ও ভক্তি-সমাহিত চিত্তে তাঁরা ব্রহ্মের উপাসনা করতেন। অন্যপক্ষে ছিলেন সাকার দেবতার উপাসক বৈষ্ণব এবং শাক্তরা—বিশেষ ক'রে শাক্তরা। এই দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। নিরাকার-উপাসনা আধ্যাত্মিক চেতনার উন্নততর এবং সূক্ষ্মতর পর্যায় এবং সাকার-উপাসনা, বিশেষ ক'রে শাক্ত-উপাসনা স্থূলতর এবং নিম্নপর্যায়ের চেতনা—এ কথা স্বীকার ক'রে নিয়েও আমরা বলতে পারি—রবীন্দ্রনাথ বিসর্জন নাটকে স্থূল আচারকে—বিশেষতঃ শাক্ত-সম্প্রদায়কে আক্রমণ করেছিলেন—আধ্যাত্মিক চেতনার বিকৃতি (শাক্তরা স্বীকার করবেন না) দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ সাকার-উপাসনাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলেও, কোন নতুন পরাদর্শনে পৌঁছতে পারেননি—অতিপ্রাকৃতবাদী পরাদর্শনের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। দেবদেবীতে তাঁর বিশ্বাস না থাকলেও, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসত্তাকে মূল এবং পরম সত্তা ব'লে তিনি স্বীকার করেছিলেন।

নবম নাট্যরচনা—'চিত্রাঙ্গদা'।

এই নাট্যের বাহ্যিক প্রেরণা কোন অভিনয়-অনুষ্ঠানের তাগিদ কিনা, তা ঠিকভাবে জানা যায় না বটে, কিন্তু প্রেরণা অনুমান করতে তেমন বেশী কষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথের পরিবেশে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, নারীর মর্যাদা প্রভৃতি সর্বজন-আলোচ্য বিষয় ছিল। ইয়োরোপীয় নারী-সমাজ এবং আমাদের নারী-সমাজের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই ইয়োরোপীয় নারীর স্বাধীন সত্তা বা ব্যক্তিত্বকে বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। অনেকের কাছে নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা তখন বহুকাম্য ছিল। রবীন্দ্রনাথও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না নারীর চরিত্র-শক্তিকে নারী-জীবনের পরম গৌরব ব'লে মনে করতেন। তাই রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় "এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেকদিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল"। চিত্রাঙ্গদার কাহিনী রবীন্দ্রনাথের মনকে মূলতঃ ঐ কারণেই আকর্ষণ করেছিল। তার সঙ্গে অন্য একটি কারণও যুক্ত

হয়েছিল। সেই কারণটি—আদর্শ প্রেমের ধারণা,—'শকুন্তলা'য় ও 'কুমারসম্ভব'এ কালিদাস যে আদর্শ স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন সেই আদর্শের প্রেরণা। চিত্রাঙ্গদা নাটকের সূচনায় কবি নিজেই তা ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতির বুকে একদিকে "ফুলের রঙের মরীচিকা", অন্যদিকে "অপ্রগল্‌ভ ফলসম্ভার" দেখে হঠাৎ কবির মনে হয়েছিল—"সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে, সে তার রূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। ··· যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্র-শক্তি থাকে, তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল-জীবনের জয়যাত্রার সহায়। ··· সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী।"

দশম নাট্যরচনা—'গোড়ায় গলদ' ( শেষরক্ষা' )।

এই নাটকখানির বাহ্যিক প্রেরণা খুবই স্পষ্ট—'ভারতীয় সংগীত-সমাজ'-এর সভ্যদের চাহিদায় নাটকখানি লেখা। "ছত্রিশ বৎসর পর ( ১৩৩৫ ) সাতষট্টি বৎসর বয়সে কবি পাবলিক থিয়েটারে নাটকখানি অভিনয়ের উপযুক্ত করিবার জন্য নূতন করিয়া লিখিয়া দেন। ··· শেষের দিকে সকলেই সামলাইয়া রক্ষা পাইলেন, তাই ইহার নূতন নামকরণ করিলেন 'শেষরক্ষা'। এই নাটক লেখার আভ্যন্তরিক প্রেরণা কৌতুককর পরিস্থিতি এবং ব্যক্তি-আচরণের বাতিক-বিকৃতির সাহায্যে সমাজের সভ্য-সভ্যাদের মনে আমোদ উদ্রেক করা এবং শেষপর্যন্ত এই কথাটিই সভ্যদের শোনানো—'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে সেই আমাদের ভালো'।

একাদশ নাট্যরচনা—'বিদায়-অভিশাপ' ( ১৮৯৫ )।

কচ ও দেবযানী উপাখ্যান উপলক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ যে কথাটি ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন তা এই-সময়ে-লেখা চিঠিতে এবং প্রবন্ধে আভাষিত হয়েছিল। ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন—"আমি অনেকদিন থেকে ভেবে দেখেছি পুরুষরা কিছু খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সুসম্পূর্ণ। ··· তাদের মধ্যে কোন দ্বিধা কোন চিন্তা কোন মন এসে তাদের ছন্দোভঙ্গ করে দিচ্ছে না, কোন তর্ক এসে তাদের মিল নষ্ট করে দিচ্ছে না।"

পঞ্চভূতের মধ্যে শেষকালে ক্ষিতির মুখে যে টিপ্পনী বসিয়েছেন তাতেও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার গতিবিধি লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রভাতবাবুর ভাষায় বলি: "সেখানে আমাদের দেশের পুরুষের অকৃতার্থতার জন্য মেয়েকেই দায়ী

করা হয়েছে ; তাহাদের অন্ধ সংস্কার, তাহাদের আসক্তি ··· দেশের বক্ষে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া রাখিয়াছে।" প্রভাতবাবু বলেছেন—" 'বিদায়-অভিশাপ' কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ এই তথ্যটাই তত্ত্বাকারে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।" এর সঙ্গে এই কথাটিও যোগ করা যেতে পারে যে "পুরুষ যে বৃহত্তর আদর্শের জন্য, শ্রেয়ের জন্য প্রেয়কে ত্যাগ করিতে পারে" এই তত্ত্বটিকে রবীন্দ্রনাথ প্রচার করতে চেয়েছিলেন, শুধু প্রচারের জন্যই নয়,—চেয়েছিলেন কচের মতো আদর্শপ্রাণ মোহমুক্ত যুবক গড়ে তোলার আবেগেই।

দ্বাদশ নাট্যসৃষ্টি—'মালিনী'।

এই নাটকের প্রেরণা সম্বন্ধে নাট্যকার নিজেই অনেক কথা জানিয়ে দিয়েছেন। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রেরণা সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কথা বলা যায় যে, এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ নতুন ক'রে পৌরাণিক বা আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে—এক কথায় শাক্তধর্মের বিরুদ্ধে শৈল্পিক অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। বিসর্জন নাটকের সঙ্গে এর মিল খুবই অন্তরঙ্গ। বিসর্জনের পরিবেশে বৈষ্ণব আবহাওয়া এখানে বৌদ্ধ আবহাওয়া—এই যা পার্থক্য। উভয় নাটকেরই উদ্দেশ্য প্রেমমূলক ধর্মের মাহাত্ম্য স্থাপনা করা—শাক্তধর্মের বিকৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা। এই হিসাবে 'মালিনী' কবির ধর্মনৈতিক দ্বন্দ্বে বুঝাপড়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ত্রয়োদশ নাট্য—'বৈকুণ্ঠের খাতা' ( ১৮৯৭ ) ।

'সংগীত সমাজ'-এর চাহিদায় লেখা নাটিকা এবং 'গোড়ায় গলদ' যে উদ্দেশ্যে লেখা, সেই একই উদ্দেশ্যে—সভ্যদের আমোদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে লেখা।

'বৈকুণ্ঠের খাতা'র সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাট্যের প্রথম পর্ব শেষ। 'শেষ' বললাম এই কারণে যে, এই নাট্যরচনার সাত বছর পরে—রবীন্দ্রনাথ নাটক-রচনায় হাত দিয়েছিলেন। এই সাতবছর বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই পর্বেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয়েছিল এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে জাতির মনে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে নিজের সংসার, পত্রিকা-সম্পাদনা, বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যস্ত থাকলেও, রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে সরে ছিলেন না। যাই লিখুন, রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কোন নাটক লেখেননি। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়োরোপীয় শারাড্ (Charade)-জাতীয় নাট্যের অনুসরণে তিনি হাস্যকৌতুক-এর অন্তর্গত নাট্যগুলি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১৫টি কৌতুক-নাট্য এবং ৬টি ব্যঙ্গকৌতুক-নাট্য

শেষ করেছিলেন বটে, কিন্তু বড়দরের কিছু লিখতে চেষ্টা করেননি। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতনে যে ঋতু-উৎসব প্রবর্তিত হয়েছিল, সেই উৎসবের প্রবর্তনে নতুন একটি বাহ্যিক প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছিল। এই বাহ্যিক প্রেরণার ফলেই ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'শারদোৎসব' নাটক রচিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে নানা ঋতুনাট্য রচিত হয়েছিল। এইসব নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—" 'শারদোৎসব' থেকে আরম্ভ ক'রে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি যখন বিশেষ ক'রে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়াটা ঐ একই।"

ভিতরকার ধুয়াটা আভ্যন্তরিক প্রেরণার কথা এবং তা একদিক থেকে দেখলে যেমন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সহজ যোগে যুক্ত হয়ে ভূমাকে উপলব্ধির কথা, বিশ্বচ্ছন্দে যোগ দেওয়ার আহ্বান, তেমনি অন্যদিক থেকে একটি বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনের সম্পর্ককে দেখা। প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের যে নিগূঢ় যোগ আছে সেই যোগটি অনেক যুগের অনেক কবির মনকেই নাড়া দিয়েছে। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তা মানুষের মনে সাড়া না জাগিয়ে পারে না। এই পরিবর্তন চিরকাল কবির মনে সাড়া জাগিয়ে এসেছে। কালিদাস 'ঋতু-সংহার' কাব্য লিখে, ষড়ঋতুর ভাব ও রূপকে আমাদের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত ক'রে গেছেন। প্রাচীন ভারতের বসন্তোৎসবের মধ্যে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ স্পর্শ উপভোগ করার প্রবৃত্তিটি অতি স্পষ্টাকারেই চোখে পড়ে। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ঋতু-উৎসব আপাতদৃষ্টিতে যতোই প্রাচীন উৎসবের পুনঃপ্রবর্তন ব'লে মনে হোক না কেন, ঐ উৎসবের মূলে সূক্ষ্মতর ভাব-কল্পনা কাজ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের পরাদর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে—বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিশ্বরূপের যে খেলা চলছে, সেই খেলার ছন্দে যোগ দিয়ে বিশ্বরূপের নিত্যলীলার সঙ্গে যোগস্থাপনা করার প্রেরণা থেকেই এই উৎসবের পরিকল্পনা। তবে আর এক দিক থেকেও ঋতু-উৎসব প্রবর্তনের বাহ্যিক প্রেরণা খুঁজে দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মনে প্রথম এই উৎসব-কল্পনা জেগেছিল—এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে এ অনুমান একেবারে মিথ্যা হবে না যে—'বারো মাসে তেরো পার্বণের' সমাজের মধ্যে থেকে উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য ছেলেদের প্রাণ ব্যাকুল হবেই। হিন্দুসমাজে দেব-দেবীর পূজাকে কেন্দ্র ক'রে উৎসবের যে ধুম পড়ে যায়, বিশেষ ক'রে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, দোল, রথযাত্রা প্রভৃতি

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদ্দীপনায় হিন্দুসমাজের শিরায়-উপশিরায় আনন্দের যে তীব্র দোলা লাগে, ব্রাহ্মসমাজে উৎসবের অতো অবকাশ বা ধুম ছিল না। সুতরাং উৎসবের ঐ অভাব পূরণ করবার জন্যই যে শমীন্দ্রনাথ এবং পরে রবীন্দ্রনাথ ঋতু-উৎসব প্রবর্তন করেছিলেন, এ অনুমান একেবারে অমূলক নয়। যে যাই হোক, দার্শনিক প্রেরণা থেকেই করুন আর ধর্মনৈতিক প্রয়োজনেই করুন, ঋতুনাট্যগুলির পরিবেশ-সাপেক্ষতা সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। কারণ পরাদর্শনই হোক আর ধর্মদর্শনই হোক, সবই সমাজের-দেওয়া ধারণা বা সংস্কার। সেই ধারণাকে বা সংস্কারকে ব্যক্ত করার অর্থ পরিবেশেরই সঙ্গে বুঝাপড়া করার চেষ্টা। আশা করি, এর পরে ঋতুনাট্যগুলির বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রেরণা সম্বন্ধে পৃথক পৃথক আলোচনা আবশ্যক হবে না।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ আর একখানি নাটিকা লেখেন—নাম 'মুকুট'। এই নাটিকার বাহ্যিক প্রেরণা সম্বন্ধে এই উদ্ধৃতিটুকুই যথেষ্ট—"বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে 'বালক' পত্রে প্রকাশিত 'মুকুট' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত"। এই নাটিকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবসত্যটিই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে, শক্তিমত্তা-বীর্যবত্তা-বুদ্ধিমত্তার উপরে হৃদয়বত্তার আসন ; প্রকৃত জয় তাঁরই যিনি হৃদয়বান—সমস্ত হৃদয়ে তাঁর স্থায়ী অধিকার। বিসর্জন নাটকের গোবিন্দমাণিক্যে আমরা এই জয়ীরই এক রাজচক্রবর্তী রূপ দেখেছি। রবীন্দ্রমানসের একটি মৌলিক সংস্কারই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

এই সময়েই—শারদোৎসব নাটক লেখার কিছু আগেই—রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকখানি লেখেন। এই নাটকখানি লেখার বাহ্যিক প্রেরণা খুঁজতে গেলে দেখা যাবে—নাট্যকার এক ঢিলে অনেক পাখী মারবার চেষ্টা করেছিলেন। যে যে পাখী মেরেছিলেন, তারা সত্যিই মারার যোগ্য কিনা সে-বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে কোন লাভ নেই, আমরা শুধু দেখাতে চাই কোন্ কোন্ পাখী তিনি মেরেছিলেন। প্রথমতঃ, বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই—১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে যশোহরেশ্বরী-ভক্ত প্রতাপ-আদিত্যকে জাতীয় নেতার বা দেশপ্রেমিক বীরের গৌরবময় আসন দেওয়ার জন্য যে চেষ্টা দেখা দিয়েছিল, সেই চেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেননি। প্রতাপাদিত্যের ধর্মদর্শন এবং রাষ্ট্রশাসন উভয়ই হিংসার ভিত্তির উপরে স্থাপিত ছিল ব'লেই রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যের জীবনকে শ্লাঘ্য ব'লে মনে করতে পারেননি। প্রতাপাদিত্যকে উপলক্ষ্য ক'রে

শাক্ত আবেগের মাতামাতি—হিংসাকে ধর্মে পরিণত করার প্ররোচনাকে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্রয় দিতে পারেননি। দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক মুক্তি-সাধনায় তখনকার বিপ্লবীরা যে রুদ্রপন্থা গ্রহণ করেছিলেন—নরহত্যাকে—শত্রুর মুণ্ড-শিকারকে ধর্মীয় আবেগে পরিণত করতে চেষ্টা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঐ রুদ্রপন্থাকে প্রকৃত পথের মর্যাদা দিতে পারেননি—হিংসাকে বীরধর্মের আসনে বসাতে চাননি। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যে—রবীন্দ্রনাথ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন—নিজের দুর্বলতাকে গালভরা বুলি দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, তিনি আরো গভীর সত্যে পৌঁছতে চেষ্টা করেছিলেন—অসহিষ্ণু প্রাণের হিংস্র উৎক্ষেপ-বিক্ষেপের উপরে আস্থা না ক'রে—গণজাগরণের এবং গণদাবির উপরে জোর দিতে বলেছিলেন—রাজনৈতিক মুক্তি-সাধনাতেও অহিংসাকে উপায় হিসাবে প্রয়োগ করতে বলেছিলেন। ধনঞ্জয়ের মতো জাগ্রত চিত্তের নির্ভীক ও প্রাণপণ সংকল্পকেই মুক্তির পথ ব'লে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই প্রেরণাবশেই প্রায়শ্চিত্ত নাটক রচিত হয়েছিল এবং এই প্রেরণা, বলা বাহুল্য, পরিবেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার সঙ্গে বুঝাপড়ারই চেষ্টা। এই প্রসঙ্গেই ব'লে রাখা যাক—রবীন্দ্রনাথ রুদ্রপন্থাকে যে সব সময়েই নিন্দা করেছেন তা নয়। যখন "বীরের দল ইতিহাস-বিধাতার পূজায় তাদের রক্তপদ্মের অর্ঘ্য নিয়ে চলেছে" ; যখন "কামানের গর্জনে মনুষ্যত্বের জয়সংগীত বেজে উঠেছে"—"মরণযজ্ঞে প্রাণের মহোৎসব হয়েছে" তখন রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস-বিধাতার ইচ্ছাকে সানন্দে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ কথাও ঠিক, কার্যকালে তিনি রুদ্রের তাণ্ডবে যোগ দিতে পারেননি। হিংসা ও উন্মত্ততাকে তিনি অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করতেন ব'লেই পারেননি।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকের রাজনৈতিক অভিযোজন-চেষ্টার পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরাদর্শনকে নাটকাকারে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টারই মধুর ফল—'রাজা' (১৯১০)। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ অরূপ-তত্ত্বে মগ্ন ছিলেন। শান্তিনিকেতনের উপদেশমালা এবং গীতাঞ্জলিতে তাঁর অরূপ-আরাধনার ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছিল। 'রাজা' নাটকের প্রেরণা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবু লিখেছেন—"শান্তিনিকেতনের উপদেশমালায় ও গীতাঞ্জলির গীতধারায় কবিচিত্তের অনেক কথা প্রকাশ পাইলেও সকল কথা নিঃশেষিত হয় নাই। ব্রহ্মের অনুভূতি এত বিচিত্র যে তাহা নানা রীতি ও ভঙ্গিতে

প্রকাশ ব্যতীত সাধকের তৃপ্তি হয় না। বিশ্বের রসরহস্য সাধক ও সাহিত্যিকের অন্তরে নানা রূপকের রূপে প্রকাশ পায় ... 'রাজা' নাটক সেই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অন্যতম প্রকাশ।" ( রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ২৩৩ পৃঃ )। দার্শনিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে, দেখা যাবে—প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ নিরাকার-ব্রহ্ম-উপাসনাকেই এই নাটকে নতুন আবেগে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানের চক্ষু 'বুদ্ধি' যে পরমতত্ত্বকে দেখতে পারে না, মর্মদৃষ্টি ছাড়া পরমকে দেখা যায় না, মর্মে ছাড়া তাঁকে পাওয়া যায় না—এই কথাটিই প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টাকে ইয়োরোপের বস্তুবাদ-বিরোধী চেষ্টার সঙ্গে এক ক'রে দেখলে, এই কথা বলা যেতে পারে যে—যে বস্তুবাদের বিরুদ্ধে ইয়োরোপে তখন যে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ দেখা দিয়েছিল—'ইণ্টেলেকচুয়ালিজম'-এর উপরে 'ইণ্টুইশানিজম'কে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রচেষ্টা হয়েছিল—ভারতের রবীন্দ্রনাথ 'রাজা' নাটক লিখে সেই প্রতিবাদকেই সমর্থন ও পুষ্ট করেছিলেন—ঐকান্তিক আবেগে 'ইণ্টুইশানিজম'-এর মহিমা প্রচার করেছিলেন। এই সময়কার রবীন্দ্রনাথ যথার্থই—"spiritualised substance of soul condensed into one man" ( কাউণ্ট কাইজারলিঙের মন্তব্য )। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ এক হাতে সাকার-ঈশ্বর-উপাসকদের, অন্য হাতে বুদ্ধিবাদীদের মহড়া দিয়ে অরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

'অচলায়তন' নাটকেও ( ১৫ই আষাঢ়, ১৩১৮ ) রবীন্দ্রনাথ ধর্মনৈতিক সংগ্রাম করেছেন—ধর্মবোধের বিকৃতির বিরুদ্ধে, প্রাণহীন মিথ্যা আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। যার বিরুদ্ধে নাট্যকার সংগ্রাম করেছেন, নিজেই তাকে চিনিয়ে দিয়েছেন—"দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে। সেই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এদেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে ... ইহার বেদনা কি প্রকাশ করিব না? কেবল মিথ্যা বলিব, সেই বেদনার কারণকে দিনরাত্রি প্রশ্রয় দিতেই থাকিব? ... আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে ... আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় শিকল নাড়া দিয়াছি ... শিকল যে শিকলই সেই কথাটা যেমন করিয়াই হউক জানাইতে হইবে। ইহাতে মার খাইতে হয় তো মার খাইব।" কোন্ প্রেরণায় অচলায়তন লেখা হয়েছিল নিশ্চয়ই আর ব্যাখ্যা ক'রে বুঝাতে হবে না। তবে এইটুকু না বললে নয় যে রবীন্দ্রনাথের এই শিকল নাড়া দেওয়ায় হিন্দুদেরই পায়ে বেশী

ব্যথা লেগেছিল এবং হিন্দুরা তাঁর হিতকর চেষ্টাকে সানন্দে গ্রহণ করতে পারেনি। যদিও জ্ঞান-প্রেম-কর্মের বাধা থেকে মানুষকে মুক্ত করবার প্রেরণাতেই তিনি 'অচলায়তন' লিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য যে জ্ঞান-প্রেম-কর্মের বাধা হিন্দুসমাজেই বেশী ছিল এবং হিন্দুসমাজের গায়েই ব্যঙ্গের কশাঘাত বেশী ক'রে পড়েছিল ব'লে, গোঁড়া হিন্দুরা 'অচলায়তন'কে হিন্দু-সমাজের উপরে ব্রাহ্ম-সমাজের আক্রমণ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনি।

'ডাকঘর' নাটকে ( ১৩১৮ ) রবীন্দ্রনাথ অমলের মাধ্যমে অনন্তের তৃষ্ণা, বিশ্বানুভূতির আবেগ—বিশ্বকে প্রেমে পাওয়ার দুর্নিবার আর্তি—বিশ্বের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শকে আস্বাদন করার ব্যাকুলতা ব্যক্ত করেছেন। আভ্যন্তরিক প্রেরণা এখানে মনের একটা অবস্থা এবং সেই অবস্থাই 'ডাকঘর' নাটকের রূপ-রসে পর্যবসিত হয়েছে। এই মানসিক অবস্থাটিকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন—বলেছেন যে তাঁর মনে হচ্ছিল—"আমার এ জীবনের ভিতরকার শক্তি নিঃশেষ হ'য়েছে, এটাকে বদলে ফেলে আবার নতুন বাহন জুততে হবে—মৃত্যু ভালো কিন্তু মুক্তি চাই।" তিনি স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন—"কোথায় যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয়ে মিলে, খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম।" কিন্তু বাইরে যাই থাক, ভিতরে পরমকে পাওয়ার—রাজার সঙ্গে মিলনের ঐকান্তিক আর্তি বা উচ্ছ্বাস 'গদ্য-লিরিক'-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বলা বাহুল্য, এই পরম হচ্ছেন সেই অরূপ যিনি রূপে রূপে নিজেকে বিলসিত ক'রে দিয়েছেন প্রকৃতিতে এবং জীবের জীবনে এবং এই ধারণাটি রবীন্দ্রনাথের পরাদর্শনের ভিত্তি।

'ডাকঘর'-এর পরে এবং 'মুক্তধারা'র আগে রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' ( ১৯১৬ ), 'গুরু' ( ১৯১৮ ), 'অরূপরতন' ( ১৯২০ ) এবং 'ঋণশোধ'—এই চারখানি নাটক লিখেছিলেন। 'ফাল্গুনী' ঋতু-উৎসবের জন্য লেখা। সুতরাং বাহ্যিক প্রেরণা সুস্পষ্ট। আভ্যন্তরিক প্রেরণা—অক্ষয় জীবন-যৌবনের জয়-ঘোষণা। এই নাটকে নাট্যকারের বিশেষ বক্তব্য এই—"বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনূতন হ'য়ে জন্মাচ্ছে, মানুষপ্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন ক'রে উপলব্ধি করছে।"

'গুরু' 'অচলায়তন' নাটকের পরিমার্জিত রূপ, 'অরূপরতন' 'রাজা' নাটকের

এবং 'ঋণশোধ' 'শারদোৎসব' নাটকের সংস্কৃত ও সংক্ষিপ্ত রূপ। এদের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রেরণা সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

এবার 'মুক্তধারা' ( ১৯২২ ) এবং 'রক্তকরবী' ( ১৯২৪ ) নাটকের প্রেরণা আলোচনা করা যাক। এদের প্রেরণা আলোচনা করতে গেলেই আমাদের রবীন্দ্রনাথের জাপান ও আমেরিকা-ভ্রমণ এবং সেই সেই দেশে যেসব বক্তৃতা করেছিলেন সেই বক্তৃতাগুলি পাঠ করতে হবে—'ন্যাশনালিজম্' ও 'পার্সন্যালিটি' নামক পুস্তক দু'খানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে হবে। এই গ্রন্থ দু'খানি পাঠ করলেই দেখা যাবে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে 'নেশান'-এর বিরুদ্ধে—'ন্যাশনালিজম্' অপদেবতার (worship of organization) বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় যেয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করছেন—"ন্যাশনালিজম্ অপদেবতা, ইহার সমক্ষে নরবলি দিয়ো না।" স্বচক্ষে দেখছেন—নেশানগুলি সংঘশক্তিবলে দুনিয়াটাকে ভাগবাঁটোয়ারা ক'রে নিয়েছে, দুর্বলকে শোষণ-শাসনে জর্জরিত করছে। যন্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে তাদের দম্ভের অন্ত নেই। 'মানবের চরম আদর্শ' সর্বত্র উপেক্ষিত,—সত্য-শিব-সুন্দরের আসনে ঐশ্বর্যকে বসানো হয়েছে—অর্থকে পরমার্থ করা হয়েছে, সাম্রাজ্যলিপ্সু প্রবল জাতি দুর্বল জাতির রক্ত শোষণ ক'রে স্ফীততর হ'তে চেষ্টা করছে—শাসকশ্রেণী শাসিতদের শাসনে শোষণে জর্জরিত করছে—মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত করছে, মানুষকে অমানুষে পরিণত ক'রে। মানুষের নৈতিক সত্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ধনলিপ্সার প্রবল প্রতিযোগিতা চলছে দেশে দেশে। মন্দিরের চূড়া ছাড়িয়ে যন্ত্রের চূড়া আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। দেবতার পূজা গ্রহণ করছে যন্ত্রবিদ্‌রা—মানুষ কেউ লোভে-হিংসায় অপমানুষ, কেউ আত্মাবমাননা করতে করতে জড়ে—অবমানুষে পরিণত। মুক্তধারা এবং রক্তকরবী নাটকে রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার এই মহা-সংকটকেই রূপ দিতে, সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছিলেন। যন্ত্র-তন্ত্র সবকিছুর উপরে মানুষের মুক্তি। "যন্ত্রই হোক আর তন্ত্রই হোক সবই মুক্তির উপায়, লক্ষ্য—মুক্তি।" এই মুক্তিকে যেই আচ্ছন্ন করুক, রবীন্দ্রনাথ তাকে ক্ষমা করবেন না। রবীন্দ্রনাথ বলতে চান—সভ্যতার পরিমাণ ধনৈশ্বর্যের পরিমাণে নয়, যন্ত্র-তন্ত্রের আড়ম্বরে নয় সভ্যতার পরিমাপ,—মানুষের মুক্তির পরিমাণে,—মানুষ বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং সমাজে কতখানি মুক্তি পেয়েছে তারই মাত্রার মধ্যে—এক কথায় মানুষের জ্ঞান-প্রেম-কর্মের মুক্তিতে। মানব-মুক্তির এই চিরন্তন আদর্শকেই রবীন্দ্রনাথ এই দুই নাটকে ব্যক্ত করেছেন।

'মুক্তধারা'র পরে নাট্যকার ঋতু-উৎসবের প্রেরণায়—'বসন্ত' এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চের চাহিদায়—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী কবির নাটক অভিনয় করতে ইচ্ছুক সেই সংবাদ পেয়ে—'প্রজাপতির নির্বন্ধ'কে পরিমার্জিত ক'রে—'চিরকুমার সভা' রচনা করেছিলেন ( ১৩৩১ চৈত্র মাসের মধ্যে রচনা হয় )। তারপর 'শেষের রাত্রি' গল্প অবলম্বনে 'গৃহপ্রবেশ' ( ১৩৩৩ ) এবং 'কর্মফল'-অবলম্বনে 'শোধবোধ' রচনা করেছিলেন। এই দুইটি রচনার প্রেরণা আলোচনা করতে যেয়ে, শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতবাবু যে-কথা বলেছেন, তা উদ্ধৃত করছি—"এগুলিকে ফরমাইশি রচনা বলা না গেলেও, প্রেরণার রচনা নহে—এমন কি ফরমাইশি লেখা শুরু করিয়া আপনার আভ্যন্তরীণ তাপের বেগে যে রচনা আগাইয়া যায় এগুলি সে-শ্রেণীর লেখাও নহে। পাবলিক থিয়েটারে অভিনীত হইবে এই কথাটি মনের মধ্যে ছিল বলিয়া লোকরঞ্জনের দিকে দৃষ্টি গিয়েছিল ···।" এ সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। 'পাবলিক থিয়েটারে অভিনীত হইবে এই কথাটি মনের মধ্যে ছিল'—এ যদি সত্য হয়, তবে তাকেই রচনার বাহ্যিক প্রেরণা বলতে হবে।

এর পরে রবীন্দ্রনাথ 'শেষবর্ষণ' ( ১৩৩২, ভাদ্র ), 'নটীর পূজা' ( ১৩৩৩, ১৪ই বৈশাখ ), 'ঋতুরঙ্গ' ( ১৯২৭ ) 'গোড়ায় গলদ' সংস্কৃত ক'রে 'শেষরক্ষা' ( ১৯২৮ ), 'প্রায়শ্চিত্ত'র মার্জিত রূপ—'পরিত্রাণ' এবং 'রাজা ও রানী' পরিমার্জিত ও সংশোধিত ক'রে 'তপতী' রচনা করেছিলেন। এই নাটকগুলির মধ্যে—'শেষবর্ষণ' লেখা হয় ঋতু-উৎসবের প্রেরণায়; 'নটীর পূজা' লেখা হয় যে বাহ্যিক প্রেরণায় তা নাট্যকার নিজেই ব'লে দিয়েছেন—"তাগিদে প'ড়ে লিখতে শুরু করেছিলাম কিন্তু এখন লেখার আভ্যন্তরীণ তাগিদ তার বাহ্য তাগিদকে অতিক্রম করেছে।" তাগিদ কাদের তাও অজানা নশ। প্রভাতবাবুর ভাষায়ঃ "কলিকাতা হইতে চৈত্রমাসের শেষভাগে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি দেখেন 'কথা ও কাহিনী'র 'পূজারিণী'র মূকাভিনয়ের আয়োজন চলিতেছে—একমাস পরে কবির জন্মোৎসবে অভিনীত হইবে। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কবি নিজেই এই কাহিনী অবলম্বনে নাটিকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন; উদ্যোক্তাদের ফরমাইশ পুরুষবর্জিত নাটিকা চাই।" বাহ্যিক প্রেরণা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবুর আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখছেন—"কলিকাতায় কয়দিন পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের যে ধর্মোন্মত্ততা ও হিংস্রতা দেখিয়াছিলেন এবং যাহার জের এখনো সেখানে মিটে নাই—তাহার অভিঘাত-প্রেরণা এই রচনার মধ্যে আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়।" নাটিকার

আভ্যন্তরিক প্রেরণা—রবীন্দ্রমানসের অতি সংলক্ষ্য একটি সংস্কার—যা 'বিসর্জন' নাটকে, 'মালিনী' নাটকে আগেই ব্যক্ত হয়েছিল—অহিংসামূলক ধর্মের মহিমাকে হিংসামূলক ধর্মসাধনার উর্ধ্বে স্থাপনা করার প্রচেষ্টাই নতুন ক'রে এই নাটিকায় ব্যক্ত হয়েছে।

অন্যান্য নাট্যরচনার প্রেরণা আগেই নির্দেশিত হয়েছে ব'লে, নতুন ক'রে কোন আলোচনা করতে চাইনে। এবার আমি 'কালের যাত্রা', 'চণ্ডালিকা', 'তাসের দেশ', 'বাঁশরী', 'মুক্তির উপায়' এবং শেষ তিনখানি নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা' এবং 'শ্যামা' সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা ব'লেই প্রবন্ধের উপসংহার করব।

'কালের যাত্রা' লেখার প্রেরণা, বিশেষ ক'রে 'রথের রশি' লেখার প্রেরণা সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়ার আগে আমাদের প্রথমেই এই কথাটা স্মরণ করতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ ( ১৯৩০ ) ক'রে এসে জীবনে এক নতুন ভাবোদ্দীপনা লাভ করেছিলেন। রাশিয়া দেখে কবির বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। এই বিস্ময় এবং উল্লাসের পরিচয় কবির নিজের কথাতেই দেওয়া যাক। তিনি লিখছেন—"এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। ··· কেবলমাত্র এই কারণেই এদেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা একমুহূর্তে অবারিত হয়েছে।" বলছেন—রাশিয়ায় "না এলে এ-জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।" প্রতিমা দেবীকে, রথীন্দ্রনাথকে, অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি যেসব চিঠি লিখেছিলেন তাতে কবির আনন্দ শতধারে উৎসারিত হয়েছিল। অন্যসময়ে লেখা একখানি চিঠিতে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন—পাশ্চাত্যের "এই পেটুক সভ্যতায় সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান হবে কী করে? অধিকাংশ মানুষকে স্বল্পসংখ্যক মানুষের উদ্দেশে নিজেকে কি চিরকালই উৎসর্গ করতে হবে? সভ্যতার এই ভিত্তি-বদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে, মনে হয়েছিল নরমাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচব, নইলে চোখ-রাঙানির ভান ক'রে অথবা দয়ার দোহাই পেড়ে দুর্বল কখনোই মুক্তিলাভ করবে না। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে—কিন্তু এ বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর

এবং প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। নব্য রাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করচে যেটাকে বলে—লোভ।" বাস্তবিকই রাশিয়ার সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ যে উদার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং যত আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করেছিলেন, খুব কম লোকেই তা করেছিল। রাশিয়া রবীন্দ্রনাথের সমাজ-দর্শনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন—"দেশের ইতিহাসে অনেক কিছু উলটপালট হবে। জীবনযাত্রাকে গোড়া ঘেঁষে বদল করবার দিন এল।" এই 'গোড়া ঘেঁষে বদল' করার আবেগকেই রবীন্দ্রনাথ 'রথের রশি'তে ব্যক্ত করেছিলেন। বলতে চেয়েছিলেন যারা সভ্যতার বাহন অথচ যাদের মানুষ হবার সময় নেই, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে যারা পালিত, যারা সবচেয়ে কম খেয়ে কম প'রে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে, সকলের চেয়ে বেশি যাদের পরিশ্রম সকলের চেয়ে বেশি যাদের অসম্মান, কথায় কথায় যারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে, সবকিছুর থেকেই যারা বঞ্চিত—সেই 'সভ্যতার পিলসুজ' জনসাধারণের প্রাপ্য অধিকার কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে না দিলে সমাজের চাকা চলবে না।

তারপর 'চণ্ডালিকা' নাটিকা। এই নাটিকার বাহ্যিক প্রেরণা অস্পৃশ্যতা আন্দোলন। আভ্যন্তরিক প্রেরণা—মূঢ় ম্লান মুখে ভাষা দেওয়ার আবেগ—ছোটদের মধ্যে অধিকারবোধ জাগানোর ইচ্ছা।

কবি যেন ছোটদের দাবি জানাতে ও বলতে শেখান—"তাঁকেই মানি যিনি আমাকে মানেন"। মারাত্মক শিক্ষা নয় কি? যে তোমাকে মানবে না, তাকে তুমি মেনো না—এই কথা শেখানো আর শূদ্রদের উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলা এক কথা নয় কি? রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণকে শেখাতে চান—"যে ধর্ম অপমান করে, সে ধর্ম মিথ্যে"। কেন এ কথা শেখাতে চেয়েছিলেন—তা আগেই বলা হয়েছে।

তারপর 'তাসের দেশ' নাটক-রচনার প্রেরণা অতি স্পষ্ট। 'অচলায়তন' যে প্রেরণায় রচিত হয়েছিল, সেই একই প্রেরণায়—জাতীয় জীবনের জড়ত্ব দূর করবার প্রেরণাতেই 'তাসের দেশ' লিখেছিলেন। "ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া এই নির্জীবের গণ্ডি ঠেলে ফেলতে হবে এইসব নিরর্থকের আবর্জনা"—এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ নাটকের মাধ্যমে বলতে চেয়েছিলেন।

'বাঁশরী' নাটকখানির বাহ্য প্রেরণা খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ের কিছু আগেই 'ভারতীয় বিবাহ' বিষয়ে বিস্তারিত প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং ভারতীয় বিবাহের উচ্চাদর্শের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। বিবাহ-বন্ধনকে কামনার উর্ধ্বে, আসঙ্গলিপ্সার উর্ধ্বে অর্থাৎ খাঁটি প্রেমের উপরে স্থাপনা করার আদর্শকেই ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছিল। নর-নারীর মধ্যে কামগন্ধহীন সম্পর্ক সম্ভব কি অসম্ভব, এ প্রশ্ন নিয়ে কবি নতুন ক'রে ভেবেছিলেন বাঁশরী-নাটকে সেই সমস্যা—বিবাহ ও প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

এতক্ষণ যে আলোচনা হয়েছে, তাতে আশা করি, আমার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। উপসংহারে আমি রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের প্রেরণা সম্বন্ধে দু'একটি কথা ব'লেই প্রবন্ধ শেষ করছি।

আগেই আমরা দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে মণিপুর থেকে নৃত্য-শিক্ষক এনে মণিপুরী নৃত্য-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর রাশিয়ায় গিয়ে তিনি 'ব্যালে' দেখে এসেছিলেন এবং জাপানে ও অন্যান্য দেশে গিয়েও নৃত্য-নাট্য দেখে এসেচিলেন। তাঁর নৃত্য-নাট্যগুলি এইসব অভিজ্ঞতারই ফল—কারো অনুকরণ নয়,—অনুসরণ।

এখানেই প্রবন্ধ শেষ করছি। তবে আবার বলছি—রবীন্দ্রনাথের মন পরিবেশ-নিরপেক্ষ নয়, এ কথা বলায়, রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভূতিকে অস্বীকার বা হেয় করা হয় না ; গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—আমি 'মুনীনাং কপিলো মুনিঃ' ; এখন কোন শ্রীকৃষ্ণ থাকলে, বলতেন—'কবীনাং রবীন্দ্রঃ কবিঃ'—'কবিদের মধ্যে আমি রবীন্দ্রনাথ'।

উপন্যাস

[ উনবিংশ শতাব্দীর শেষযামে যখন বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতি-চিন্তায় বঙ্কিম-যুগের প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং সর্বাত্মক, সেই পরিবেশের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-রচনার প্রাথমিক পর্যায়ের সূচনা। তখন থেকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত মোটামুটি প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রচিত তাঁর মোট বারোখানি উপন্যাসের মধ্যে বিভিন্ন কাল, পরিবেশ এবং চিন্তাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি যুগের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং তার সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বিধৃত হয়ে আছে। রবীন্দ্রকাব্যের ক্ষেত্রে কবি-মানসের সুনির্দিষ্ট যে ক্রমপরিণতির ইতিহাসটি আছে, উপন্যাসের ক্ষেত্রে সে-ইতিহাসটিকে সর্বাংশে ঠিক সেভাবে পাওয়া যাবে না। বঙ্কিম-রীতি-প্রভাবিত প্রথমযুগের উপন্যাস 'বউঠাকুরানীর হাট' এবং 'রাজর্ষি'র সঙ্গে 'গোরা' বা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের রচনাকালের কালব্যবধান যেমন সত্য, তেমনি সত্য তাদের পরিবেশগত পার্থক্য এবং মনন-পার্থক্যের বাস্তবতা। পূর্ব-রচিত 'চোখের বালি'র ( ১৯০৩ ) সাহিত্য-মূল্য এবং শিল্প-সার্থকতা পরবর্তী রচনা 'নৌকাডুবি'র ( ১৯০৬ ) চেয়ে অনেক বেশী। আবার সমসাময়িক কালে রচিত 'যোগাযোগ' ( ১৯২৯ ) এবং 'শেষের কবিতা'য় ( ১৯২৯ ) আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, শিল্পদৃষ্টি, সমাজচিন্তা—সব দিক থেকেই মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করবার মতো। ১৯১৬ সালে রচিত 'চতুরঙ্গ'র পটভূমি এবং ১৯৩৪ সালে রচিত 'চার অধ্যায়'-এর পটভূমিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু হৃদয়ধর্ম ও জীবনবোধের ধারণায় রবীন্দ্র-মানসের চিন্তায় যে ফলশ্রুতি তার প্রকাশ 'চতুরঙ্গ'র দামিনী আর 'চার অধ্যায়'-এর এলার চরিত্রে এক যোগসূত্র রচনা করেছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে আলোচনায় এ কথা বোধহয় মনে রাখা প্রয়োজন যে তাঁর উপন্যাসগুলি কাব্যের মতো ক্রমপরিণতির স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন কাল, পরিবেশ এবং তারই প্রত্যক্ষ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উপজাত শিল্পী-অনুভূতির সঙ্গেই সম্পৃক্ত হয়েছে বেশী। প্রথমযুগে তাঁর দু'খানি উপন্যাসে বঙ্কিমী-রীতির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

পরবর্তী কালে অর্থাৎ 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'র কাল থেকে বঙ্কিমী-রীতি থেকে মুক্ত এক স্বতন্ত্র ধারায় পদক্ষেপ। 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' বা 'চার অধ্যায়'-এর সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং তার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্র-মানসের প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, 'শেষের কবিতা'য় সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক পরীক্ষা, যা বাইরের কোনো বাস্তব পরিবেশের সম্পর্ক-বর্জিত এক কাল্পনিক জীবন-পরিবেশের আওতায় লালিত এবং 'দুই বোন' বা 'মালঞ্চ' চিরন্তন ত্রয়ী সমস্যার উপর সীমাবদ্ধ পটভূমির মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী। 'শেষের কবিতা'র মতো লিরিক-ধর্মী উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে ওই একখানিই আছে, রবীন্দ্রনাথও দ্বিতীয় আর একখানি রচনা করেননি।

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ, এ-কথা বহু-আলোচিত সত্য। এই শতাব্দীতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তায় মানবতাবোধ এবং জাতীয়তাবোধের নতুন ক'রে যে উন্মেষ ঘটেছিল, তার পশ্চাতে বহু মনীষীর দান আছে। তা সত্ত্বেও এ-কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রভাবে পুষ্ট সেই মানবতাবোধ এবং জাতীয়তাবোধ অনেকগুলি ক্ষেত্রে ভাবগত বৈপরীত্যও সৃষ্টি করেছিল। মানবতাবোধের ভিত্তি ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং যুক্তিবাদের ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যদিকে সদ্যজাগ্রত জাতীয়তাবোধ ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জ্ঞাপন করতে গিয়ে অনিবার্য-ভাবে ভারতের অতীত-ঐতিহ্যমুখী হয়ে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর এই দুই ধারাকে সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা গিয়েছিল ব্রাহ্মধর্মমতের প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে। কিন্তু তাতেও সমন্বয় সম্পূর্ণ হয়নি, এ কথা ইতিহাসের দিক থেকে সত্য। যুক্তিবাদী মানবতাবোধ এবং অতীত-মুখীন জাতীয়তাবোধ—এই দুই শক্তির পূর্ণ অস্তিত্বের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের বন্যার জল সরে যাওয়ার পর মানবতাবোধের নতুন পলিমাটির উপর বঙ্কিম-সাহিত্যের অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিল। তা সত্ত্বেও জাতীয়তাবোধের অতীত-মুখীনতাই বঙ্কিমচন্দ্রকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। উত্তর-রেনেসাঁ কালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যুক্তিবাদ এবং মানবাধিকারকে বুদ্ধি দিয়ে মেনে নিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র পুরোপুরি সে-পথে পা বাড়াতে পারেননি। তাঁর চিন্তাবৃত্তি মূলত জাতীয়তাবোধকে আশ্রয় ক'রে সেই অতীত-মুখীনতার মধ্যেই সার্থকতার সম্ভাবনাকে বেশী করে আবিষ্কার করেছে। যার ফলে বিরাট ব্যক্তিত্ব নিয়ে একটা গোটা যুগ ধরে একটা জাতির যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করেও বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যতের পথে

এগিয়ে না দিয়ে অতীতের মধ্যেই তাকে অনুসন্ধান করবার অনুজ্ঞা দিয়ে গেছেন। বঙ্কিম-যুগ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ। কিন্তু মানবতাবোধের ক্ষেত্রে সে-যুগ পরবর্তী যুগের পক্ষে ভিত্তি হিসাবে অপরিহার্য হয়ে থাকা সত্ত্বেও ধারাবাহিকতার দিক থেকে অভিন্ন যোগসূত্র রচনা করতে পারেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনী চরিত্রের মধ্যে মানবাধিকার, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং হৃদয়বৃত্তির সম্বন্ধে নব চিন্তাধারার সমস্ত উপাদান থাকা সত্ত্বেও তা বঙ্কিম-যুগের বিশিষ্ট ভাবরূপটিকে অতিক্রম করে পরবর্তী কালের জীবনবোধের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারেনি। শৈবলিনীর পরে এসেও সে-স্থান গ্রহণ করেছে 'চোখের বালি'র বিনোদিনী। 'চোখের বালি'তে বাংলা মনস্তত্ত্বমূলক সামাজিক উপন্যাসের নতুন যুগের গোড়াপত্তন। বুদ্ধিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় মানব-মানবীর স্বভাবসিদ্ধি সমষ্টির প্রয়োজনে উপেক্ষিত। অনুভূতিবাদী রবীন্দ্রনাথের জীবনসত্যে হৃদয়ধর্মের প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে আগে। বঙ্কিম-যুগের জীবনদর্শনে হৃদয়ধর্মের যে প্রকাশ-ব্যাকুলতা পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা পায়নি, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে সেই ব্যাকুলতা যথার্থ মহিমায় সঙ্গে স্বীকৃত। 'চোখের বালি'তে তার সূচনা।

'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথের রীতি ও চিন্তাবৈশিষ্ট্য তার স্বকীয় রূপ নিয়ে প্রথম প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমী-রীতি-প্রভাবিত 'বউঠাকুরানীর হাট' বা 'রাজর্ষি'তে আঙ্গিকগত মৌলিকতা নেই। একটু স্পষ্টভাবে যা আছে তা হ'ল গদ্যরীতির পরবর্তী সম্ভাবনার ইঙ্গিত। আর প্রচ্ছন্নভাবে যা আছে তা হ'ল জীবনবোধের একটা নিজস্ব অনুভূতির আভাস মাত্র। মধ্যযুগীয় আদর্শের বীরত্বের চেয়েও হৃদয়ধর্মে বলিষ্ঠ জীবনবোধের দিকে তাঁর প্রবণতা 'বউঠাকুরানীর হাট'-এ প্রথম লক্ষ্য করা গেছে। 'চোখের বালি'তে তার বলিষ্ঠ রূপটি প্রথম স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল।

'চোখের বালি'র আগে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন লেখক সামাজিক বা পারিবারিক উপন্যাস লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তো আগেই গোড়াপত্তন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও 'চোখের বালি'র কাল থেকে বাংলা উপন্যাসে একটি নতুন যুগের সূচনা হ'ল—কারণ, প্রথমত স্রষ্টা নিজে এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিচারক সেজে বসেননি, নির্লিপ্ত শিল্পীর দৃষ্টিতে তিনি জীবনকে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন; দ্বিতীয়ত, প্রেম ও জীবন-পিপাসার এত সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সজীব বাস্তবতা এর আগে পাঠকের সামনে আসেনি। রোহিণী বা শৈবলিনীকে বঙ্কিমচন্দ্র যে কথাগুলি বলবার অবকাশ দেননি,

রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর অনুভূতির জগৎ থেকে সেই অপ্রকাশিত কথাগুলিকে মানুষের সামনে এনে দিয়েছেন। রোহিণী আর শৈবলিনীর পরিণতির সঙ্গে বিনোদিনীর পরিণতি আন্তর-ধর্মে সম্পূর্ণ পৃথক। নিষ্ঠুর আত্মদ্বন্দ্বের পরিণতিতে বিনোদিনী জীবনের যে সত্যকে পেয়েছে, তাই তার যথার্থ সত্য। অবৈধ প্রণয়ের পাপে শৈবলিনীর মতো 'প্রায়শ্চিত্ত' বা রোহিণীর মতো অপঘাত মৃত্যু তাই তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠেনি।

'নৌকাডুবি' পরবর্তীকালে রচিত হলেও, এ উপন্যাসখানি দুর্বল। রমেশ বা কমলার চরিত্রচিত্রণে সহজ পরিণতির অভাব অনেক ক্ষেত্রেই আছে। এই কাহিনীটিতে হেমনলিনীর চরিত্রটি অবশ্য উপন্যাসের অনেকখানি ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র উপন্যাস-সাহিত্যের সার্থক-সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলির মধ্যে হেমনলিনী অন্যতমা। 'নৌকাডুবি' এবং 'খেয়া' কাব্য প্রায় একই সময়ে রচিত। কিন্তু 'খেয়া' কাব্যে কবি-মানসের যে পরিণত রূপটির অস্তিত্ব আছে, 'নৌকাডুবি'তে তা অনুপস্থিত।

অনেক সমালোচকের মতে 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'গোরা'য় রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের সামগ্রিক পরিচয়টুকু পাওয়া যায়—এই হ'ল প্রচলিত অভিমত। 'গোরা'র রচনাকাল ১৯১০ সাল। ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের জাতীয়তাবোধ উনবিংশ শতাব্দী থেকেই একটি বিশেষ রূপ নেবার জন্যে কালের সঙ্গে এগিয়ে চলছিল। বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তা একদিকে প্রচণ্ড, অন্যদিকে সংহত রূপ গ্রহণ করবার অবকাশ পেল। প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ-বিরোধিতার ভিতর দিয়ে এই যে প্রচণ্ড শক্তি আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার অন্তর্নিহিত গণ্ডীবদ্ধতার সত্যকে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারেননি (যদিও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপটিকে তিনি অগ্রাহ্য করেননি)। 'নেশন'বোধ থেকে উৎসারিত সেই জাতীয়তাবোধের মধ্যে নেশার আমেজ ছিল, উন্মাদনা ছিল—কিন্তু মানবসত্যের যথার্থ প্রকাশ ছিল না। প্রেম এবং বিশ্বমানবতার সত্যকে রবীন্দ্রনাথ স্থান দিয়েছিলেন সবচেয়ে উপরে। জাতীয় আন্দোলনে তাৎকালিক নেতাদের আপাত-সাফল্যের লোভ, আপোষধর্মী গোঁজামিলের আগ্রহকে কোনো অবস্থাতেই তিনি স্বীকার করে নেননি।[১] রাজনৈতিক

---

[১] 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য

মুক্তির নামে অন্তর-সত্যের বন্ধনদশার আশংকাই তাঁকে সবচেয়ে বেশী বিচলিত করে তুলেছিল। ইতিহাসের খাতিরে এ-কথা আজ স্বীকার করতেই হবে যে, তাৎকালিক সংস্কারপন্থী আপোষ-কামী নেতৃত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার এইখানেই ছিল মূল পার্থক্য। অনেক উপহাস লাঞ্ছনা সত্বেও তিনি সাময়িক সাফল্যলাভের বিনিময়ে সত্যকে বিসর্জন দিয়ে কোনোমতেই সন্ধি করেননি। জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে হীনতা, কুশ্রীতা, হিংসার অস্তিত্বকে তিনি ঘৃণা করেছেন। গোরার বিশ্বমানবতার আদর্শ তারই প্রকাশ। 'ঘরে বাইরে' বা 'চার অধ্যায়'-এ রাজনৈতিক পটভূমি এবং জাতীয়তাবাদের যে তীব্র সমালোচনা তিনি করেছেন তারও ভিত্তি ওই মানবতাবোধের ভাবনার সত্যে। মানুষের অন্তরের স্বাভাবিক সত্যকে অগ্রাহ্য ক'রে কোনো আদর্শই সার্থকতায় উত্তীর্ণ হতে পারে না, এই উপলব্ধিকে তিনি 'চতুরঙ্গ'তেও ভিন্ন পটভূমিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

'ঘরে বাইরে' সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে গতিশীল উপন্যাস। জনৈক সমালোচক বলেছেন, "'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিমূর্ততার আশ্রয় নিয়েছেন।" মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। একদিকে প্রাচ্যের ত্যাগ-তিতিক্ষার আদর্শে শান্ত সংযত পুরুষ নিখিলেশ, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের ভোগকৈবল্যবাদী-আদর্শপুষ্ট সন্দীপ—মাঝখানে বিমূঢ়চিত্ত বিমলা। ১৯১৬ সালে রচিত এই উপন্যাসখানির আশ্রয়বস্তু ভারতের জাতীয় আন্দোলন। 'গোরা' উপন্যাসে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বমানবতার আদর্শ-প্রতিষ্ঠার মধ্যে উপলব্ধির সত্য আছে, কিন্তু 'ঘরে বাইরে'র মতো তার গতিবেগ এত প্রচণ্ড নয়। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের সমসাময়িক রচনা 'বলাকা' এবং 'ফাল্গুনী'ও কবির জীবনবাদ এবং গতিবাদের প্রকাশকামনার অসাধারণ সৃষ্টি। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের ক্ষেত্রে নিখিলেশ, সন্দীপ এবং বিমলার মধ্যে কবির যে বক্তব্যটি পরিস্ফুট হয়েছে, তা মূলত দুটি বিপরীতধর্মী জীবনাদর্শ এবং তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিহ্বল বিভ্রান্ত মানবচিত্ত (বিমলা)। সন্দীপের ভোগকৈবল্যবাদী জড়োপাসনার মধ্যে যে উন্মাদনা, যে আকর্ষণ তাকে বিমলা কোনোমতেই দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। তার স্বামী নিখিলেশের মধ্যে প্রেম, মৈত্রী আর বৃহত্তর মানবসত্যের যে শান্তসমাহিত রূপ তা সন্দীপের মতো শুধু উন্মাদনা দিয়ে বিমলাকে আকর্ষণ করে না। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির সত্য রূপ নিয়েছে নিখিলেশের মধ্যে, অসত্যের শিল্পমূর্তি সন্দীপ। তাই

শেষপর্যন্ত বিমলা তার ভুল বুঝতে পেরে, ফিরে এসে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে নিখিলেশ অর্থাৎ যথার্থ সত্য-সুন্দরের কাছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকার উপরে রচিত এই উপন্যাসে নিখিলেশ সন্দীপ বা বিমলার বহিরঙ্গের পরিচয়টা যতখানি বাস্তব, তার চেয়ে অনেক বেশী বাস্তব তাদের প্রত্যেকের জীবনবোধের সংঘর্ষ এবং ফলশ্রুতির এই বিমূর্ত-শিল্পসৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'ঘরে বাইরে' এক অসাধারণ রচনা।

'চতুরঙ্গ' এবং 'যোগাযোগ'-এর রচনাকালের মধ্যে বেশ কয়েক বছরের ব্যবধান। 'চতুরঙ্গ'র বিক্ষিপ্ত কাহিনীগুলির মধ্যেও জীবন-সত্যের ক্ষেত্রে হৃদয়ধর্মের বাণীটিই উচ্চারিত হয়েছে। দামিনীর সহজ স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা আর শচীশের বস্তুসম্পর্কবিহীন রসতত্ত্ব আর জীবনদর্শনের প্রচণ্ড সংঘাতের মধ্যে শ্রীবিলাসের মতো যথার্থ-জীবনবোধ-সম্পন্ন পুরুষের অবস্থিতি সেই বক্তব্যের ইঙ্গিত শেষপর্যন্ত বহন করে চলেছে। 'যোগাযোগ'-এর কুমুর মাধ্যমে নারীত্ব এবং নারীর যথার্থ অধিকারকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত যে পরিণতিতে পৌঁছে কাহিনীর উপসংহার টেনেছেন তা তাঁর জীবন-দর্শনের একটি দিকের পরিচয় ধরে রেখেছে। কুমুদিনীর স্বামী মধুসূদন শক্তির দম্ভ দিয়ে স্ত্রীর অন্তর জয় করতে চেয়েছিল। কিন্তু বারবারই সে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে। কুমুর স্বাধিকারবোধের চেতনা তার চারপাশে এমনই একটা আবরণ তৈরী করে রেখেছিল, যা মধুসূদন কখনোই সরাতে পারেনি। সবশেষে কুমুর মাতৃত্ব-সম্ভাবনার ভিতর দিয়েই কাহিনীর পরিণতি। শক্তির দম্ভে হৃদয় জয় করা যায় না, এবং যথার্থ অধিকার কেবল তত্ত্বেরই বিষয় নয়। অধিকার-প্রতিষ্ঠার দীর্ঘস্থায়ী সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের মধ্যে মধুসূদনও তার অধিকার পায়নি, কুমুদিনীও নিজেকে তার প্রাপ্য মহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। কুমুর দিক থেকে তা তখনই সম্ভব হ'ল যখন আসন্ন মাতৃত্বের অভিষেকে সে কল্যাণী নারীর মধ্যে তার স্থানকে খুঁজে পেয়েছে। 'যোগাযোগ' রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের অনন্য-সাধারণ ক্ষমতায় সমুজ্জ্বল শিল্পসৃষ্টি।

'মালঞ্চ' এবং 'দুই বোন' রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের রচনা। এই দু'খানি বাস্তবজীবনে প্রেমের ক্ষেত্রে ত্রয়ী-সমস্যার উপরে ভিত্তি করে রচিত।

'চার অধ্যায়' ( ১৯৩৪ ) সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অন্তর্নিহিত বিদ্বেষবৃত্তির প্রতিবাদস্বরূপ। 'গোরা' উপন্যাসে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কবির যে বিক্ষোভ, সেই বিক্ষোভ 'চার অধ্যায়'-এ দেখা দিয়েছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে।

যথার্থ মানবসত্য হিংসাদ্বেষের উর্ধ্বে। তার জন্যে মানবহৃদয়ের অবাধ প্রকাশের পথ চাই। মানুষের সহজ স্বাভাবিক জীবনস্রোতকে রুদ্ধ ক'রে কোনো আদর্শই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেবেই। 'চার অধ্যায়'-এর এলা এবং অতীনের চরিত্রে এই বক্তব্যেরই প্রকাশ।]

# রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

## হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

কথাসাহিত্যের আদিতে উপকথা। উপকথার রাজ্যে সম্ভব-অসম্ভবে সীমানা সংঘর্ষ নেই। সেখানে দৈত্যদানব, দেবতা মানুষ এক রাজ্যের অধিবাসী ; বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। সাহিত্যে বাস্তবতার জন্ম সেইদিন হয়েছে যেদিন মানুষের রাজ্য থেকে দৈত্যদানব এবং দেবতাকে নির্বাসিত করা হয়েছে। নিছক মানুষকে নিয়ে যে কল্পিত কাহিনী তারই নাম উপন্যাস। মানুষ মরজীব, দেবতা দানব দুই-ই দুর্মর। এইজন্যে নির্বাসনের পরেও দেবতা আর দানব উপন্যাসের রাজ্যে বেশ কিছুকাল ছদ্মবেশে বাস করেছে অর্থাৎ গোড়ার দিকে উপন্যাস মাত্রেই দেবদুর্লভ আদর্শ চরিত্র এবং মনুষ্যরূপী দানব অর্থাৎ ভিলেন্ চরিত্র দেখা যেত। এটা উপন্যাসের নাবালক দশা। ইংরেজি উপন্যাসের শতবর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতা চোখের সুমুখে হাজির ছিল বলে বাংলা উপন্যাস অল্পকাল মধ্যেই নাবালক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। বাংলা উপন্যাস বলতে গেলে জন্মমুহূর্তেই সাবালক। তার কারণ বাংলা উপন্যাস গোড়াতেই একটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার স্পর্শ পেয়েছিল। তাই বলে বঙ্কিমবাবু ধরেই নির্ভেজাল উপন্যাস রচনা করেছেন এমন কথা বলব না। গোড়ার দিকে তিনি উপন্যাসের উপকরণের সঙ্গে ইতিহাসের ব্যসন মাখিয়েছেন। রাজা উজীর, বাদশা-বেগমের কাহিনী উপকথারই সামিল কারণ এঁদের জীবনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ যোগ নেই। স্বর্গের ইন্দ্রপুরী সম্পর্কে যতটুকু জানি, মোগল অন্তঃপুর সম্পর্কে বোধকরি তারও চাইতে কম জানি। বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন

গোবিন্দলাল-রোহিণীর কাহিনী, রজনীর কাহিনী, নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর কাহিনী রচনা করলেন সেদিন উপন্যাসের রাজ্যে আমাদের আসন পাকা হল।

সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের যখন আবির্ভাব তখন আমাদের গদ্য-ভাষার যেমন শীর্ণ মূর্তি, তেমনি আড়ষ্ট তার গতি ; ত্রস্ত লঘু পদক্ষেপে বিচরণ করবার ক্ষমতা তার ছিল না। তাতে কষ্টেস্‌ষ্টে ন্যায়ের তর্ক, হয়তো বা শাস্ত্রালোচনাও চলতে পারত কিন্তু নরনারীর প্রণয়কাহিনী বর্ণনা করবার মতো কমনীয়তা বা ব্রীড়াভঙ্গি তাতে ছিল না। বাংলাভাষার দেহটিকে অতি যত্নে সুষমামণ্ডিত করে বঙ্কিমচন্দ্রই তাকে উপন্যাস-রচনার উপযোগী করে নিয়েছিলেন। একবার ভাষার রাজপথটিকে নির্মাণ করে নিয়ে বঙ্কিমের প্রতিভা প্রতি পদক্ষেপে যোজন পথ অতিক্রম করেছে। বঙ্কিমের যখন জন্ম ইংরেজি উপন্যাসের বয়স তখন ঠিক একশ' বছর। আর তিনি যখন উপন্যাস-রচনায় ব্রতী হলেন তখন রিচার্ডসন্, ফিল্ডিং, স্কট, ডিকেন্স, জেন্ অস্টিন্ পর্যন্ত ইংরেজি উপন্যাসের বিস্তৃত ক্ষেত্র বঙ্কিমের সম্মুখে প্রসারিত ছিল। সেই দূরপ্রসারী অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন।

উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে বঙ্কিম যখন প্রস্থানের উদ্যোগ করছেন ঠিক সেই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ। অত্যন্ত সসংকোচ প্রবেশ, বলাই বাহুল্য। ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে একান্তই বঙ্কিমের অনুগামী। 'বউঠাকুরানীর হাট' বাইশবছর বয়সের রচনা। জীবনের সঙ্গে পরিচয় যৎসামান্য, এইজন্যে জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে প্রবেশ না ক'রে তাঁর প্রথম আখ্যায়িকাটিকে তিনি অতি সন্তর্পণে একটি রাজপরিবারের প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন। নিজেই বলেছেন, এ যেন কয়েকটি চরিত্র নিয়ে পুতুল-খেলা। তথাপি বঙ্কিম এই প্রথম রচনাকে সস্নেহ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই কাহিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজেরও অনেকখানি মমতা ছিল, পরবর্তীকালে এর একাধিক নাট্য-রূপায়ণেই তার প্রমাণ। এ ছাড়া সাহিত্যরসিক মাত্রেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, বসন্ত রায়ের চরিত্রের মধ্যে পরবর্তীকালের ঠাকুর্দা চরিত্রের বীজ লুক্কায়িত। আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র উদয়াদিত্য। এঁর স্বভাবসুলভ কোমলতা এবং উদারতাকে অপরে দুর্বলতা বলে ভুল করে, কিন্তু বিপদে ইনি নিঃশঙ্ক, নির্ভীক। উদয়াদিত্য অন্তর্বিহারী মানুষ, আপন অন্তরের বেদনা ইনি নীরবে বহন করেন। 'সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে' তার প্রতি কবির নিত্যকালের আগ্রহ। কাঁচা হাতে

কম্পিত রেখায় এখানে যাকে অঙ্কিত করেছেন সে মানুষই পরে 'গোরা'র পরেশবাবু, 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ হয়েছে, হয়েছে 'যোগাযোগ'-এর বিপ্রদাস।

রাজর্ষির কাহিনীকে বাদ দিলে এর পরে প্রায় কুড়িবছর কাল কবি উপন্যাসে হাত দেননি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে আবার যখন অবতীর্ণ হলেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। জীবনের পরিধি অনেকখানি বেড়েছে। এই কুড়িবছরে কবির জীবনপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে,—স্নেহে প্রেমে বাৎসল্যে সমুজ্জ্বল। একে একে সন্তান এসে ঘর আলো করেছে, আবার একদিন পত্নী-বিয়োগে সেই ঘর অন্ধকার হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে হর্ষে বিষাদে, আনন্দে বেদনায় জীবনের সমৃদ্ধি বেড়েছে বই কমেনি। উচ্ছলিত জীবনপাত্র উপচে পড়েছে অজস্র গানে, কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে। সৃষ্টিলীলা অজস্র ধারায় প্রবাহিত। মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চভূতের ডায়েরী সমাপ্ত হয়েছে আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্পগুচ্ছের চৌষট্টিটি গল্প ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে।

জমিদারি পরিদর্শনকালে পদ্মায় বোটে বসে কেবলমাত্র দুই তীরের নিসর্গ-শোভাই নিরীক্ষণ করেননি, তীরবাসী জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন, মানব-চরিত্রের অপার বৈচিত্র্যের কথা ভেবেছেন, মানুষের মনের অলিগলির সন্ধান নিয়েছেন। খাঁটি 'উপন্যাস' রচনার পক্ষে এই প্রস্তুতি অত্যাবশ্যক ছিল। মানুষের মনের মতো গহন বন আর নেই—আবার অসংখ্য গুপ্ত এবং হিংস্র রিপু সেই বনকে শ্বাপদসঙ্কুল করেছে। গল্পগুচ্ছের গল্পরচনাকালে মানবমনের সেই গুহায়িত রহস্য ধীরে ধীরে তাঁর চোখের সুমুখে উদ্ঘাটিত হচ্ছিল। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'চোখের বালি'র মধ্যে তা পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। এর পূর্বে মানব-মনের এমন নিরাবরণ ছবি বাংলা সাহিত্যে আর কেউ আঁকেননি। ব্লাস্ট-ফার্নেসের তরল আগুনে যেমন তৈরি হচ্ছে এই লৌহযুগের আধুনিক সভ্যতা তেমনি মানব-মনের অন্তর্গূঢ় কারখানায় কামনার আগুনে তৈরি হয়েছে আধুনিক সাহিত্যের উপকরণ। আধুনিক মন স্বভাবতই নির্মম। শোভনতা কিম্বা শালিনতার খাতিরে কুশ্রীকে সে সুশ্রী প্রতিপন্ন করে না। 'চোখের বালি' এই অর্থে নির্মম সাহিত্য, মানুষের মনকে একান্ত নির্মমভাবে অনাবৃত করে দেখানো হয়েছে। ঈর্ষার প্রকোপে মাতৃস্নেহ কতখানি বিকৃত হতে পারে, শিক্ষিত মার্জিত আপাতসুস্থ মনও অকস্মাৎ-জাগ্রত রিপুর আঘাতে কতখানি অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে পারে, কোনো

পুরুষের ঔদাসান্য নারীচিত্তকে কি বিপুল শক্তিতে টানতে পারে এবং এই টানাপোড়েনের দ্বন্দ্ব কতখানি উত্তাপ এবং জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে 'চোখের বালি' তারই জ্বলন্ত কাহিনী। মানুষের মনের মধ্যে নিত্য যে বিস্ফোরণ ঘটছে তারই প্রজ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ উল্কার মতো পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ জিনিস বাংলা সাহিত্যে সেদিন একেবারেই নতুন ছিল। অনভ্যস্ত বলে অনেক পাঠকের মনেই উত্তাপের ছ্যাঁকা লেগেছিল। লেখককে গালাগাল খেতে হয়েছে প্রচুর। অথচ রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে কোনো অঘটন ঘটাননি যা অনায়াসেই ঘটতে পারত। নরনারীর মনস্তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল, দেহতত্ত্বে ছিল না। স্ত্রীপুরুষে পারস্পরিক আকর্ষণের যে সম্ভাব্য দৈহিক পরিণতি তা এতই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে তার অনাবৃত চিত্র আঁকার মধ্যে তিনি কোনো কৃতিত্ব খুঁজে পাননি। অথচ আজকাল যৌন-জীবনের নগ্ন চিত্রকেই সাহিত্যিক সৎসাহসের চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হচ্ছে। স্ত্রীপুরুষের যেটা আদিমতম সম্পর্ক সাহিত্যে সেটাও দেখছি আধুনিকতম আবিষ্কার। স্থূল মনের একটা লক্ষণ এই যে, যে জিনিস অত্যন্ত obvious তাই তার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। যে জিনিস সকল মানুষের জ্ঞানগোচর তার প্রতি কবিমনের আগ্রহ থাকে না। কবির আগ্রহ অগোচরের প্রতি। এইজন্যে গল্পে উপন্যাসে তিনি মনের ছবিই এঁকেছেন। তথাপি বলব যতখানি সাহস রবীন্দ্রনাথ দেখাতে পারতেন ততখানি তিনি দেখাননি। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বটি এক জায়গায় দ্বিধা বিভক্ত। কবি হিসাবে নারীকে তিনি যতখানি অধিকার দিয়েছেন, ঔপন্যাসিক হিসাবে ততখানি দেননি। যেখানে তিনি কবি সেখানে নীতি-দুর্নীতির শাসন তিনি মানেননি, কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবে সমাজের অনুশাসন তিনি মেনে নিয়েছেন, অন্তত সমাজকে বেশ সমীহ করে চলেছেন। ফলে যুবতী বিধবা বিনোদিনীকে তিনি গিলতেও পারেননি, ফেলতেও পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এই তিন মহারথীর এক রথীও অবলা বিধবাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। রোহিণী, বিনোদিনী, কিরণময়ী—প্রত্যেকেই যে কোন পুরুষের আকাঙ্ক্ষিতা রমণী, কিন্তু তিনজনই স্ব স্ব সৃষ্টিকর্তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা। মনে প্রশ্ন জাগে—এমন যে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর,—বিধবাকে বিবাহের অধিকার দিয়েছিলেন কিন্তু তাকে কি তিনি এমনি ভালবাসার অধিকার দিতেন? বিবাহ এক, ভালবাসা আর। আবার বিধবার বেলায় যে কথা, সধবার বেলায়ও তাই।

আসল কথা, ভালবাসার পূর্ণ স্বাধীনতা নারীকে আজ পর্যন্ত আমরা দিইনি, কোন সমাজই দেয়নি। বিনোদিনীর পাড়াগেঁয়ে দিদিশাশুড়ী মহেন্দ্রকে বলেছিল, "ভদ্রসমাজ বলে একটা ব্যাপার আছে, কাল তুমি মুখ দেখাবে কেমন করে ?" একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে আমরা অত্যাধুনিকরাও মূলতঃ বিনোদিনীর দিদিশাশুড়ী।

ভদ্রসমাজ বলে যে একটা ব্যাপার আছে সেটা শুধু মহেন্দ্র বিনোদিনী নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বিলক্ষণ টের পেয়েছিলেন। 'চোখের বালি'র লেখককে সেদিন প্রচুর গালাগাল শুনতে হয়েছিল। 'নৌকাডুবি'তে রবীন্দ্রনাথ দিব্যি লক্ষ্মীছেলের মতো গোবর খেয়ে, গঙ্গাস্নান করে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। ভয়ঙ্কর রকম বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করেও প্রায় অমানুষিক শক্তিবলে নারীর শুচিতা রক্ষা ক'রে এবং হিন্দু-বিবাহের অলৌকিক মন্ত্রশক্তির মাহাত্ম্য প্রমাণ ক'রে সনাতনীদের সন্তোষ বিধান করেছেন।

'চোখের বালি'র মতো এ গ্রন্থেও মনোবিশ্লেষণের প্রতিই লেখকের ঝোঁক। রবীন্দ্রনাথের কোন উপন্যাসেই ঘটনার বাহুল্য নেই—যা কিছু ঘটছে মানুষের মনের মধ্যেই ঘটছে। আকস্মিক বা রোমাঞ্চক ঘটনা দ্বারা কাহিনীকে চমকপ্রদ করবার চেষ্টা তাঁর উপন্যাসে বিরল। একমাত্র এই গ্রন্থেই নৌকাডুবির মতো একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটেছে এবং তার ফলে কাহিনীর শুরুতেই একটা অত্যন্ত জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি হয়েছে। কাহিনীতে রোমাঞ্চকতা আছে, বিশ্লেষণের কৌশল অনস্বীকার্য, ভাষামাধুর্যে বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী—তথাপি কাহিনীর দুর্বলতা ঢাকা পড়েনি। 'চোখের বালি'তে মানুষের দেহ এবং মনের ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি মেনে নিয়েছিলেন, এখানে তা মানেননি। আপন স্বভাবকে না মানলে মানুষের সব কাজকর্মই অস্বাভাবিক হয়। একান্তভাবে রমেশ-গত-প্রাণ কমলার প্রতি রমেশের ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত হলেও স্বভাবসম্মত হয়নি। ব্যাপারটা সার্কাসের টাইট-রোপ্-ডান্সিং-এর মতো রোমাঞ্চকর, কিন্তু আনন্দদায়ক নয়। কসরতের কৃতিত্ব যতখানি, পৌরুষ ততখানি নয়। ভুললে চলবে না যে এই রমেশ নামক ব্যক্তিটি হেমনলিনীকে ভালবাসে অথচ অতি লক্ষ্মীছেলের মতো পিতার অনুরোধে একটি গ্রাম্য কন্যাকে সে বিয়ে করেছে। শুধু তাই নয়, ব্যাপারটি হেমনলিনীর কাছে গোপন রেখেছে। এহেন দুর্বলচিত্ত মানুষ কমলা-সম্পর্কে দেহের শুচিতা রক্ষার ব্যাপারে এমন সুদৃঢ়চিত্ত—ভাবলে একটু অবাক লাগে। অপরপক্ষে মন্ত্রপড়া বিবাহিত স্বামী নলিনাক্ষকে দর্শনমাত্র কমলার মনে

প্রেমের উন্মেষ হাস্যকররূপে অবিশ্বাস্য। মানুষের মন বড় বেহিসাবী, তাকে বাঁধা ফরমুলায় ফেলতে যাওয়া ভুল। কমলা বেচারীর জন্য আমাদের দুঃখ—রমেশ তার নারীত্বকে অপমান করেছে, কবি-ঔপন্যাসিক তার প্রতি অবিচার করেছেন। রমেশ, নলিনাক্ষ কেউ বড় একটা সুস্থ চরিত্রের মানুষ নয়। একমাত্র সুস্থ চরিত্র হেমনলিনীর। তাকে অনেক দুঃখ পেতে হ'ল। তার দুঃখটিই গ্রন্থটিকে খানিকটা সজীবতা দিয়েছে।

'চোখের বালি'তে যে বিপ্লবাত্মক মনোভাবের সূচনা দেখা গিয়েছিল 'নৌকাডুবি'তে তার ভরাডুবি হয়েছে। 'নৌকাডুবি'র প্রকাশ ১৯০৬ সালে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ—দেশময় হিঁদুয়ানির খুব একটা বন্যা এসেছিল। বোধকরি নৌকাডুবির আসল দুর্ঘটনাটা ঐ বন্যার ফলেই ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে বন্যার জলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কিঞ্চিৎ নাকানি-চুবুনি খেয়েছেন।

নৌকাডুবি এবং গোরার প্রকাশকালের মধ্যে মাত্র চার বৎসরের ব্যবধান। স্বদেশীর স্রোত তখনও পূর্ণবেগে প্রবাহিত। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে দেশ এবং সমাজ সম্পর্কে তাঁর মনে যে নব অভিজ্ঞানের সঞ্চার হয়েছিল তারই প্রত্যক্ষ ফল গোরা উপন্যাস। বাংলাদেশের সবচেয়ে যে প্রাণচঞ্চল যুগ—গোরা সেই যুগের জীবন্ত ইতিহাস। এরূপ বৃহৎ পটভূমিকায় আর কোন উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়নি। স্বদেশী উন্মাদনায় দেশে যে নতুন চেতনা দেখা দিয়েছিল তা দেখে কবি কখনো আশায় উল্লসিত, কখনো ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়েছেন। দেশবাসীর মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যেমন বেড়েছে তেমনি পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ অনুরাগও বেড়েছে। শিক্ষিত হিন্দুরাও সনাতনী হয়ে উঠেছে। অবশ্য বলে রাখা ভালো, গোরার গোঁড়ামি পুরোপুরি সনাতনী হিন্দুর গোঁড়ামি নয়। গোরার মনে বিচারবুদ্ধির অভাব ছিল না। নন্দর শোচনীয় মৃত্যুতে গোরার আক্ষেপোক্তি উল্লেখযোগ্য—"দেবতা, অপদেবতা, পেঁচো, হাঁচি, বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শ—সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে রেখেছে।" মোটামুটি হিন্দু সমাজ এবং হিন্দু ঐতিহ্যকেই সে মেনে নিয়েছে, হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি তার বিশেষ কৌতূহল নেই। নিজ মুখেই সুচরিতাকে বলছে, "তুমি জানতে চাও আমার মন কোনদিন ঈশ্বরকে চেয়েছে কিনা। না, আমার মন ওদিকেই যায়নি।" এদিক থেকে গোরা ঈশ্বরে উদাসীন আধুনিক যুবকদেরই একজন। তথাপি তার মধ্যে যে গোঁড়ামি দেখছি এ হচ্ছে একজাতীয় 'মডার্ন' গোঁড়ামি। এটা স্বদেশীয়ানার বাই-প্রডাক্ট।

অর্থাৎ বিলিতিয়ানার এ হচ্ছে একটা সদম্ভ প্রত্যুত্তর। অসহযোগ আন্দোলনের যুগেও আমরা এ জিনিস দেখেছি।

যে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করবে, ভাবা গিয়েছিল, তারও গায়ে একটি কঠিন আস্তরণ দেখা দিয়েছে, ব্রাহ্মসমাজেও গোঁড়ামি প্রবেশ করেছে। পানুবাবু তার দৃষ্টান্তস্থল। ব্রাহ্মসমাজের যে উদার এবং সত্যদৃষ্টি তাঁর অভিপ্রেত ছিল পরেশবাবু তার প্রতীক। অপরপক্ষে হৃদ্‌গত সহজবুদ্ধির গুণে আনন্দময়ীর নির্মল দৃষ্টি হিন্দুসমাজেও সম্ভব। এখানে বলে নেওয়া ভালো যে আনন্দময়ী গোরা উপন্যাসের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য চরিত্র। এই চরিত্রের মধ্যে কবি ভারতবর্ষের সমগ্র জীবন-দর্শনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। হিন্দুধর্ম যে দেবদেবীতে নয়, মন্দিরে নয়, পূজার্চনায় নয়, শাস্ত্রগ্রন্থে নয়—এ যে একধরনের জীবনধারা মাত্র,—এই কথাটি আনন্দময়ী-চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন। আনন্দময়ী ভারতবর্ষের প্রতীক। "মা, তুমিই আমার ভারতবর্ষ" —গোরার মুখের এই উক্তি মিথ্যা নয়।

হিন্দুধর্মে না হলেও হিন্দুসমাজের মূলে একটি নির্মমতা আছে। জন্মাধিকারে যে হিন্দুত্ব লাভ করেনি হিন্দুসমাজ তাকে হিন্দু বলে গ্রহণ করতে নারাজ। গোরা মনেপ্রাণে হিন্দু, এমনকি হিঁদুয়ানির আতিশয্যে নিজেকে অল্পাধিক পরিমাণে হাস্যকরও করেছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুধর্মের জন্মদাতা ভারতবর্ষকে সে যে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে এ-কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু জন্মরহস্য উদ্ঘাটিত হওয়ামাত্র হিন্দু-গত-প্রাণ গোরা একমুহূর্তে আবিষ্কার করল,—এই বিরাট হিন্দুসমাজে, সনাতন ভারতবর্ষে তার এতটুকু দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। ইংরেজ ডাক্তার কৃষ্ণদয়ালকে পরীক্ষা করছে, অদৃষ্ট-বিড়ম্বিত গোরা মনে মনে ভাবছে এই লোকটাই আজ সবচেয়ে তার নিকট আত্মীয়। সমস্ত কাহিনীর মধ্যে এইটিই করুণতম মুহূর্ত।

হ্যামার গ্রেন নামে একজন সুইডিস যুবক ভারতীয় সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এদেশে এসেছিলেন। এখানে অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। হিন্দু প্রথানুযায়ী তাঁর দেহ দাহ করা হয়, মৃত্যুর পূর্বে এই ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। যিনি অহিন্দু, হিন্দুমতে তাঁর দেহসৎকার হবে এই প্রস্তাবে হিন্দুসমাজে তুমুল বিতর্কের শুরু হয়। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ অতিশয় লজ্জিত এবং ব্যথিত বোধ করেছিলেন। নিবেদিতাও মনেপ্রাণে হিন্দু ছিলেন কিন্তু হিন্দুসমাজ তাঁকে অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করেছিল কিনা সে-বিষয়ে হয়তো রবীন্দ্রনাথের মনে সন্দেহ

ছিল। বলা যায় না, গোরার চরিত্রসৃষ্টিতে এসব প্রশ্ন তাঁর মনের অন্তরালে হয়তো কিঞ্চিৎ ক্রিয়া করেছে।

গোরা উপন্যাস বাংলাদেশের এক যুগের ইতিহাস তো বটেই; তা ছাড়াও নানা দিক থেকে এই গ্রন্থ আমাদের সাহিত্যে এক ঐতিহাসিক স্থান অধিকার করে আছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে আমাদের পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। হিন্দুসমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত; ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, এ তিনি চাননি। হিন্দু-ব্রাহ্ম বিবাহ প্রবর্তনের প্রস্তাব এই গ্রন্থেই উত্থাপিত হয়েছে। ব্রাহ্ম-কুমারীর পাণিগ্রহণ করতে হলে হিন্দু যুবককে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, এ ব্যবস্থাকে তিনি স্বীকার করেননি। তাঁর নির্মল দৃষ্টিতে আগামী দিনের সমাজকে তিনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

প্রবলের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের গোড়া থেকেই করে এসেছেন। নানা প্রবন্ধে নানা ভাষণে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার কথা নিরন্তর বলেছেন। কাব্যেও বহুবার এ-কথা ঘোষণা করেছেন—"যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে"। গল্পে উপন্যাসেও বাদ যায়নি। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে জেলেদের হয়ে শশিভূষণের প্রতিবাদ, ফলে লাঞ্ছনা; ঘোষপুর চরের প্রজাদের পক্ষে গোরার প্রতিবাদ, ফলে তারও লাঞ্ছনা এবং কারাবাস। এ সূত্রে স্মরণ করা কর্তব্য গোরা আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকিল নিযুক্ত করেনি। বলেছিল, সুবিচার করার গরজ রাজার। ন্যায়বিচার পয়সা দিয়ে কিনতে সে রাজি হয়নি। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে আত্মপক্ষ সমর্থনের পালা গান্ধীজী তুলে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির এটি আরেকটি নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের আবহাওয়ায় লালিত; কিন্তু শেষজীবনে দেখা যায় তিনি কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্ম 'মানুষের ধর্ম'কেই তিনি মেনে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এ জিনিসটি হঠাৎ একদিনে হয়নি। কয়েকটি বিশেষ আদর্শকে তিনি আজীবন মনের মধ্যে লালন করেছেন। তাঁর শেষজীবনের মানুষের ধর্ম এই উপন্যাসের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। যে দুজন মানুষ—পরেশবাবু ও আনন্দময়ী সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে সকল সমস্যাকে দেখেছেন—তাঁরা হিন্দু বা ব্রাহ্ম কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। পরেশবাবু এবং আনন্দময়ী

দুজনেই বলতে গেলে স্বজন-পরিত্যক্ত। এঁদের দুজনেরই ধর্ম মানুষের ধর্ম। হিন্দুসমাজে লালিত হিন্দু মহিলা আনন্দময়ীর উক্তি—যেদিন তোকে (গোরাকে) কোলে নিয়েছি সেদিনই জেনেছি জাত নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করেনা—অত্যন্ত বিস্ময়কর হলেও যে-কোন মাতৃজাতীয়ার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক উক্তি। গোরা রচনারও আগে রাজর্ষির কাহিনীতে বিশ্বন ঠাকুর নামে সেবাব্রতী যে মানুষটিকে আমরা দেখেছি তাঁর কোন জাতবিচার নেই দেখে হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। বিশ্বন বলেছিলেন, আমার কোন জাতি নেই, আমার জাত মানুষ। দেখা যাচ্ছে, শেষবয়সে তিনি যে নিরন্তর বলেছেন, পৃথিবীতে একটি মাত্র জাতি আছে, তার নাম মানুষ জাতি, একটি মাত্র ধর্ম আছে, তার নাম মানুষের ধর্ম—এই বিশ্বাস তিনি অকস্মাৎ একদিন স্বপ্নযোগে লাভ করেননি। যৌবনকাল থেকেই এই আদর্শ তাঁর চিন্তা এবং কর্মকে প্রভাবিত করে এসেছে।

ইতিমধ্যে ঘরে বাইরে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, পৃথিবীময় খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছে। ঘরের কাছে উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে 'সবুজপত্র'র জন্ম। লক্ষ্য করবার বিষয়, 'সবুজপত্র'র জন্ম ১৩২১ সালের ২৫শে বৈশাখ। 'সবুজপত্র'র জন্মের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যেও একটি নতুন সুরের জন্ম হয়েছে। এই সুরটি প্রধানতঃ যৌবনের সুর। কাব্যে গানে গল্পে প্রবন্ধে—দেশের নবীন যৌবনকে তিনি উদ্‌বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন। 'গোরা'তে তিনি যে যুবক সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন—গোরা এবং বিনয় যাদের মুখপাত্র—তারা স্বদেশগত প্রাণ; স্বদেশের ধর্মে, স্বদেশের ঐতিহ্যে তাদের আস্থা। ইতিমধ্যে দেশে আরেকটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অত্যুগ্র যুক্তিবাদী এদের মন, প্রচলিত বিশ্বাসে এরা সম্পূর্ণ আস্থাহীন। 'চতুরঙ্গ'র কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ এই নতুন যুবক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদিগকে পরিচিত করেছেন। জ্যেঠামশায় এই যৌবনের দীক্ষাগুরু—বয়সে প্রাচীন, অন্তরে নবীন। শচীশ জ্যেঠামশায়ের চ্যালা। যেসব ধ্যানধারণা জ্যেঠামশায় তাঁর মনে মজ্জার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন সেসব জিনিস শচীশের মনে পাকা হয়ে বসবার আগেই জ্যেঠামশায় গত হয়েছেন। এদিকে শচীশের মনে তিনি যে অগ্নিশিখাটি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছেন তার দাহনক্রিয়ায় সে নিয়ত দগ্ধ আর সেই প্রজ্বলন্ত শিখায় আত্মাহুতি দিয়েছে দামিনী। আগুনের মোহন রূপে সে মুগ্ধ।

জ্যেঠামশায়ের মতে ভক্তির চাইতে যুক্তি, ধর্মের চাইতে কর্ম এবং ভগবৎ-প্রেমের চাইতে মানবপ্রেম বড়। শচীশ যুক্তির অন্তহীন পথে দিশেহারা হয়ে ভক্তির পথ ধরেছে। দামিনী ভক্তির যূপকাষ্ঠে বাঁধা বলেই ধর্মবিমুখ। ভগবানকে চায় না, মানুষকে চায়, পুরুষকে চায়। শচীশ মানুষের সেবা ছেড়ে ভগবৎসেবায় মন দিয়েছে। কামনা বর্জনীয়, অতএব কামিনী। দুই ভিন্নমুখী পথে শচীশ আর দামিনীর নিত্য আবর্তন। একজনের মনে সাধ, আরেকজনের সাধনা। দু'এর পথ ভিন্ন কিন্তু মনের গড়ন এক। দুজনেই অগ্নিগর্ভ। দুই দাহ্য পদার্থের সান্নিধ্য বিপজ্জনক, প্রতিমুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা। তার ছ্যাঁকা লাগে বেচারী শ্রীবিলাসের মনে। জ্যেঠামশায়, শচীশ দুজনেই সৃষ্টিছাড়া মানুষ। শ্রীবিলাস অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ, অতএব নিরাপদ। দামিনী মেয়েমানুষ। তার আশ্রয় প্রয়োজন—হয় স্বামী, না হয় গুরু। শ্রীবিলাস তার নিরাপদ আশ্রয়। বলা বাহুল্য, শ্রীবিলাসের মধ্যে সে শচীশকেও পেয়েছে। সে যাকে বিয়ে করেছে সে কেবলমাত্র শ্রীবিলাস নয়। শ্রীবিলাস এবং শচীশকে মিলিয়ে যে তৃতীয় এক ব্যক্তিসত্তা তাকেই সে বিয়ে করেছে। তার নীড়ও চাই, আকাশও চাই—শ্রীবিলাস তবে নীড়, শচীশ তার আকাশ।

কয়েকটি অনন্যসাধারণ চরিত্রের সমাবেশে 'চতুরঙ্গ'র রঙ্গমঞ্চে এক অভিনব জীবননাট্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে পরিণত হলে এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের সবচাইতে শক্তিশালী উপন্যাসের গৌরব লাভ করতে পারত।

'ঘরে বাইরে' এবং 'চতুরঙ্গ'র রচনাকাল এক। স্বদেশী যুগের বাঙালী-জীবনে অকস্মাৎ যে আলোড়ন এসেছিল সেটিকেই বলা চলে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের পটভূমিকা। সেদিন দেশে যে রাজনৈতিক ঝোড়ো হাওয়া উঠেছিল তা শিক্ষিত বাঙালী-গৃহের সদর অতিক্রম করে অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছিল। ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় অন্দরমহলের পর্দাগুলোকে উড়িয়ে ঝুড়িয়ে নেবে তাতে আর বিচিত্র কি? মেয়েরা সবে চিকের আড়াল থেকে স্বদেশী বক্তৃতা শুনতে শুরু করেছিল। স্বামীর বন্ধু এসেছেন স্বদেশী প্রচার করতে। সভায় যখন অগ্নি-উদ্‌গিরণ শুরু হয়েছে, সমস্ত সভাকক্ষ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, উত্তেজনাবশে বিমলা কখন চিক সরিয়ে দিয়ে বক্তার মুখের উপরে তার বিস্মিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে বক্তার দুই চোখ এসে পড়েছে সেই অনাবৃত মুখের উপরে। মুখ সরিয়ে নেয় বিমলার এমন হুঁশ ছিল না। বক্তার ভাষার আগুন আরো উঠল জ্বলে, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চমকানি। বিমলার পক্ষে এ এক অপূর্ব

অভিজ্ঞতা। এখানেই জমল নবযুগের নাট্য। নিখিলেশের বিয়ে হয়েছে আজ ন'বছর, কিন্তু বনেদি ঘরের সদরে অন্দরে অনেক ব্যবধান। ন'বছরের বন্ধুপত্নীর সঙ্গে সন্দীপের সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। নিখিলেশ হাল আমলের মানুষ—বাইরের সঙ্গে ঘরের যোগ হয় এই ইচ্ছা তার মনে ছিল। বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে অন্দরমহলে যে স্ত্রীকে সে পুরে রেখেছে তাকে সে যেন চুরি করে পেয়েছে। দশের সঙ্গে মিশে দশের মধ্য থেকে বিমলা তাকে বেছে নিক—সেইটে হবে সত্যিকারের পাওয়া, বীরের মতো পাওয়া। মন্ত্রপড়া বিয়ের ফাঁকিতে তার মন ওঠেনি। বিমলাকে এসব কথা সে বলেছে। শুনে বিমলা রাগ করত। তাদের দুজনের স্বামীস্ত্রী সম্পর্কের মধ্যে কোথাও ফাঁকি আছে, এমন কথা সে স্বীকার করত না। মুখে বললে তো হয় না, পরীক্ষায় প্রমাণ চাই। নিখিলেশ যখন নিজেকে বীরের আসনে বসিয়ে বিমলাকে স্বয়ম্বৃতা পত্নী হিসাবে পেতে চেয়েছে আর বিমলা যখন ভেবেছে স্বয়ম্বৃতা না হয়েও সে একান্তভাবে পতিব্রতা তখন দুজনের একজনও জানত না যে সংসারের অগ্নিপরীক্ষায় ভাববিলাসিতা কত সহজে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সবচেয়ে হাস্যকর এই যে বহির্জগতের প্রথম পুরুষটির সংস্পর্শমাত্রই পাতিব্রত্যে ফাটল দেখা দিল। আর নিখিলেশ? যে অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা বলতে গেলে সে নিজেই করেছে তার অগ্নিদাহন যে কি ভয়ঙ্কর জ্বালাময় সে কি তা জানত?

নিখিলেশ অন্তর্বিহারী মানুষ, মনের অন্তঃপুর বড় দুর্গম স্থান। শুধু পত্নী হলেই স্বামীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করা যায় না, তাকে সহধর্মিণী হতে হয়। বিমলা কোনকালেই নিখিলেশের সহধর্মিণী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে নিখিলেশই তার কাছে পরপুরুষ। শাস্ত্রে বলে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। সন্দীপ এবং বিমলার পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ, সেটা ওদের দুজনের পক্ষেই স্বধর্ম। ওতে বরং নিধনও শ্রেয়ঃ ছিল অর্থাৎ এ আকর্ষণের যে যৌক্তিক পরিণতি তাতে একটা ভয়ঙ্কর রকমের সামাজিক কেলেঙ্কারি ঘটতে পারত। জীবনে অনেক কিছু ঘটে—সমাজ যাকে মানতে চায় না। যিনি আর্টিস্ট তিনি মনে মনে জানেন যে সমাজের চাইতে জীবনের দাবি বড়। রবীন্দ্রনাথ মনে যা জেনেছেন লেখনীর মুখে তা স্বীকার করতে পারেননি। জীবনের দাবিকে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। এমন যে সন্দীপ তারও ব্যবহার অস্বাভাবিক। গোড়ার দিকে বলেছে, "যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেটুকুই আমার, এ কথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা

শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটিই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা।" সেই মানুষই পরে বলছে, "এক একটা মুহূর্ত এসেছে যখন বিমলার হাত চেপে ধরে তাকে আমার বুকের উপর টেনে আনলে সে একটি কথা বলতে পারতনা। সেই মুহূর্তগুলিকে বয়ে যেতে দিয়েছি।" এই যে দ্বিধা এবং সংকোচ এটা সন্দীপের প্রকৃতিতে নেই। এই দ্বিধাটুকু লেখকের নিজের। আপন সৃষ্ট চরিত্র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ভাব অবলম্বন করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অনেক সময়েই সম্ভব হয়নি।

যাক্, শেষ পর্যন্ত লঙ্কাকাণ্ড ঘটল কিন্তু সীতা-উদ্ধার যত সহজ, সীতাকে ঘরে এনে প্রতিষ্ঠিত করা তত সহজ নয়। সীতা-উদ্ধারের পরে সীতাকে বনবাস। আসল ট্র্যাজেডিটা ঐখানে। বিমলাকে কি নিখিলেশ সত্যি সত্যি ফিরে পেয়েছে? ভাঙা মন কি জোড়া লাগে? বিমলা এখন নিখিলেশকে পূজো করতে শিখেছে; কিন্তু পূজো কি ভালোবাসার স্থান পূরণ করতে পারে?

হিন্দুসমাজে সহধর্মিণী হওয়ার দায় স্ত্রীর অর্থাৎ স্ত্রীকেই স্বামীর যোগ্য হতে হয়। শাস্ত্রে কেবল উমার তপস্যারই বিধান আছে। শিবতুল্য স্বামীরা পত্নীলাভের জন্য তপস্যা করেন না। তাঁরা সংসারের অন্যান্য কামনীয় পদার্থ অর্থাৎ ধন মান পদগৌরব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির তপস্যায় লিপ্ত থাকেন। স্ত্রীরা এসে পাছে তাঁদের স্বভাবসুলভ তরলতা বশতঃ স্বামীদের তপোভঙ্গ করে সেইজন্যেই বোধকরি তাদের সহধর্মিণী হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বহু শতাব্দী এই ভাবে কেটেছে, বিংশ শতাব্দীতেই প্রথম কথা উঠল স্বামীকেও নারীরত্ন লাভের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আমরা কেবল পরপুরুষ কথাটাই শিখে রেখেছিলাম কিন্তু তার আসল তাৎপর্য বুঝিনি। স্বামী স্ত্রী যদি ভাবে স্বভাবে একধর্মী না হয় তবে স্বামীও যে পরপুরুষ হতে পারে আধুনিক সমাজে এই নিয়ে আজ আর তর্ক উঠবে না। 'যোগাযোগ'-এর নায়িকা কুমুদিনী আধুনিকা নয়। মা-ঠাকুরমার মতো ছেলেবেলায় সেও বোধকরি শিবপূজা করেছে। একালের মেয়েরা জোর গলায় পুরুষের সমান অধিকার দাবি করে। কুমুদিনীর কোন দাবি নেই। সে শুধু চেয়েছে স্বামীকে যেন শ্রদ্ধা করতে পারে, ভালোবাসতে পারে। সেখানেই বেচারী ধাক্কা খেয়েছে। মধুসূদন মানুষটা মূলতঃ খারাপ নয়। আপন শক্তি-সামর্থ্যে সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আপন পুরুষকারে বিশ্বাসী। সম্ভ্রান্তবংশীয়া কুমুদিনীকে সে ভুজবলে অর্জিত সম্পত্তির অংশ বলে মনে করেছে। কেবলমাত্র অর্থবলে যে জিনিস লাভ করা যায় তাতেই অনর্থ

ঘটে। সংসারে অনেক কিছু সে জয় করেছে, নারীচিত্তকেও যে জয় করতে হয় সে-কথা কখনও ভেবে দেখেনি।

সংঘর্ষ বেধেছে দুজনের রুচিতে। "জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে—জীবনবীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে"। মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে তা শুধু যে কুমুকে আঘাত দিয়েছে এমন নয়, ওকে লজ্জা দিয়েছে। ওর অনেক কাজ, অনেক ব্যবহার কুমুর কাছে অশ্লীল মনে হয়েছে। তবে এ-কথাও ঠিক, শুচিবাইগ্রস্ত মেয়েদের মতো, কুমু একটু যেন অতিরিক্ত রুচিবাইগ্রস্ত। মনে হয় মধুসূদনের প্রতি ও একটু যেন অবিচার করছে। তা ছাড়া বিপ্রদাস ওর মনকে এত অধিক পরিমাণে অধিকার করে আছে যে তাতেও মধুসূদনের লাগছে। মধুসূদনের উষ্মা—নুরনগরী চাল, দাদার ইস্কুলে শেখা—রূঢ় হলেও অস্বাভাবিক নয়। মধুসূদন কার্যতঃ যে পাণ্টা জবাব দিয়েছে, শ্যামাকে প্রশ্রয় দিয়ে,—সে ব্যাপারটা অত্যন্ত স্থূল বলতেই হবে; কিন্তু এ-কথাও সত্য সেটা শ্যামার আকর্ষণে নয়, কুমুর প্রতি অভিমান এবং আক্রোশ বশতঃ।

অসুস্থ দাদাকে দেখতে এসে কুমু ঠিক করেছে স্বামীর ঘরে আর ফিরে যাবে না। কিন্তু ফিরতে হল অপমানে বেদনায়। যে বিপ্রদাস বলেছিল, অসম্মানের চাইতে সর্বনাশও ভালো, তাকেও নতিস্বীকার করতে হল, "তোর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করব কোন্ স্পর্ধায়?" কত বড় পরাজয়! স্বামিপূজার সংস্কার মনের মধ্যে বজায় রেখেও কুমু যে স্বামীকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি তার সঙ্গে রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। নারী যে তার দেহের মধ্যে বায়োলজির একটি অমোঘ বিধানকে বহন করে চলেছে কুমুর বেলায় সেটিই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়েছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিনের উল্লেখ। ভোর থেকে আসছে ফুলের তোড়া আর অভিনন্দনের টেলিগ্রাম। আজকের আনন্দের দিনে বহুদিন আগের সেই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির কথাটি কেউ ভাবছে না, সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে এই কাহিনী। এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে রবীন্দ্রনাথ সংসারের অনেক রূঢ় বাস্তব সত্যের খুব কাছাকাছি এসেছেন।

'গোরা' এবং 'ঘরে বাইরে'র বেলায় যেমন, 'শেষের কবিতা'রও তেমনি একটি পশ্চাভূমিকা আছে। তখনকার দিনের একটি সাহিত্যিক বিতর্ক থেকে এই গ্রন্থের উদ্ভব। নব্যতন্ত্রীরা তখন রবীন্দ্রনাথকে 'সেকেলে' আখ্যা দিয়ে জাতে ঠেলবার উপক্রম করেছেন। তিনি বৃদ্ধ অতএব এখন নবীনদের হাতে

ভবিষ্যতের ভার ছেড়ে দিয়ে মানে মানে তাঁর সরে পড়া উচিত। এঁদের যৌবনের আস্ফালন দেখে রবীন্দ্রনাথ বেশ একটু কৌতুক বোধ করেছিলেন। যৌবনের গর্ব করো তোমরা, যৌবনের তোমরা কি জান? এই দেখ যৌবন কাকে বলে—সৃষ্টি হ'ল অমিট্ রায়ে—তোমাদের মতো বয়স মিলিয়ে কুষ্ঠির প্রমাণে যুবক নয়—বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী যৌবন—বান ডেকে ছুটে চলেছে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে।

স্যাটায়ারের উদ্দেশ্য নিয়ে লিখতে বসেছিলেন কিন্তু দু'পাতা লিখতে-না-লিখতে লেখক আপন গল্পের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। এমন দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসে আরো আছে। ফিল্ডিং যেমন রিচার্ডসন্‌কে বিদ্রূপ করতে গিয়ে উঁচুদরের উপন্যাস লিখে ফেললেন—এও তেমনি। এখানে ওখানে যুবক-সম্প্রদায়ের প্রতি খোঁচা আছে। রবিঠাকুরকে গাল দিতে চাও, বেশ তো, দাও না, তারও একটা ভাষা আছে, ভঙ্গি আছে—এই নাও লিখে দিলাম অমিট্ রায়ের জবানিতে রবীন্দ্র-বিরোধী এক বক্তৃতা। আর সাহিত্যে তোমাদের যা দাবি-দাওয়া, রবিঠাকুর যে-দাবি মেটাতে পারেননি, দাঁড়াও তারও একটা ফর্দ তৈরি করে দিচ্ছি—"চাই কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো—ন্যূর‍্যালজিয়ার ব্যথার মতো, খোঁচাওয়ালা কোণওয়ালা", ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্যাটায়ারের পর্ব প্রথম পরিচ্ছেদেই শেষ। মানুষের যৌবনলীলা কবিমনকে চিরকাল উল্লসিত করে এসেছে। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। যে যুবকদের উদ্দেশ করে বিদ্রূপ বর্ষণ করবেন ভেবেছিলেন তাদেরই যৌবনরসে মন তাঁর অভিষিক্ত হ'ল। মনের সমস্ত অনুরাগ দিয়ে লিখলেন এদের প্রেমকাহিনী। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে এদের প্রণয়লীলা নিতান্তই একটা পোশাকী ব্যাপার। 'শেষের কবিতা'র কাহিনী আগাগোড়া অবাস্তব। পাঠক মাত্রেরই মনে প্রশ্ন জাগবে, এরা কোথাকার লোক, কোন্ অলকার অধিবাসী? এদের আপিস আদালত নেই, চাকরি-বাকরি নেই, সংসারের চিন্তা-ভাবনা নেই। ব্যাপারটা যেখানে ঘটছে সে কি শিলং-পাহাড়ে না মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের মাঝখানে সেই হাজার-ক্রোশী খালটার ধারে? কিন্তু যেখানেই হোক, কাহিনীটা যতই অবাস্তব হোক তথাপি বলব জিনিসটা সত্য। মেঘদূতের কাহিনীও অবাস্তব কিন্তু তাই বলে অসত্য নয়। জীবনের সঙ্গে পুরো যোগ

নেই কিন্তু যৌবনের সঙ্গে আছে। মেঘদূত যৌবনের কাব্য, প্রেমের ভাষ্য। 'শেষের কবিতা' সেই অর্থে আমাদের নব মেঘদূত। সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে একটি অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সেই পরিবেশটি লাবণ্যময় অর্থাৎ যৌবনময়। যৌবনের অফুরন্ত লাবণ্যের কথা রবীন্দ্রনাথ একাধিক কবিতায় উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই গ্রন্থের মধ্যে শিশুও নেই বৃদ্ধও নেই। একমাত্র বর্ষিয়সী মহিলা যোগমায়া। বোধকরি অমিট্ রায়ের ঘটকালিতে সাহায্য করবার জন্যেই তাঁর অবতারণা, নইলে তাঁকে বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। মজার কথা এই যে, যোগমায়া প্রস্তাব শুনেই বলেছিলেন, বাবা, ভয় হচ্ছে ব্যাপারটা না শেষ পর্যন্ত—ঠাট্টা হয়ে দাঁড়ায়! বুঝতে পেরেছিলেন, এরা মন-দেয়া-নেয়ার খেলায় মত্ত, বিয়ের দায়িত্ব এদের সইবে না।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিয়ে হ'ল কিন্তু সে যেন এক খেলাভাঙার খেলা—অর্থাৎ যৌবনলীলা সাঙ্গ হ'ল। সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্থাৎ যৌবন শেষ হলে বুদ্ধিমানেরা ষোলো-আনার আশা ছেড়ে দিয়ে আদ্ধেক নিয়েই তুষ্ট থাকে। লাবণ্যর বদলে কেটি মিত্তির এমন কি খারাপ, অমিতের বদলে শোভনলাল? হিসেবে ঠিক আছে, দুজন জিতেছে, দুজন হেরেছে। কেটি জিতেছে কারণ ভালোবাসা ওকে কাঁদিয়েছে, তাই ও পেয়েছে। শোভনলাল জিতেছে কারণ তার প্রেম অমৃত। প্রতিদান না পেয়েও প্রেমের শিখাটিকে কতকাল মনের অন্তরালে সে জ্বালিয়ে রেখেছে। কিন্তু শোভনলালকে গ্রহণ করেও লাবণ্যর মুখে এ কী অশোভন উক্তি—হেথা মোর তিলে তিলে দান—এই যদি মনে ছিল তবে ওকে গ্রহণ করা কেন, ওর প্রেমকে অপমান করবার অধিকার তাকে কে দিল? বরঞ্চ অমিতের ব্যবহার ঢের বেশি শোভন। তার কেটি-ও রইল, লাবণ্য-ও রইল—একজনের চাই সঙ্গ, আরেকজনের আসঙ্গ!

আগেই বলেছি 'শেষের কবিতা' যৌবনের কাব্য। ভয়ঙ্কর রকমের আধুনিক—অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে পড়া, চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে স্ত্রীপুরুষের মেলা। তথাপি মনে হয় কোথাও যেন এই কাহিনীর সঙ্গে আমাদের রূপকথার একটা আদল আছে। আধুনিক উপন্যাসের তৌলদণ্ডে বিচার করতে গেলে ওর প্রতি অবিচার হবে। উপন্যাস হিসাবে নিঃসন্দেহে দুর্বল কিন্তু কাব্যগুণে, ও মুহূর্তে বাংলাদেশের হৃদয় হরণ করেছিল। এক যুগ গিয়েছে যখন 'শেষের কবিতা' আমাদের যুবক-সম্প্রদায়ের বাইবেল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভাষায় এবং ভঙ্গিতে এর বহু অনুকরণ আমাদের গল্পে উপন্যাসে হয়েছে। 'চতুরঙ্গ' থেকে শুরু

করে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতিতে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার সবচাইতে মহিমান্বিত রূপের প্রকাশ 'শেষের কবিতা'য়। ভাষার দীপ্তি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মনকে যেমন চকিত করে, মনোযোগকে তেমনি বিক্ষিপ্ত করে। হয়তো তাতে কাহিনীর গতিতে বাধারও সৃষ্টি করে। কিন্তু সব মিলিয়ে স্বীকার করতেই হবে—তীক্ষ্ণ, তির্যক বাক্যভঙ্গির প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের গল্প উপন্যাস বাংলা গদ্যে অমিত শক্তির সঞ্চার করেছে।

'শেষের কবিতা'র পরে রবীন্দ্রনাথ যে তিনটি উপন্যাস লিখেছেন তার প্রত্যেকটিই অতিশয় ক্ষীণ-কলেবর।—এদের উপন্যাস আখ্যা দিলে 'নষ্টনীড়' কেন উপন্যাস নয় তা আমি বুঝতে পারিনে। আর 'নষ্টনীড়'কে যদি উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহলে উক্ত কাহিনীকে আমি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে গণ্য করব।

'দুই বোন' এবং 'মালঞ্চ' যমজ গ্রন্থ। আখ্যানবস্তু এক, স্ত্রী বর্তমানে অপর রমণীর প্রতি আকর্ষণ। নতুন কিছুই নয়, সংসারে ঘটেই থাকে কিন্তু নির্বিবাদে ঘটে না। এই নিয়ে গার্হস্থ্যাশ্রমে ভয়ঙ্কর রকমের সংঘাত ঘটতে পারে। 'দুই বোন'-এ ব্যাপারটা অতিশয় নিঃশব্দে ঘটছে, সেটাই অস্বাভাবিক। এতদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় এতবড় একটা পরিবর্তন এসেছে, শশাঙ্কর মনে তাই নিয়ে যথেষ্ট দ্বন্দ্ব নেই। যেখানটায় হাত পড়লে দাম্পত্যজীবনের শিকড়সুদ্ধ টান পড়ে, বেদনায় টন্‌টন্ করতে থাকে বুকের সবগুলো পাঁজর, শর্মিলার মধ্যেও বেদনার সেই তীব্র অনুভূতি নেই। মা যেমন অবুঝ শিশুর আবদারে প্রশ্রয় দেন, শর্মিলার মনে শশাঙ্কর প্রতি সেই প্রশ্রয়। যে তাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করছে সে তার আপন সহোদরা,—তাতে সান্ত্বনা থাকবার কোনই কারণ নেই, বরং সেই কারণেই ব্যাপারটা আরো বেশি মর্মান্তিক। কিন্তু শর্মিলা যেন নিজেই দু'হাত মিলিয়ে দিতে চাইছে। তোমরা সুখী হও, তোমাদের সুখেই আমার সুখ। ব্যাপারটা অমানুষিক। নিখিলেশ যেমন রক্তমাংসের মানুষ নয়, একটা যেন আইডিয়া, শর্মিলাও তেমনি একটি আইডিয়া মাত্র। এমনকি নিখিলেশের মনে যেটুকু বেদনাবোধ, শর্মিলার মনে সেটুকুও নেই।

'দুই বোন' রচনায় রবীন্দ্রনাথের হিসেবে ভুল হয়েছিল। একে আর একে দুই হয় এইটুকুই শুধু দেখেছেন কিন্তু একের থেকে এক বাদ দিলে যে শূন্য হয়, সে কথাটা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। 'মালঞ্চে' সেই হিসেবটাই শোধরাবার

চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ একই সমস্যাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এবারে দেখেছেন। শর্মিলা আর নীরজা দুজনেই অসুস্থ—শর্মিলা দেহে এবং মনে উভয়তঃ অসুস্থ। নীরজার দেহ অসুস্থ, মন সুস্থ। সে জানে তার মন কি চায়। তবু দুর্বলমুহূর্তে মনে মনে খুব বড় রকমের একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। আয়ুর শেষ সীমায় এসে পৌছেছে, তার ক্ষীণ মুঠিতে আয়ুকে সে আর ধরে রাখতে পারবে না, আর আয়ুর চাইতেও অ-স্থির যে স্বামীর মন তাকেই বা সে ধরে রাখবে কেমন করে? ভেবেছিল যাকে সে কোনমতেই রাখতে পারবে না, যাবার আগে তাকে প্রসন্ন মনে দিয়ে যাবে,—যে রমণী তার সর্বসুখের হন্তা তারই হাতে। পারলে অবশ্যই আমাদের সমাজে দেবী আখ্যা নিয়ে মরতে পারত। কিন্তু নীরজা একেবারে নির্ভেজাল মানুষ, তায় মেয়েমানুষ—অল্প লইয়া থাকে,—স্বামী আর তার বাগান, এই নিয়ে তার জগৎসংসার। সে পারেনি—"পারলুম না, পারলুম না—দিতে পারব না, পারব না।"—এই তার শেষ আর্তনাদ। মৃত্যুর আগে কেউ জ্ঞাতসারে মিথ্যা কথা বলে না। নীরজা মরেছে, কিন্তু মরেও জীবনের সত্য রক্ষা করে গিয়েছে। শর্মিলা বেঁচে আছে, কিন্তু বেঁচে থেকেও জীবনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেনি কারণ সে জীবন্মৃত।

'চার অধ্যায়' রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদের পটভূমিকায় লেখা। ১৯৩০-এর আগে আর পরে কয়েকবছর ধরে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল। বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয়, মেয়েরাও এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। দেশের বহু নির্ভীক, চরিত্রবান তরুণের আত্মবলি কবির কাছে মর্মান্তিক অপচয় বলে মনে হয়েছিল। সেই মর্মবেদনা এই কাহিনীর মধ্যে মিশে আছে। কাহিনীর সূত্রপাতে দেখছি দলপতি ইন্দ্রনাথ জেনেশুনেই মেয়েদের এই অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে ডেকে এনেছেন। তাঁর মতে দেশ অর্ধনারীশ্বর—মেয়ে-পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি। এলাকে বলছেন, "কেমন করে তুমি বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেটুকু বাদ দিয়ে কেবল শুখো মাইনেয় কাজ করাতে গেলে পুরো কাজ পাবনা।"

অন্তু এই দলে এসে জুটেছে দেশের টানে নয়, এলার টানে। সত্যি বলতে কি, এলা-ই ওকে টেনে এনেছে। এলা দেশের কাছে বাগ্‌দত্তা, পণ করেছে বিয়ে করবে না। পণ করা সহজ, মনকে বাগানো সহজ নয়। এক দিনের আকস্মিক সাক্ষাতের ফলে এলা তার মন বিকিয়ে দিয়েছে অন্তুকে।

কে জানত একদিন মনের মানুষ এসে দেখা দেবে তখন দল দেশ ধর্ম সমস্ত যাবে ভেসে। সেই বন্যা এসেছে জীবনে কিন্তু এলার পায়ে পণরক্ষার বেড়ি বাঁধা। অন্তু আর্টিস্ট মানুষ, সে সাহিত্যিক। দেশোদ্ধারের রক্তে-লেখা বীর রস তার মনকে সিক্ত করেনি। দেশমাতৃকাকে যে অর্ঘ্য যোগাতে পারেনি সে-অর্ঘ্য এনে দিয়েছে এলার পায়ে। দলের হয়ে পলিটিক্যাল ডাকাতিতে যোগ দিয়েছে। ও স্বধর্মচ্যুত, আপন স্বভাবকে ও হত্যা করেছে। নিজেকে ভেঙে মুচড়ে দুমড়ে নিজের কি লক্ষ্মীছাড়া দশাই ও করেছে—এলা দেখে আর তার বুক ফেটে যায়। কিন্তু এখন আর ফিরবার পথ নেই। হয় পুলিশের হাতে না হয়তো আপন দলের হাতে সদ্গতি অনিবার্য। অন্তু কবি, সেই প্রথম সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে বলেছিল—'তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ'। আজ সেই সর্বনাশের মুহূর্ত উপস্থিত। পাছে অন্তু-এলার প্রেম দলের মধ্যে ভাঙন ধরায়—অতএব এদের অপসারণ প্রয়োজন হয়েছে। এলার অন্তিম প্রার্থনা—অন্তুর হাতেই তার মরণ হোক্, অন্তুর জন্মদিনে তাকে উপহার দিয়েছিল তার প্রথম চুম্বন, আজ দিল শেষ চুম্বন। শেষ চুম্বন অফুরন্ত হোক্ এই তার শেষ প্রার্থনা।

'চোখের বালি' এবং 'ঘরে বাইরে'-কে বাদ দিলে ইংরেজিতে যাকে বলে প্যাশন্ সে-জিনিসটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প-উপন্যাসে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। এবং এই দুই গ্রন্থেও তিনি প্যাশন্কে স্বীকার করেছেন মাত্র কিন্তু তাকে দোরের বাইরেই দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। 'চার অধ্যায়'-এ সেই জিনিসটি এসেছে। সংক্ষিপ্ত কাহিনী, দেহের জিজ্ঞাসা উগ্র হয়ে উঠবার অবকাশ পায়নি কিন্তু প্যাশনের বিদ্যুৎস্ফুরণ ক্ষণে ক্ষণেই আমরা দেখতে পেয়েছি এবং তাতেই 'চার অধ্যায়'-এর কাহিনী প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যে আবেগ সঞ্চিত হতে থাকে শানিত বাক্যের আঘাতে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। 'শেষের কবিতা'র মতো এখানে শানিত বাক্যের উল্কাবৃষ্টি। একটু কম হলেই হয়তো ভালো হত। তাহলেও হৃদয়াবেগের অপমৃত্যু এ গ্রন্থে হয়নি, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

একটিমাত্র প্রবন্ধের পরিমিত সীমানার মধ্যে সমস্ত উপন্যাস সম্পর্কে যথোচিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। যেটুকু না বললে নয় সেটুকুই শুধু বলা হয়েছে। সহৃদয় পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন যে, যা বলা হল, তার চাইতে ঢের বেশি না-বলা থেকে গেল।

# ছন্দ ও চিত্রকলা

[ 'সন্ধ্যাসংগীত' সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'র একস্থানে কবি লিখেছেন,

"এই স্বাধীনতার আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন একটা খালের মধ্যে সিধা চলে না—আমার ছন্দও তেমন আঁকিয়া বাঁকিয়া নানা মূর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল।"

প্রতিভা-উন্মেষের প্রত্যূষকালে বন্ধনমুক্তির এই আনন্দ এই অনুভূতি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে কবির শেষজীবনের সৃষ্টি পর্যন্ত—'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত তা প্রসারিত। অনন্তবিস্তার বিশ্বপ্রাঙ্গণে যথার্থ মুক্তির যে বাণী তাঁর কাব্যে, তাঁর নাটকে, তাঁর সমগ্র সৃজনকর্মে বারবার ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—সেই মুক্তির আনন্দ আর এক বিচিত্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তাঁর ছন্দোধারায় আর চিত্রশিল্পে। রবীন্দ্র-চিত্রকলাতেও বন্ধনমুক্তির আর এক উপলব্ধির প্রকাশ। অরূপ-সাধনায় কবি ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন,

"অরূপ, তোমার বাণী
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক্ সে আনি।"

এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা রূপের সীমানায় যেখানে পথ খুঁজেছে সেখানে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হবার পর থেকে নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায় ভরা আনন্দে ছুটে চলেছে। 'কড়ি ও কোমল' থেকে তার সুস্পষ্ট প্রকাশ, 'বলাকা', 'লিপিকা' বা 'শেষ লেখার' কাল পর্যন্ত সে-গতি অব্যাহত। তারই আর এক প্রকাশ পরিণত জীবনের চিত্রকলায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যছন্দে, নৃত্যনাট্যে আর চিত্রকলায় অন্তর্লীন আকাঙ্ক্ষাটিও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—"অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক্ সে আনি"।

## ॥ ছন্দ ॥

বাংলা কাব্যের ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যে অজস্র বৈচিত্র্য এনেছেন, তার নিকটতম কোনো উপমাস্থল পাওয়া যাবে না এ-কথা এখন পর্যন্ত সত্য। 'কড়ি ও

কোমল'-এর কাল থেকে শেষজীবনের গদ্যছন্দের কবিতা পর্যন্ত ছন্দের গঠনে, শব্দবিন্যাসে, স্তবক-রচনার বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রকাব্যের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের ধারাটিও এক পৃথক আলোচনার সামগ্রী।

ছন্দ হল ধ্বনিতরঙ্গ। মনের অনুভূতিগুলি সেই ধ্বনিতরঙ্গকে অবলম্বন করে বাঙ্ময় রূপ পায়। সংগীতের সেই তরঙ্গ সৃষ্টি হয় সুরে, পাঠ্যকাব্যে হয় ছন্দে। পাঠকচিত্তে অনুভূতির অনুরণন তোলার পক্ষে কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দোবন্ধ তাই অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা কাব্যে বৈচিত্র্যবিহীন যেসব ছন্দ প্রচলিত ছিল, তার সবগুলিই অক্ষরবৃত্ত। অক্ষর-সমকত্বের নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা পয়ার, ত্রিপদী, তোটক ইত্যাদি ছন্দের সেই একঘেয়েমিতে প্রথম আঘাত হানলেন কবি মধুসূদন। সুপরিচিত 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' বাংলা কাব্যের আঙ্গিকে রীতিমতো বিপ্লব এনেছিল। বহুপ্রচলিত চৌদ্দ-অক্ষর-মাত্রিক পয়ার ছন্দের অন্ত্যানুপ্রাস বর্জন করে মধুসূদন ছেদ বা যতিচিহ্নকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যাতে কাব্যের ভাবপ্রবাহ এক বিপুল গতিবেগসম্পন্ন বাহন পেয়েছিল। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর বাংলা-ছন্দের ইতিহাসে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল। তা সত্ত্বেও, মধুসূদনের ছন্দ মাত্রা বা ধ্বনিপ্রধান হয়নি। ছেদ বা যতির বিসম বিন্যাস সত্ত্বেও পয়ার-ছন্দের অক্ষরমাত্রিক রীতিকে তিনি অগ্রাহ্য করেননি। রবীন্দ্রনাথের হাতে পয়ার ছন্দের যথার্থ মুক্তি ঘটেছে। তিনি পয়ার ছন্দের মূল গঠনকে রেখে, চরণের অন্ত্য-ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিমাত্রাকে এমন-ভাবে ব্যবহার করেছেন, যার ফলে পয়ারের রূপই পাল্‌টে গেছে। প্রথমত ধ্বনিপ্রাধান্য, দ্বিতীয়ত হসন্ত-ব্যঞ্জনধ্বনির বিচিত্র প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ অজস্র বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পেরেছে। বাংলাভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির হসন্ত-উচ্চারণের যে প্রাচুর্য, এরকমটি আর্যভাষা-গোষ্ঠীর অন্য কোনো ভাষাতেই নেই। সেই বৈশিষ্ট্যকে ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ কৌশলে ব্যবহার করেছেন। যার ফলে ছড়ার ছন্দের মতো লঘুচালের ছন্দও ভাবগম্ভীর কবিতার সার্থক বাহনরূপে বহুস্থলে ব্যবহৃত হতে পেরেছে। প্রাচীন প্রাকৃত বা বাংলা কাব্যে ছয়মাত্রার ছন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু অক্ষর-সমকত্বের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব থাকার জন্যে প্রাকৃত বা প্রাচীন বাংলা গীতিকবিতার সে-ছন্দের মধ্যে ধ্বনি-মাত্রিকতার যথেষ্ট অবকাশ থাকা সত্ত্বেও তা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের গোষ্ঠীতেই রয়ে গেছে। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের আগে মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত ছন্দ ছিল না। রবীন্দ্রনাথই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মাধ্যমে বাংলা ছন্দে বহুবৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন।

বিভিন্ন মাত্রার সমন্বয়ে অসাধারণ গতিবেগসম্পন্ন স্তবক-সৃষ্টিও তাঁর অন্যতম কীর্তি। 'বলাকা' বা 'পলাতকা'র ছন্দে তার পরিচয় বিধৃত। পরিণত জীবনে রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ বাংলা কাব্যের আঙ্গিকে আর এক শক্তিশালী মাধ্যমকে উপস্থিত করেছে। খাঁটি 'Prose verse' বা গদ্যছন্দের নিদর্শন 'লিপিকা' এবং শেষজীবনে রচিত কয়েকখানি কাব্যে তিনি যে ছন্দের প্রবর্তন করেছেন, তার প্রভাব বর্তমানকালের কাব্যে বোধহয় সবচেয়ে বেশী।

'সন্ধ্যাসংগীত' রচনাকালে কবি যে বন্ধনমুক্তির আনন্দে দিশেহারা হয়েছিলেন সেই আনন্দের হিল্লোল ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাঁর সামগ্রিক কাব্যসাধনায়। আধুনিক বাংলা ছন্দের বিচিত্র গতিভঙ্গী এবং ধ্বনিমাধুর্য তাঁরই দান।

## ॥ চিত্রকলা ॥

রহস্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ছবি হোল আমার শেষবয়সের প্রিয়া, তাই নেশার মতো আমাকে পেয়ে বসেছে।"

প্রতিমা দেবীকে একখানি চিঠিতে লিখেছেন,

> "আমার বয়স সত্তর হয়ে এল। আজ ত্রিশ বছর ধরে যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করেচি, আজ হঠাৎ মনে হচ্চে যেন ভিৎ পাকা হবে। ছবি কোনোদিন আঁকিনি, আঁকব বলে স্বপ্নেও বিশ্বাস করিনি। হঠাৎ বছর দুই তিনের মধ্যে হুহু ক'রে এঁকে ফেললুম, আর এখানকার ওস্তাদরা বাহবা দিল। ... জীবনগ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে এল তখন অভূতপূর্ব উপায়ে আমার জীবনদেবতা এর পরিশিষ্ট রচনার উপকরণ জুগিয়ে দিলেন। ..."

চিত্রকলার প্রতি প্রবণতা এবং তারই জন্যে সলজ্জ সংকোচ কবির প্রথম-যৌবন থেকেই ছিল। সে সংকোচ তিনি শেষবয়স পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কাব্য, সঙ্গীত বা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো চিত্রকলা তাঁর সৃষ্টিকর্মের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়নি, এ-কথা সত্য। কিন্তু প্রথম-যৌবন থেকেই এই বিশেষ বিদ্যাটির প্রতি তাঁর সাগ্রহ আকর্ষণ যে ছিল, তার নিদর্শন 'জীবনস্মৃতি' বা 'ছিন্নপত্র'র পাতায় বিধৃত হ'য়ে আছে।

> "... আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ যে চিত্রবিদ্যা ব'লে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। ..."

১৮৯৩ সালে লিখিত ( কবির বয়স তখন ৩২ বছর ) এই চিঠিতে 'সাধনা করবার বয়স চলে গেছে' ব'লে কবির আক্ষেপ মিথ্যা ব'লেই প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তী কালে। রবীন্দ্র-চিত্রকলার যথার্থ প্রকাশ তাঁর পরিণত বয়সেই ঘটেছে। তাঁর চিত্রকলার অন্তর্গূঢ় ভাবটি এক স্বতন্ত্র রসে সমৃদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "... রবিকার ছবিতে যা আছে তা বহু আগে থেকে হয়ে আসছে। যেসব রং নিয়ে উনি কারবার করেছেন নেচারে সেসব আছে। মাঠের ডিজাইন, নদীর জলের ডিজাইন,—দেখো, সব ছড়ানো আছে। রবিকার ছবিও এসব থেকেই হয়েছে। তাকে নতুন বলব কোন্ হিসেবে ? সবই ছিল, সবই আছে নেচারে। রবিকার ছবিতে নতুন কিছু নেই, অথচ তারা নতুন—আমার শুধু এই আশ্চর্য ঠেকে। কেমন করে এই মানুষের হাত দিয়ে এই বয়সে এই জিনিস বের হোলো। অতীতের কতখানি সঞ্চয় ছিল তাঁর ভিতরে। অতি গভীর অন্তরের উষ্মা ও তাপে এই রং রূপ সমস্তই যেন প্রকৃতির খেলাঘরের লুকোনো সামগ্রী হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দ দিয়ে নির্মিত ; ফেটে বেরিয়েছে, রূপ পেয়েছে। এই যে একটা volcanic ব্যাপার—এ থেকে শিখতে পারবে না, হবে না তা। ভল্‌কানিক ইরাপশনের মতো এই একটা জিনিস হয়ে গেছে। এ থেকে আর্টের পণ্ডিতেরা কোনো আইন বের করে যে কাজে লাগাতে পারবে আমার তা মনে হয় না। ভেবে দেখো, এত রং, এত রেখা, এত ভাব সঞ্চিত ছিল অন্তরের গুহায় যা সাহিত্যে কুলোলো না, গানে হোলো না—শেষে ছবিতেও ফুটে বের হতে হোলো—তবে ঠাণ্ডা। ..."

অবনীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত। রবীন্দ্র-চিত্রকলাকে প্রচলিত কোনো রীতি বা আঙ্গিকের আইনে বিচার করা সম্ভব নয়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত কোনো নিয়ম মানে না, কোনো বাঁধা-পথের নির্দেশ মানে না। তা বিপুল উচ্ছ্বাসে উৎসারিত হয় ভেতরকার এক বিপুল বেগের তাড়নায়। রবীন্দ্র-প্রতিভার উৎসরণ কাব্যে, সঙ্গীতে, নাটকে কিম্বা প্রবন্ধ-সাহিত্যেও সম্পূর্ণ হ'তে পারেনি। পরিণত জীবনে চিত্রকলার মাধ্যমটিও তাঁর প্রতিভা-স্ফূর্তির পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার আলোচনা-প্রসঙ্গে এ-কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এ শাখাটি রবীন্দ্র-প্রতিভার

প্রধান বিকাশ-মাধ্যমগুলির পরিশিষ্ট হিসাবে রূপগ্রহণ করেছে। অবনীন্দ্রনাথের কথায়,

> "… এত ভাব সঞ্চিত ছিল অন্তরের গুহায় যা সাহিত্যে কুলোলো না, গানে হোলো না—শেষে ছবিতেও ফুটে বের হতে হোলো—তবে ঠাণ্ডা। …"

কিন্তু তা সত্বেও রবীন্দ্র-চিত্রকলার স্বতন্ত্র একটি মূল্য আছে। সে মূল্য এই সৃষ্টিসম্ভারের অন্তর্লীন ভাব ও বস্তুসত্যের নিজস্বতায়। ১৯৩০ সালে প্যারিসে তাঁর আঁকা ছবির এক প্রদর্শনী হয়। সেই প্রদর্শনী দেখার পর বিশিষ্ট শিল্পী পল্ ভেলেরি এবং আঁদ্রে জিদ্ বলেছিলেন, "ডঃ টেগোর, আমরা এখন সবেমাত্র যা ভাবতে শুরু করেছি, আমাদের দেশের এইসব বিচিত্র আর্ট-আন্দোলনের তলায় তলায় যে নতুনকে পাবার চেষ্টা লুকোনো রয়েছে, আপনি কী করে এত সহজে সেই জিনিসকে চোখের সামনে এনে ধরলেন? আপনার এই অত্যাশ্চর্য কীর্তি যে কতো বড়ো, তা হয়তো এখন সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে না—সংস্কৃতির উৎকর্ষের সঙ্গে মানুষের চিন্তাশক্তি যতই বিকশিত হবে, এই চিত্রগুলির কথা ততই তারা বুঝতে পারবে।"

শিল্পী যামিনী রায়কে লিখিত একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "… যখন ছবি আঁকতুম না, তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগত কানে, ভাবের রস আসত মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় আমার মনকে টানল, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেলো। গাছপালা, জীবজন্তু, সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ হয়ে উঠছে। এ ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই দৃষ্টির জগতে একান্ত দ্রষ্টারূপে আপন চিত্রকরের সত্তা আবিষ্কার করল। এই যে নিছক দেখবার জগৎ ও দেখাবার আনন্দ, এর মর্মকথা বুঝবেন তিনি যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী। … চিত্রকর গান করে না, ধর্মকথা বলে না, চিত্রকরের চিত্র বলে—'অয়ম্ অহম্ ভো'—এই যে আমি এই।" ]

# ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

## প্রবোধচন্দ্র সেন

সর্বপ্রথমেই স্মরণ করছি স্বয়ং কবিরই একটি উক্তি।—

> মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।
>
> —মানসী ( রচনাবলী সং., ১৩৪৬ পৌষ ), সূচনা

'মানসী' কাব্য রচনার সময়ে ( ১৮৮৭-৯০ ) কবির সঙ্গে এই যে একজন ছন্দশিল্পী এসে যোগ দিলেন, তাঁর শিল্পকর্মের একটু বিশদ পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই শিল্পকর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মানসী কাব্যের রচনাবলী সংস্করণের উক্ত 'সূচনা'তেই তিনি বলেছেন—

> আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি।

বাংলা ছন্দের এই যে 'নূতন শক্তি', তার পূর্ণতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন মানসী কাব্যের প্রথম সংস্করণের ( ১৮৯০ ) ভূমিকায়।—

> এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর-স্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে। সেরূপ স্থলে সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া না পড়িলে ছন্দ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। যথা—
>
> নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল্ ;
> ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।

'নিম্নে' 'স্বচ্ছ' এবং 'উর্ধ্বে' এই কয়েকটি শব্দে তিন মাত্রা গণনা না করিলে পয়ার ছন্দ থাকে না। আমার বিশ্বাস, যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর-স্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ; কেবল বাঙ্গালা ছন্দ পাঠ করিয়া বিকৃত অভ্যাস হওয়াতেই সহসা তাহা দুঃসাধ্য মনে হইতে পারে। শব্দের আরম্ভ-অক্ষর যুক্ত হইলেও তাহাকে যুক্তাক্ষর-স্বরূপ গণনা করা যায় নাই—পাঠকেরা এইরূপ আরো দুই-একটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন।

—মানসী ( প্রথম সংস্করণ, ১৮৯০ ), ভূমিকা

এই ভূমিকাতে যে-সব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। দুই জায়গায় বলা হয়েছে যুক্তাক্ষরকে দুই 'অক্ষর' বলে গণ্য করার কথা। কিন্তু দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে 'নিম্নে' প্রভৃতি শব্দে তিন 'মাত্রা' গণনার কথা। বস্তুতঃ এখানে 'মাত্রা' অর্থেই 'অক্ষর' ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক অযুক্তাক্ষরে এক মাত্রা ও যুক্তাক্ষরে দুই মাত্রা গণনীয়, এ কথা বলাই লেখকের অভিপ্রায়। যুক্তাক্ষরে দুই মাত্রা গণনীয়, কেননা এসব স্থলে 'সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে' যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘ করে পড়া আবশ্যক। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে কিন্তু যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘ বলে গণ্য করার কথা নেই, আছে যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী বর্ণকে দীর্ঘ বলে গণ্য করার কথা।

স্বানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা॥

—ছন্দোমঞ্জরী ১।১১

সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারং বিসর্গসংমিশ্রম্।
বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু পাদান্তস্থং বিকল্পেন॥

—শ্রুতবোধ ২

দুটি সূত্রেরই মানে এক।—দীর্ঘস্বরান্ত, অনুস্বারান্ত, বিসর্গান্ত এবং সংযুক্তবর্ণের পূর্ববর্তী বর্ণ গুরু হয় ; আর, পদের অন্তস্থিত বর্ণ গুরু হয় বিকল্পে।

প্রসঙ্গক্রমে লক্ষণীয় এই যে, সংস্কৃতশাস্ত্রে 'বর্ণ' ও 'অক্ষর' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। দুই শব্দেরই মানে letter ও syllable। সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজির মতো ওই দুই বস্তুর জন্যে দুটি পৃথক্ শব্দ নির্দিষ্ট নেই। বাংলাতেও লেটার ও সিলেব্‌ল্ বোঝাবার জন্যে পৃথক্ শব্দ নেই। এই দ্ব্যর্থকতার ফলে অনেক বিভ্রান্তি ঘটে। 'সীতা' শব্দে কয় অক্ষর ? দুই না চার ? ইংরেজি পরিভাষায়

বলা যায়, ওই শব্দে আছে দুটি সিলেব্‌ল্‌ ( সী+তা ), কিন্তু চারটি লেটার ( স্‌+ঈ+ত্‌+আ )। প্রচলিত হিসাবে রাম, লক্ষ্মণ, দশরথ, এই তিন শব্দে যথাক্রমে দুই, তিন ও চার অক্ষর গণনা করা হয়। কিন্তু ওই শব্দ-তিনটিতে সিলেব্‌ল্‌ আছে যথাক্রমে একটি, দুটি ও তিনটি। এই পার্থক্য বাংলায় বোঝাব কি করে? ওই তিন শব্দের লেটারের হিসাবের কথা তুললামই না। কারণ ছন্দের আলোচনায় লেটার-গণনার কোনো প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সিলেব্‌ল্‌-গণনা অত্যাবশ্যক।

সুতরাং বাংলা ছন্দের বিচারে সিলেব্‌ল্‌ বোঝাবার জন্যে পৃথক্‌ পারিভাষিক শব্দ স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন। তাই আমি ছন্দের আলোচনায়

letter = অক্ষর বা বর্ণ : ছ্‌+অ+ন্‌+দ্‌+অ

syllable = দল : ছন্‌+দ, শিল্‌+পী

—এই পরিভাষা স্বীকার করে নিয়েছি।

সিলেব্‌ল্‌ বা দলেরও আবার দুই রূপ—(১) আশ্রিতবর্ণান্ত ( যাকে ইংরেজিতে বলা হয় closed), (২) অনাশ্রিতান্ত ( যাকে ইংরেজিতে বলা হয় open)। ছন্দের আলোচনায় শব্দের দলবিভাজন যেমন আবশ্যক, দলের এই শ্রেণীবিভাগও তেমনি আবশ্যক। তাই এই দ্বিবিধ দলের জন্যও দুটি পারিভাষিক শব্দ স্বীকার করে নিতে হয়েছে।—

open syllable = মুক্তদল : অ, আ, কু, বি, স্পৃ

closed syllable = রুদ্ধদল : ঐ ( অই্‌ ), ঔ ( অউ্‌ ), হিং, দুঃ, ছন্‌, শিল্‌

এই দুটি পারিভাষিক শব্দের স্বীকৃতার্থ মনে রাখলে বর্তমান আলোচনা অনুসরণ করা সহজ হবে।

সংস্কৃত ছন্দের পূর্বোক্ত নিয়মের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এই নিয়মে যুক্তাক্ষরকে গুরু বলা হয় নি, গুরু বলা হয়েছে যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী অক্ষরকে। যেমন—'ছন্দ' শব্দের 'ন্দ' গুরু নয়, গুরু হচ্ছে 'ছ' অক্ষরটি। তেমনি 'নিম্নে' শব্দের 'নি' গুরু, 'ম্নে' নয়। এই নিয়ম অনুসারেই শব্দের আদ্যক্ষর যুক্ত হলেও গুরু হয় না। যেমন—'স্পৃহা'র 'স্পৃ' গুরু নয়, লঘু। 'নিস্পৃহ' শব্দের 'নি' গুরু, 'স্পৃ' লঘু। 'স্বচ্ছ' শব্দের 'স্ব' গুরু, যুক্তবর্ণের পূর্বস্থিত বলে; 'নিঃস্ব' বা 'স্বগত' শব্দের 'স্ব' গুরু নয়, যুক্তবর্ণের পূর্ববর্তী নয় বলে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানসীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দের যে নিয়মটির

কথা উল্লেখ করেছেন তা যথাযথ হয় নি। তাই তাঁকে পৃথক্ করে বলতে হয়েছে, শব্দের 'আরম্ভ-অক্ষর' যুক্ত হলেও যুক্তাক্ষর বলে গণ্য নয়। সংস্কৃত নিয়ম মেনে নিলে এই বিধান নিষ্প্রয়োজন।

বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রকথিত নিয়মের চেয়ে ভালো হলেও সংস্কৃত নিয়মটিও ত্রুটিহীন নয়। সংস্কৃত কাব্যে মহৎ, বণিক্ প্রভৃতি হসন্ত শব্দের শেষাংশ (হৎ, ণিক্) কার্যতঃ সর্বদাই গুরু বলে স্বীকৃত হয়, যদিও এগুলি পূর্বোক্ত বিধানের আওতায় আসে না। বস্তুতঃ সংস্কৃতে

হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তদল = লঘু : র.ঘু

দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদল = গুরু : সী.তা

স্বরান্ত বা হসন্ত রুদ্ধদল = গুরু : যৌ, হিং, দুঃ, ছন্—এই তিনটিমাত্র নিয়মই কার্যতঃ স্বীকৃত হয়ে থাকে। বাংলায় প্রথম ও তৃতীয় নিয়মটি স্বীকৃত হয়। দ্বিতীয় নিয়মটি বাংলায় চলে না, কেননা বাংলা উচ্চারণে আ ঈ ঊ এ ও এই পাঁচটি স্বরবর্ণের দীর্ঘতা রক্ষিত হয় না। 'যদি' ও 'নদী' শব্দের দি ও দী বাংলা উচ্চারণে সমমূল্য। বাংলায় 'মধু' ও 'বধূ' শব্দের মাত্রামূল্য সমান।

রবীন্দ্রনাথ মানসী কাব্যে যে নূতন ছন্দের প্রবর্তন করেন তা উক্ত প্রথম ও তৃতীয় নিয়মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এ প্রসঙ্গে শুধু এটুকু মনে রাখা চাই যে,

লঘু = হ্রস্ব = এক মাত্রা
গুরু = দীর্ঘ = দুই মাত্রা।

একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।

—শ্রুতবোধ ৩

এই তিন নিয়মের পার্থক্যটা স্পষ্ট করে বোঝা দরকার। 'ছন্দ' শব্দটা নিয়েই বিচার করা যাক।—

(১) রবীন্দ্রোক্ত নিয়ম অনুসারে ছ = একমাত্রা, ন্দ = দুই মাত্রা ;

(২) সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে ছ = দুই মাত্রা, ন্দ = এক মাত্রা ;

(৩) আমাদের স্বীকৃত নিয়ম অনুসারে ছন্ = দুই মাত্রা, দ = এক মাত্রা।

তিন নিয়মেই 'ছন্দ' শব্দে তিন মাত্রা। পার্থক্য শুধু বিশ্লেষণের। তথাপি তৃতীয় নিয়মটিই স্বীকার্য। কারণ ছ.ন্দ এই বিভাগ লিপিগত, শ্রুতিগত নয়, সুতরাং কৃত্রিম। পক্ষান্তরে ছন্.দ এই দলগত-বিভাগ শ্রুতিসম্মতও বটে,

সুতরাং স্বাভাবিক। তা ছাড়া, তৃতীয় নিয়মটি মানলে অনুস্বারান্ত ( হিং, টিং ), বিসর্গান্ত ( দুঃ, নিঃ ), রুদ্ধস্বরান্ত ( যৌ, ভৈ ) বা হসন্ত রুদ্ধদলের ( ছন্, নিম্ ) জন্য পৃথক্ নিয়ম করতে হয় না ; এক নিয়মেই সবগুলি বৈচিত্র্য ধরা পড়ে।

এই নিয়মেই নিম্নে ( নিম্ . নে ), স্বচ্ছ ( স্বচ্ . ছ ) এবং উর্ধ্বে ( উর্ . ধ্বে ) শব্দে তিন মাত্রা গণনীয়। এই হচ্ছে 'মানসী'র নূতন ছন্দের বৈশিষ্ট্য। এর ফলে বাংলা ছন্দে এক নূতন শক্তি ও সৌন্দর্য দেখা দিল। বস্তুতঃ মানসী রচনার সময় থেকেই বাংলায় যে নূতন ছন্দোধারা প্রবর্তিত হল, তা বাংলা গীতিকবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন বলেই স্বীকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু একটি নূতন ধারা বা রীতি প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত হলেন না, এই ধারাতে নানা রকম বৈচিত্র্য-সৃষ্টিতেও ব্রতী হলেন। এই নূতন রীতির বিবিধ বৈচিত্র্যকেই তিনি বলেছেন 'ছন্দের নানা খেয়াল'। এই নূতন রীতি ও তার বিচিত্র রূপভেদের ফলে বাংলা ছন্দ অভূতপূর্বরূপে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। তাই ছন্দের ইতিহাসে মানসী কাব্যটি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। অমিত্রাক্ষর পদ্ধতি প্রবর্তন করে মধুসূদন বাংলা ছন্দকে যে শক্তি ও সমৃদ্ধি দান করেন, তার তুলনায় মানসীতে প্রবর্তিত নূতন ছন্দোরীতির শক্তি ও সৌন্দর্য কম নয়।

এই নূতন ছন্দোরীতির বিচিত্র রূপ ও শক্তির পরিচয় দেওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

॥ ২ ॥

এই নূতন ছন্দোরীতির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আর-একটি উক্তিও স্মরণীয়।—

> বাংলা ছন্দের তিনটি শাখা। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন করে, সেই ভাষায় বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিরূপকে স্বীকার করেনি। আর-একটি সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে, এই ভাষা বাংলার হসন্ত শব্দের ধ্বনিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে। আর-একটি শাখার উদ্গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।
>
> —বাংলা ছন্দের প্রকৃতি ( ১৯৩৪ ), 'ছন্দ' ( রচনাবলী ২১ ), পৃ ৫৯

এই উক্তিটিও ত্রুটিহীন নয়। কেননা, ভাষারীতির ভেদ-অনুসারে ছন্দোরীতির ভেদ ঘটে না। তা ছাড়া, ছন্দের তৃতীয় শাখাটি কোন্ ভাষারীতি-আশ্রিত সে কথাও বলা হয় নি। বস্তুতঃ বাংলা ছন্দের কোনো শাখাতেই অমিশ্র সাধু ( যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'কৃত্রিম' ) রীতি চলে না ; প্রথম ও তৃতীয় শাখাই সাধু বাংলার প্রধান আশ্রয়, কিন্তু সেখানেও মিশ্ররীতিই চলে, বিশুদ্ধ

সাধুরীতি অচল। পক্ষান্তরে অমিশ্র চলতি বাংলা ( যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সচল বাংলা' ) ছন্দের তিন শাখাতেই চলে, যদিও তার প্রধান আশ্রয় ছন্দের দ্বিতীয় শাখাটি। এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনা আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক শুধু দুটি কথা—(১) বাংলা ছন্দের তিনটি শাখা এবং (২) তৃতীয় শাখাটির উদ্‌গম সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।

এবার তিন শাখার তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন।—

(১) প্রভাতে ও সন্ধ্যায় বিশ্বের তারে তারে
চম্পক-অঙ্গুলি সংগীত ঝংকারে।

(২) প্রভাতে সন্ধ্যায় শুনি বিশ্ববীণা-তারে
চম্পক-অঙ্গুলি-ঘাতে সংগীত ঝংকারে।

(৩) প্রভাতকালে সাঁঝের বেলায়
জগৎবীণার তারে তারে
চাঁপার-কুঁড়ি আঙুল-ছোঁয়ায়
গান বয়ে যায় হাজার ধারে।

প্রথম দৃষ্টান্তটি রবীন্দ্রকথিত তৃতীয় শাখার অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথের মতে এটিরই উদ্‌গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি রবীন্দ্রকথিত 'কৃত্রিম' অর্থাৎ সাধুভাষার ছন্দ। আর তৃতীয়টি 'সচল' বাংলার ছন্দ।

প্রথম দৃষ্টান্তটির ছন্দোরীতিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এইটি বাংলায় প্রবর্তিত হয় মানসী রচনার যুগে ( ১৮৮৭-৯০ )। মানসী রচনার প্রাক্‌কালে বাংলা সাহিত্যে এই রীতির প্রচলন ছিল না। সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিই উদ্‌ধার করছি।—

> এক সময়ে বাংলায় সব unitকেই সমান মূল্য দেওয়া হত; যুগ্ম-অযুগ্ম ধ্বনির [ অর্থাৎ রুদ্ধ ও মুক্ত দলের ] পার্থক্য স্বীকার করা হত না। কিন্তু তিন unitএর ছন্দে, যাকে আমি বলি 'অসম' ছন্দ, তাতে যুগ্মধ্বনিকে [ অর্থাৎ রুদ্ধদলকে ] এক unit ধরলে ভারি খারাপ শোনায়। এইটে অনুভব করেই তখনকার দিনে কবিরা এজাতীয় ছন্দে যুক্ত অক্ষর যথাসম্ভব বর্জন করে চলতেন। যুক্ত অক্ষর সম্পূর্ণ বর্জন করে একটি কবিতা রচনা করতে পারলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন; মনে করতেন কবিতাটি খুব প্রাঞ্জল, সরল ও শ্রুতিমধুর হল। কবি বিহারীলালের কাছে আমার প্রথম শিক্ষা। তাঁর রচনাতেও যুক্তাক্ষর

বড়ো কম। আমারও বাল্যকালের রচনায় যুক্তাক্ষর খুব কম ; তবু মাঝে মাঝে যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়ে ছন্দকে বন্ধুর করে তুলেছে। 'রাহুর প্রেম' কবিতাটিতেই তার নিদর্শন পাবে। তখনও আমি যুগ্মধ্বনিকে দু-মাত্রা বলে ধরতে আরম্ভ করিনি ; কারণ খারাপ শোনালেও তখনকার দিনে জবাবদিহি ছিল না। কিন্তু 'মানসী'র সময় থেকে আমি যুগ্মধ্বনিকে দু-মাত্রা বলে ধরতে শুরু করেছি।

—ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ ( ১৯৪৫ ), পৃ ১৮২-৮৩

দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে পরিস্ফুট করা প্রয়োজন। উপরে বলা হয়েছে বিহারীলালের রচনায় যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ খুবই বিরল এবং তাঁর ছন্দের অনুসরণের ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচনাতেও যুক্তবর্ণের বিরলতা ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতির একটি অংশ উদ্ধৃত করলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে।—

বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রামূলক। যেমন—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুর-নদীর জলে
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

... একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম। ইহা যেন দুই পায়ে চলা নহে, ইহা যেন বাইসিকেলে ধাবমান হওয়ার মতো। এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসংগীতে ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম।

—সন্ধ্যাসংগীত, জীবনস্মৃতি ( ১৯১২ )

উপরের দৃষ্টান্তটির পর্ববিভাগ এরকম—

২ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১
এক্ দিন্ দেব্ | তরুণ্ তপন্ | হেরিলেন্ সুর | নদীর্ জলে।

প্রত্যেকটি মুক্তদলকে ( ত, হে, রি প্রভৃতি ) এক মাত্রা এবং প্রত্যেকটি রুদ্ধদলকে ( এক্, দিন্, দেব্ প্রভৃতি ) দুই মাত্রা ধরে হিসাব করলে দেখা যাবে, এখানে প্রত্যেকটি পূর্ণ পর্বে আছে ছয় মাত্রা এবং শেষের অপূর্ণ পর্বে আছে পাঁচ মাত্রা। এরকম ছয়মাত্রাপর্বের ছন্দকেই রবীন্দ্রনাথ বলেন 'তিনমাত্রামূলক' ছন্দ বা

'অসম' ছন্দ। এই জাতীয় ছন্দেই রুদ্ধদলকে এক মাত্রা রূপে গণ্য করলে 'ভারি খারাপ শোনায়'। এইজন্যই তৎকালীন কবিরা, বিশেষতঃ বিহারীলাল, এই জাতীয় ছন্দে যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব বর্জন করে চলতেন।

জীবনস্মৃতির ( ১৯১২ ) বহুকাল পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ছয়মাত্রাপর্বের ছন্দে যুক্তাক্ষর ব্যবহারের কথা আলোচনা করেছিলেন 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে।—

> প্রথম উপহারটি ব্যতীত বঙ্গসুন্দরীর অন্য সকল কবিতার ছন্দই পর্যায়ক্রমে বারো এবং এগারো অক্ষরে ভাগ করা। যথা—
>
> সুঠাম শরীর পেলব লতিকা,
> আনত সুষমা-কুসুম-ভরে ;
> চাঁচর চিকুর নীরদমালিকা
> লুটায়ে পড়েছে ধরণী-'পরে।
>
> এ ছন্দ নারীবর্ণনার উপযুক্ত বটে, ইহাতে তালে তালে নূপুর ঝংকৃত হইয়া উঠে। কিন্তু এ ছন্দের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে যুক্ত অক্ষরের স্থান নাই। ··· ইহার সহিত নিম্ন-উদ্‌ধৃত শ্লোকটি একসঙ্গে পাঠ করিলে প্রভেদ প্রতীয়মান হইবে।—
>
> অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়াইয়ে তীরে
> ধরিয়ে ললিত করুণাতান ;
> বাজায়ে বাজায়ে বীণা ধীরে ধীরে
> গাহিছে আদরে স্নেহের গান।
>
> 'অপ্সরী কিন্নরী' যুক্ত অক্ষর লইয়া এখানে ছন্দভঙ্গ করিয়াছে। কবিও এই কারণে বঙ্গসুন্দরীতে যথাসাধ্য যুক্ত অক্ষর বর্জন করিয়া চলিয়াছেন।
>
> কিন্তু বাংলা যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ, ছন্দের ঝংকার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নেই, তার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে এবং হৃদয়কে আঘাতপূর্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সংগীত তরঙ্গিত হইতে থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য।
>
> —বিহারীলাল ( ১৮৯৪ ), আধুনিক সাহিত্য

বঙ্গসুন্দরীর ( ১৮৭০ ) ছন্দ অধিকাংশ স্থলেই 'অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড' নিয়ে গঠিত ; যে-সব স্থলে যুক্তাক্ষরের অস্থিসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে অপ্সরী-কিন্নরীরাও ছন্দ-সংগীতের তাল রক্ষা করতে পারে নি।

বঙ্গসুন্দরীর 'অস্থিবিহীন সুললিত' ছন্দ যে বালক-বয়সে রবীন্দ্রনাথের অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তার একটু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি তাঁর 'শৈশব সংগীত' কাব্য ( ১৮৮৪ ) থেকে। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি কবির তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সের ( ১৮৭৪-৭৯ ) রচনা। এই কাব্যের প্রথম কবিতাটির কয়েকটি লাইন এই—

এস কলপনে, এ মধুর রেতে
  দু-জনে বীণায় পুরিব তান।
সকল ভুলিয়া হৃদয় খুলিয়া
  আকাশে তুলিয়া করিব গান। ...
ঘুমায়ে পড়িল আকাশ পাতাল,
  ঘুমায়ে পড়িল স্বরগ-বালা,
দিগন্তের কোলে ঘুমায়ে পড়িল
  জোছনা-মাখানো জলদ-মালা।

—ফুলবালা, শৈশব সংগীত ( ১৮৮৪ )

এই কয়েক লাইনেই বঙ্গসুন্দরীর ছন্দ অনুসরণের এবং যুক্তাক্ষর-বর্জনের প্রয়াস সুস্পষ্ট। কলপনে, স্বরগ ও জোছনা, এই তিনটি শব্দে যুক্তাক্ষর ভেঙে বিযুক্ত করার প্রয়াসটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু 'দিগন্তের' শব্দে যুক্তাক্ষর বর্জন সম্ভব হয় নি, ফলে ছন্দও এখানে যুক্তাক্ষরের উপলখণ্ডে আহত হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। অথচ এসব স্থলে যথাক্রমে কল্পনে, স্বর্গ, জ্যোৎস্না ও দিগন্ত-কোলে বসালেই ছন্দ অতি সহজেই ঝংকৃত ও তরঙ্গিত হয়ে উঠত। কিন্তু সে-যুগে এ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো কবির আয়ত্ত হয়নি। এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় মানসী রচনার যুগে। সে কথা পরে বলছি।

বনফুল কাব্য 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রে প্রকাশিত হয় ১২৮২-৮৩ সালে ( ইং ১৮৭৫-৭৬ )। এই কাব্যেও পূর্বোক্ত বঙ্গসুন্দরীর ছন্দ অনেক স্থলেই অনুসৃত হয়েছে এবং যুক্তাক্ষর-বর্জনের প্রয়াস সত্ত্বেও স্থানে স্থানে যুক্তাক্ষর এসে ছন্দের মসৃণ গতিতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে—

একমাত্রা বলে স্বীকৃত। দুটি কবিতার ছন্দোগঠনগত আকৃতিও একই রকম। বিশেষভাবে লক্ষণীয় বন্ধনীমধ্যস্থ 'ও'। তখনকার দিনে কবিরা লিপিগত 'অক্ষর'-সংখ্যার সমতা রক্ষা অত্যাবশ্যক মনে করতেন। উচ্চারণগত ধ্বনির সমতার তত্ত্ব তখনও অধিগত হয়নি। তারই ফলে রুদ্ধদলের দুইমাত্রা মূল্যও স্বীকৃত হয়নি এবং তারই ফলে 'এখনও' 'তখনই' প্রভৃতি শব্দের ও-কার বা ই-কার স্বতন্ত্র মাত্রায় অধিকারী বলে গণ্য হত। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে 'এখনও' এবং 'সেদিনও' শব্দদুটির উচ্চারণরূপ 'এখনো' এবং 'সেদিনো'। এরূপ বানান স্বীকার্য ছিল না বলে ও-কে বন্ধনীবদ্ধ করা হয়েছে, নতুবা ওই দুই শব্দে চার মাত্রা ধরতে হয়। অথচ চার মাত্রা ধরলে ছন্দ ঠিক থাকে না। তাই ও-কে বন্ধনীতে রাখা হয়েছে।

হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতাটির ছন্দ সম্বন্ধেও দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। কবিতাটির রচনাকাল ১৮৭৭। কিন্তু এটি তৎকালে প্রকাশিত হয় নি। পরবর্তী কালে এটি ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে ( ১৮৮২ ) স্থান পায়। তার একটি অংশ এই—

অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে,<br>
সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,<br>
নিবিড় আঁধারে এঘোর দুর্দিনে<br>
ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে।

এখানে 'তোমারই' এবং 'তোমারি' শব্দের উচ্চারণগত ও মাত্রাগত পার্থক্য লক্ষণীয়। 'তোমারই' শব্দে র-এর উচ্চারণ অকারান্ত, ফলে ওই শব্দটির মাত্রামূল্য চার। পক্ষান্তরে 'তোমারি' শব্দের মাত্রামূল্য তিন।

আর একটি দৃষ্টান্ত এই—

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,<br>
বিংশতি কোটি মানবের বাস,<br>
এ ভারত-ভূমি যবনের দাস?<br>
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা?<br>
—ভারতসংগীত ( ১৮৭০ ), কবিতাবলী ১ম খণ্ড

শুনিতেছি নাকি শতকোটি দাস,<br>
মুছি অশ্রুজল নিবারিয়া শ্বাস,

সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায়
হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে। ...
যতদিন বিষ করিয়াছে পান
কিছুতে জাগেনি এ মহা-শ্মশান,
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি। ...
তখনো একত্রে ভারত জাগেনি,
তখনো একত্রে ভারত মেলেনি,
আজ জাগিয়াছে আজ মিলিয়াছে
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে পূজা।
—হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতা ( ১৮৭৭ )

ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে ও ছন্দে দুটি রচনার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। 'শৃঙ্খল' শব্দের প্রয়োগটিও লক্ষ করবার মতো, 'তখনো' শব্দের বানানটিও। বোধকরি এসময়ে হেমচন্দ্রের মতো 'তখন (ও)' বানান রবীন্দ্রনাথের আর মনঃপূত ছিল না। সবশেষে বলা প্রয়োজন যে, 'ভারতসংগীত' নয়, হেমচন্দ্রের 'ভারতবিলাপ' ও 'ভারতভিক্ষা' কবিতা-দুটির ছাপও দেখা যায় এসময়কার রবীন্দ্ররচনায়। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 'ভারতবিলাপ'-এর শেষ লাইনগুলি এই।—

ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝংকার
বাজিত গরজে, উথলি আবার
উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ।

এরই সঙ্গে তুলনীয় হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতার শেষ লাইনগুলি।—

মোগল-বিজয় করিয়া ঘোষণা
যে গায় গাক, আমরা গাব না,
আমরা গাব না হরষ-গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি
আমরা ধরিব আরেক তান।

'যে গায় গাক' পর্বে এক মাত্রা কম আছে, এটুকু লক্ষ করা প্রয়োজন। দেখা গেল

ছয়মাত্রাপর্বের ছন্দ রচনায় বালক রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল ও হেমচন্দ্র উভয়েরই অনুবর্তী ছিলেন।

বঙ্গসুন্দরীর ছন্দ ও ভারতসংগীতের ছন্দ মূলতঃ একই। পার্থক্য শুধু এই যে, বঙ্গসুন্দরীর ছন্দ দ্বিপদী আর ভারতসংগীতের ছন্দ চৌপদী; ভারতসংগীতের প্রথম দুটি লাইন বাদ দিলেই দুই কবিতার ছন্দ অবিকল এক রূপ ধারণ করবে। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির প্রতি একটু মন দিলে তা সহজেই বোঝা যাবে। কিন্তু বাইরের গঠনে দুই কবিতার এতখানি সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও শ্রুতিরুচিতে দুই কবিতার ছন্দের পার্থক্য অনেকখানি। ছন্দোমাধুর্যের অন্তরায় ঘটায় বলে বিহারীলাল যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জন করে চলেছেন; আর ছন্দে শক্তি সঞ্চারের সহায়ক বলে হেমচন্দ্র যুক্তাক্ষরের বাহুল্য ঘটাতে দ্বিধা বোধ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে এই দু-রকম ছন্দরুচিতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই দুই রুচির বিরোধ ঘুচিয়ে কিভাবে উভয়ের সমন্বয় ঘটানো যায়, তা তখনও আবিষ্কার করতে পারেন নি। আবিষ্কার করেছিলেন মানসী রচনার সময়ে। ততদিন তিনি এই দুই রুচির মধ্যে দোলায়মান ছিলেন। বিহারীলালের 'অস্থিবিহীন সুললিত' ছন্দোমাধুর্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু এই অতিলালিত্য অচিরেই তাঁর কাছে 'শ্রান্তিজনক'ও মনে হয়েছে। হেমচন্দ্রের রচনার দৃঢ়-পিনদ্ধতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে, অথচ তার যুক্তাক্ষরজাত বন্ধুরতাও তাঁকে পীড়া দিয়েছে। কিভাবে এই দুই বিপরীত টানের অবসান ঘটল, এবার তারই একটু পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হব।

॥ ৪ ॥

আমাদের আলোচ্য বিষয় বাংলা ছন্দের রবীন্দ্রকথিত তৃতীয় শাখাটি। এই শাখার বিশিষ্টতা এই যে, এতে সংস্কৃতের মতো রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক বলে স্বীকৃত হয়, অথচ সংস্কৃতের মতো দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদলের দ্বিমাত্রকতা স্বীকৃত হয় না। ছয়মাত্রাপর্বের ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ এই শাখার অন্তর্গত বলে মনে করেন, তাই এ ছন্দে রুদ্ধদলের একমাত্রকতা ধ্বনিসংগীতের মাধুর্য হরণ করে শ্রুতিপীড়া জন্মায়। এইজন্যই বিহারীলাল ছয়মাত্রাপর্বের ছন্দে শব্দমধ্যবর্তী রুদ্ধদল যথাসম্ভব বর্জন করেই চলতেন। রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের ষণ্মাত্রপর্বিক রচনায় যুক্তাক্ষরের বিরলতার হেতুও তাই। মানসীর যুগেই তিনি সর্বপ্রথম যুক্তাক্ষর বর্জন না করেও, বরং যুক্তাক্ষরের বাহুল্য ঘটিয়েই ছন্দোমাধুর্য রক্ষার কৌশলটি

আয়ত্ত করেন। সংস্কৃত পদ্ধতিতে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক প্রয়োগের ফলেই তা সম্ভব হয়। মানসী কাব্য থেকে এই নূতন রীতির দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। বঙ্গ-হৃদয় উন্মীলি যেন রক্তকমল ফুটে।

২। তোমারি শিক্ষা করিবে রক্ষা
তোমারি বাক্য হতে।

৩। পবিত্র মুখ, মধুর মূর্তি, স্নিগ্ধ আনত আঁখি।

৪। তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার।

সর্বত্রই রুদ্ধদল সংস্কৃত পদ্ধতিতে দ্বিমাত্রক বলে স্বীকৃত হয়েছে, অথচ দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদল সংস্কৃত রীতিতে দ্বিমাত্রক বলে গণ্য হয় নি। এটাই এই নূতন রীতির বিশিষ্টতা। বলা বাহুল্য, এই রীতিতে হিসাব করলে উপরের সবগুলি দৃষ্টান্তেই পাওয়া যাবে ছয়মাত্রা।

এই ছয়মাত্রাপর্বের ছন্দই বাংলা ছন্দের তৃতীয় শাখার প্রধান সম্পদ্।

রবীন্দ্রনাথ বলেন এই তৃতীয় শাখাটির উদ্গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে। কিন্তু ছয়মাত্রাপর্বের ছন্দটিকে সংস্কৃত-ভাঙা ছন্দ বলে অভিহিত করা সমীচীন মনে হয় না। সংস্কৃত কাব্যে তথা ছন্দশাস্ত্রে ছয়মাত্রাপর্বের কোনো ছন্দের নিদর্শন নেই। তবে সমানিকা-তূণক এবং প্রমাণিকা-পঞ্চচামর-রুচিরা প্রভৃতি ছন্দের মধ্যেই ভাবীকালের ছয়মাত্রাপর্বের ছন্দের সম্ভাবনা নিহিত ছিল। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।—

মৈল দক্ষ | ভূত যক্ষ | সিংহনাদ | ছাড়িছে।
ভারতের | তূণকের | ছন্দবন্ধ | বাড়িছে॥

—ভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল', দক্ষযজ্ঞনাশ

সিংহনাদ, ভারতের ও তূণকের, এই তিনটি শব্দকে সংস্কৃত-রীতিতে অকারান্ত করে পড়তে হবে এবং দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ করতে হবে। এভাবে পড়লেই দেখা যাবে তূণকছন্দের পর্বগুলি আসলে ছয়মাত্রার মাপেই গঠিত। এ দৃষ্টান্তটি সংস্কৃত রীতিতেই রচিত। এবার বাংলা রীতিতে রচিত দুটি সংস্কৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

মহৎ ভয়ের | মুরত সাগর | বরণ তোমার | তমঃ শ্যামল।
মহেশ্বরের | প্রলয়-পিনাক | শোনাও আমায় | শোনাও কেবল ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র-আবীর', সিন্ধুতাণ্ডব

তখন কেবল | ভরিছে গগন | নূতন মেঘে।
কদম-কোরক | তুলিছে বাদল | বাতাস লেগে ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'কুহু ও কেকা', তখন ও এখন

প্রথম ছন্দটির সংস্কৃত নাম 'পঞ্চচামর', দ্বিতীয়টির নাম 'রুচিরা'। দুটিই পড়তে হবে খাঁটি বাংলা রীতিতে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এ দুটি ছন্দই মূলতঃ ছয়মাত্রার পর্ব নিয়ে গঠিত। সুতরাং এগুলিকেই ছয়মাত্রাপর্বের ছন্দের পূর্বরূপ বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রকার বা কবি কেউ এগুলিকে সেদিক্ থেকে বিচার বা প্রয়োগ করেন নি। তাঁরা শুধু এসব ছন্দের গুরুলঘু-ভেদে অক্ষরবিন্যাসের প্রতিই লক্ষ রাখতেন, এগুলির মাত্রাপরিমাণের প্রতি উদাসীন ছিলেন। তাই বলা হয়, সংস্কৃত কাব্যে ও ছন্দশাস্ত্রে ছয়মাত্রাপর্বের ছন্দ স্বীকৃত হয় নি।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের গীতগুলির ছন্দ সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্র-স্বীকৃত কোনো নিয়মের অধীন নয়। এগুলি বস্তুতঃ কবির উদ্ভাবিত স্বাধীন ছন্দ বা তৎকাল-প্রচলিত লৌকিক ছন্দের মার্জিত রূপ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই কাব্যের চব্বিশটি গীতের মধ্যে মাত্র একটির মধ্যে ছয়মাত্রাপর্বের কিছু আভাস দেখা যায়।—

সখি সীদতি তব | বিরহে বন | -মালী।
ধ্বনিত মধুপ | -সমূহে
শ্রবণমপি দ | -ধাতি।
মনসি বলিত | -বিরহে
নিশি নিশি রুজমুপ | -যাতি ॥
বসতি বিপিন | -বিতানে
ত্যজতি ললিত | -ধাম।
লুঠতি ধরণি | -শয়নে
বহু বিলপতি তব | নাম ॥

—গীতগোবিন্দ, পঞ্চম সর্গ, গীত ১০

ছন্দোগত পর্ববিভাগ ও মাত্রাপরিমাণ ঠিক রেখে এর বাংলা অনুবাদ এই।—

সখি  তোমারি বিরহে | বনমালী হল | ক্ষীণকায় ॥

মধুপ নিকর | ধ্বনিলে কান
রাখে ছুটি হাতে | ঢাকিয়া।
বিরহ ব্যথিত | চিতে হায়
তার  সারা নিশি কাটে | জাগিয়া ॥

বিপিন বিতানে | নিবস তার
ত্যজিয়া ললিত | ধাম গো।
ধরণিশয়নে | লুটায়ে সে
শুধু  ফুকারে তোমারি | নাম গো ॥

এই গীতটির ধুয়া এবং প্রত্যেক স্তবকের শেষ লাইনটিকে অন্যভাবেও ভাগ করা চলে। যেমন—

সখি সীদতি | তব বিরহে | বনমালী।

এর বাংলা প্রতিরূপ হবে এরকম।—

সখি, তোমা বিনে | বনমালী-তনু | হল যে ক্ষীণ।

উদ্ধৃত অংশের শেষ লাইনটিকে এভাবেও ভাগ করা যায়—

লুঠতি ধরণি | শয়নে বহু | বিলপতি তব | নাম।

এটির বাংলা প্রতিরূপ—

লুটায়ে ধরণি | শয়নে সে হায় | ফুকারে তোমারি | নাম গো।

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রকাররা কোনো ছন্দেই ছয়মাত্রার পর্ববিভাগ স্বীকার করেন নি। কবিরাও সে-ভাবে রচনা করেন নি। অথচ নানা ছন্দেই যে এই বিভাগের প্রবণতা ছিল তাতেও সন্দেহ নেই। যদি কবি ও শাস্ত্রকাররা এ বিষয়ে সচেতন হতেন তাহলে সংস্কৃত ছন্দের এই বিভাগটি হয়তো তৎকালেই আরও সমৃদ্ধ হতে পারত।

প্রাকৃতেও ছয়মাত্রাপর্বের প্রবণতা দেখা যায়। প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে তার নিদর্শন আছে। যেমন 'ধবলাঙ্গ' ছন্দ।—

তরুণ তরণি | তবই ধরণি | পবন বহ খ | -রা,
লগ ণহি জল | বড় মরু থল | জন-জিঅণ হ | -রা।

—প্রাকৃতপৈঙ্গলম্, বর্ণবৃত্ত ১৯৩

বাংলা ছন্দে এর প্রতিরূপ এই—

তরুণ তপন | তাপিছে ধরণী | বহিছে প্রবল | বায়,
কাছে নাহি জল | মহা মরুথল | তৃষায় জীবন | যায়।

এ ছন্দের ছয়মাত্রাভাগের প্রবণতা সুস্পষ্ট। অথচ ছন্দসূত্রে তা স্বীকৃত হয়নি। শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে আঠারোটি লঘুবর্ণের পরে একটি গুরুবর্ণ স্থাপিত হলেই 'ধবলাঙ্গ' ছন্দ হয়। এই উনিশটি বর্ণের পর্ববিভাগ সম্বন্ধে কোনো নিয়ম নেই, যে-কোনো রকম বিভাগই চলতে পারে। বস্তুতঃ ধবলাঙ্গ ছন্দের সূত্রটিই এই যথেচ্ছ বিভাগের নিদর্শন।—

কমলগণ | সরস মন | সুমুহি ধব | -লঅ কহী।

এখানে পাঁচমাত্রার বিভাগ সুস্পষ্ট। তা ছাড়া, ধবলাঙ্গ ছন্দে ছয়মাত্রার বিভাগ মেনে নিলেও তাতে লঘুগুরু নির্বিশেষে মাত্রাস্থাপনের স্বাধীনতা নেই। এই স্বাধীনতা থাকলে ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রচুর সুযোগ ঘটত।

আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

ধূলি ধবল | হক্ক সবল | পক্খি পবল | পত্তিএ।
কণ্ণ চলই | কুম্ম ললই | ভুম্মি ভরই | কিত্তিএ।

—প্রাকৃতপৈঙ্গল, মাত্রাবৃত্ত ২০১

ছন্দ বাঁচিয়ে বাংলায় এর অনুবাদ করলে তার রূপ হয় এই।—

যোদ্ধচরণ | -উথ ধূলিতে | পূর্ণ করিছে | পৃথ্বীকে,
কর্ণ চলিছে | কূর্ম দুলিছে | বিশ্ব ভরিছে | কীর্তিতে।

এটি হচ্ছে কর্ণের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা। এই কর্ণ সম্ভবতঃ চেদিরাজ কলচুরিবংশীয় কর্ণদেব ( একাদশ শতক )।

এটি হচ্ছে 'হীর' ছন্দের দৃষ্টান্ত। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে এ ছন্দের প্রতি পূর্ণপর্বে থাকবে ছয়মাত্রা এবং শেষের অপূর্ণ পর্বে পাঁচমাত্রা। কিন্তু প্রত্যেক পর্বের ( পূর্ণ ও অপূর্ণ ) প্রথম বর্ণটি এবং শেষ পর্বের শেষবর্ণটিও গুরু হওয়া চাই। সুতরাং এই 'হীর' ছন্দটিতেও মাত্রাস্থাপনের স্বাধীনতা রইল না এবং

প্রকারান্তরে এটি আঠারো বর্ণের বর্ণবৃত্ত ছন্দেই পরিণত হল। বস্তুতঃ সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে এ ছন্দটি বর্ণবৃত্তের অন্তর্গত বলেই গণ্য হয়েছে এবং এর নাম দেওয়া হয়েছে 'হীরক'।

দেখা গেল সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয়ত্রই ছয়মাত্রা পর্বভাগের প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও কার্যতঃ ছয়মাত্রাপর্বের কোনো ছন্দই স্বীকৃত হয় নি।

সুতরাং মানতে হবে, রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে ছয়মাত্রাভাগের ছন্দকে সংস্কৃত-ভাঙা ছন্দ বলে অভিহিত করা চলে না।

। ৫ ॥

চর্যাগীতিগুলির রচনাকালে ছয়মাত্রাপর্বের প্রচলন ছিল না বলেই মনে করি। যদি থাকত তবে জয়দেবের গীতগোবিন্দে অবশ্যই তার প্রতিফলন ঘটত। চর্যাগীতির ছন্দ সুগঠিত নয়, তার পাঠও অবিকৃত নয়। তা সত্ত্বেও চারমাত্রা-পর্বের গঠনরূপ ও বিবিধ সমাবেশ সুস্পষ্টভাবেই ধরা যায়। কিন্তু ছয়মাত্রাপর্বের কোনো আভাসও পাওয়া যায় না চর্যাগীতিগুলিতে।

তবে চর্যাগীতিগুলির চারমাত্রাপর্বের প্রয়োগরীতি থেকেই তৎকালীন বাংলা ছন্দের প্রবণতা কোন্ দিকে তা বোঝা যায়। বোঝা যায় যে, তৎকালেই দীর্ঘস্বরের তথা রুদ্ধদলের উচ্চারণ ক্রমশঃ দীর্ঘতা হারিয়ে হ্রস্ব হয়ে আসছিল। দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টা বোঝানো সহজ হবে।—

সোনে | ভরিলী | করুণা | নাবী।
রূপা | থোই | নাহি কে | ঠাবী॥
—চর্যাগীতি ৮

ডোম্বীএর | স ঙ্গে | জো জোই | র ত্তো।
খণহ ন | ছাড় অ | সহজ-উন্ | -ম ত্তো॥
—চর্যাগীতি ১৯

দুটি দৃষ্টান্তেরই প্রতিপর্বে চার মাত্রা। লক্ষ করবার বিষয় এই যে, প্রথম দৃষ্টান্তে 'নাহি' শব্দের আ-কার ছাড়া সব দীর্ঘস্বরেরই দীর্ঘতা বজায় আছে; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'ডোম্বীএর' শব্দের ঈ-কার, এ-কার এবং 'জোই' শব্দের ও-কার দীর্ঘতা হারিয়েছে এবং 'ডোম্বী' ও 'উন্মত্তো' শব্দের দুটি রুদ্ধদলও ( ডোম্, উন্ )

গুরুত্ব পায়নি। কালক্রমে বাংলায় সব দীর্ঘস্বর ও রুদ্ধদলই গুরুত্ব হারিয়ে একমাত্রার মূল্য পেয়েছে। তার নিদর্শন পাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে। তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে একটু পরে।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। চর্যাগীতিতে ছয়মাত্রাপর্বের প্রয়োগ নেই। বিদ্যাপতিতেও নেই। বস্তুতঃ এই পর্বের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে। তারও আবার দুই রূপ—একরূপে দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদল ও রুদ্ধদল একমাত্রা, অন্যরূপে দুইমাত্রা।—

ঢল ঢল কাঁচা | অঙ্গের লাবণি | অবনী বহিয়া | যায়।
ঈষত হাসির | তরঙ্গ-হিল্লোলে | মদন মুরুছা | পায়॥

—গোবিন্দদাস

শরদ চন্দ | পবন মন্দ || বিপিন ভরল | কুসুমগন্ধ ||
ফুল্ল মল্লিকা | মালতী যূথী | মত্ত মধুকর | ভোরনী।
বিছুরি গেহ | নিজহু দেহ || একু নয়নে | কাজর-রেহ ||
যাহে রঞ্জিত | একু মঞ্জীর | একু কুণ্ডল | ডোলনী।
শিথিল ছন্দ | নীবিক বন্ধ || বেগেতে ধাওত | যুবতীবৃন্দ ||
খসত বসন | রসন চোলি | গলিত বেণী | লোলনী।

—গোবিন্দদাস

দুটি অংশ একই কবির রচনা। দুটিই ছয়মাত্রাপর্বের ছন্দে রচিত। অথচ দুটির মধ্যে উচ্চারণগত তথা ছন্দোগত পার্থক্য প্রচুর। প্রথমটিতে খাঁটি বাংলা পদ্ধতিতে রুদ্ধদল ও দীর্ঘস্বর উভয়ই হ্রস্বতাপ্রাপ্ত। চর্যাগীতিগুলিতে এ বিষয়ে যে প্রবণতা লক্ষিত হয়, এটি তারই স্বাভাবিক পরিণতি। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে রুদ্ধদল ও দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতারক্ষার প্রয়াস সুস্পষ্ট। অথচ সর্বত্র তা রক্ষিত হয় নি। এ হচ্ছে অতীত যুগের সংস্কৃত ও প্রাকৃত রীতিরক্ষার প্রয়াস। তৎকালে খাঁটি বাংলায় রুদ্ধদল ও দীর্ঘস্বরের লঘুতা স্বাভাবিক ভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং বলতে হবে কবির পক্ষে রুদ্ধদল ও দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা-রক্ষার এই প্রয়াস কৃত্রিম। তাই তাঁকে এই ছন্দের জন্য যে ভাষার আশ্রয় নিতে হয়েছিল সেটাও কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষা। কিন্তু তথাপি কবির এই প্রয়াস অনেকস্থলেই ব্যর্থ হয়েছে—রুদ্ধদল ও দীর্ঘস্বর প্রায়শই খাঁটি বাংলার প্রবণতা-

বশতঃ হ্রস্ব হয়ে গেছে। উপরের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির প্রথম দুই লাইনের প্রতি একটু লক্ষ করলেই তা বোঝা যাবে। এই ব্যর্থতা বৈষ্ণব ব্রজবুলি রচনার সর্বত্র ব্যাপ্ত। তথাপি এই কৃত্রিম ছন্দের প্রতি তৎকালীন কবিদের প্রচুর আগ্রহ দেখা যায়। দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণে যে উদাত্ত গাম্ভীর্য প্রকাশ পায় আর রুদ্ধদলের দীর্ঘ উচ্চারণে যে ধ্বনিগৌরবের উদ্‌ভব হয়, তার প্রতি ছন্দোবিলাসী কবিদের কানের আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ যে-সব স্থলে রুদ্ধদল ও দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা যথাযথভাবে রক্ষিত হয়, তার ছন্দসৌন্দর্যও অস্বীকার করা যায় না।—

স্ফুট চম্পক | -দলনিন্দিত | উজ্জ্বল তনু | -শোভা।
পদপঙ্কজে | নূপুর বাজে | শেখরমনো | -লোভা॥

—শেখর

মঞ্জু বিকচ | কুসুমপুঞ্জ ॥ মধুপশব্দ | গঞ্জি গুঞ্জ ॥
কুঞ্জরগতি | -গঞ্জিত গমন | মঞ্জুল কুল | -নারী।
ঘনগঞ্জন | চিকুরপুঞ্জ ॥ মালতী ফুল | -মালি রঞ্জ ॥
অঞ্জনযুত | কঞ্জনয়নী | খঞ্জনগতি | -হারী।

—জগদানন্দ

এই দৃষ্টান্ত-দুটির শ্রুতিমাধুর্য সংশয়াতীত। লক্ষ করা প্রয়োজন যে, অধিকাংশ স্থলেই দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা রক্ষিত হয় নি এবং রুদ্ধদলের ধ্বনিঝংকারই আমাদের কানকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে বেছে বেছে দুটি অপেক্ষাকৃত নিখুঁত দৃষ্টান্তই দেওয়া হয়েছে। এ দুটিতে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা সর্বত্র রক্ষিত না হলেও রুদ্ধদলের গুরুত্ব সর্বত্রই অক্ষুণ্ন আছে এবং তাই হচ্ছে এগুলির শ্রুতিমাধুর্যের প্রধান হেতু।

এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বাংলা ছন্দে দীর্ঘস্বরের চেয়ে রুদ্ধদলের দীর্ঘতা রক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বাভাবিক। সুতরাং দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা বর্জন করে শুধু দীর্ঘায়ত রুদ্ধদলের যোগেই বাংলায় নূতন রীতির ছন্দ প্রবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু এ তত্ত্বটি তৎকালীন কবিদের কাছে ধরা পড়ে নি। তাঁরা মনে করতেন কৃত্রিম ছন্দে কৃত্রিম ভাষায় প্রাচীন পদ্ধতি দীর্ঘস্বর ও রুদ্ধদল উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে রক্ষা করা প্রয়োজন। অথচ তা ছিল বাংলাভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এইজন্যেই এই কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষা ও এই কৃত্রিম ছন্দ মধ্যযুগেই ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে যায়।

ব্রজবুলি ভাষায় রচিত এই কৃত্রিম ছন্দের প্রধান গৌরব ছয়মাত্রার পর্ব রচনা। আমরা দেখেছি সংস্কৃত ও প্রাকৃতে ছয়মাত্রাপর্বের প্রবণতা থাকলেও যথার্থতঃ ছয়মাত্রাপর্বের কোনো ছন্দই ছিল না, বিদ্যাপতিতেও না। সুতরাং বলতে হবে, ছয়মাত্রাপর্বের দ্বিবিধ রূপেরই উদ্‌ভব ঘটে মধ্যযুগের বাঙালি কবিদের হাতে। কিন্তু এই দুই রূপেরই এক-একটি বিষম ত্রুটি থেকে যায়। খাঁটি বাংলারূপের ত্রুটি এই যে, এই ছন্দে রুদ্ধদলের হ্রস্ব প্রয়োগ শ্রুতি-সৌন্দর্যের হানি ঘটায়। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। অনুসরণের সুবিধার জন্য এখানে আর-একটি দৃষ্টান্ত দিই।—

কৈলাস ভূধর | অতি মনোহর | কোটি শশী পর | -কাশ।
গন্ধর্ব-কিন্নর | যক্ষ-বিদ্যাধর | অপ্সরগণের | বাস ॥

—ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল ১ম খণ্ড

এর দ্বিতীয় লাইনের রুদ্ধদলগুলি ছন্দের মসৃণ গতিকে বিশেষভাবেই ব্যাহত করেছে। আধুনিক মার্জিত রুচিতে তা সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু তৎকালে ছন্দোবিলাসী কবি ভারতচন্দ্রের কানেও তা ধরা পড়েনি। এই হল খাঁটি বাংলার ছয়মাত্রাপর্বের প্রধান ত্রুটি।

আর কৃত্রিম ব্রজবুলি ভঙ্গির ছয়মাত্রাপর্বের প্রধান ত্রুটি হল দীর্ঘস্বরের অস্বাভাবিক উচ্চারণ বা উচ্চারণদৈর্ঘ্যের অনিশ্চয়তা। এই রীতিতে দীর্ঘস্বর কোথাও হ্রস্ব এবং কোথাও দীর্ঘ হয়; এমনকি রুদ্ধদলের উচ্চারণও সর্বত্র প্রলম্বিত হয় না। এটাই এর প্রধান ত্রুটি।—

আওত শ্রীদামচন্দ্র রঙ্গিয়া পাগড়ী মাথে।
স্তোক-কৃষ্ণ অংশুমান্ দাম বসুদাম সাথে ॥ ···
গো-ছান্দন ডোরি বান্ধহি শোভে কানে কুণ্ডল-খেলা।
গলে লম্বিত গুঞ্জাহার ভুজে অঙ্গদ-বালা ॥

—শেখর

এটাও ছয়মাত্রাপর্বের ছন্দে রচিত। এটুকুর পর্ববিভাগে প্রয়াসী হলেই পাঠককে মহা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হবে। কারণ এই অংশটুকুর দীর্ঘস্বর ও রুদ্ধদলের উচ্চারণগত পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ নয়। এটাই এই রীতির প্রধান ত্রুটি।

দুই রীতির দুই রকম ত্রুটি বর্জন করে আদর্শ রীতি উদ্‌ভাবিত হতে কয়েক

শতাব্দী কাল লেগেছে। দীর্ঘকালের নানা প্রচেষ্টার পরে এই রীতি অবশেষে উদ্‌ভাবিত হল 'মানসী' রচনার কালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে।

রবীন্দ্রনাথ ছয়মাত্রাপর্বের দ্বিবিধ রূপেরই দোষের পরিহার এবং গুণের সমাবেশের দ্বারা নূতন রীতির উদ্‌ভাবন করেন। ছয়মাত্রাপর্বের বাংলারূপের গুণ দীর্ঘস্বরের দীর্ঘত্ববর্জন এবং দোষ রুদ্ধদলের গুরুত্ব অস্বীকার; ব্রজবুলিরূপের গুণ রুদ্ধদলের গুরুত্ব স্বীকার (যদিও তা সার্বত্রিক নয়) এবং দোষ দীর্ঘস্বরের দীর্ঘত্ব রক্ষার আংশিক প্রয়াস। এই দোষগুলি উভয় রূপেরই বহুল প্রয়োগের অন্তরায় ঘটিয়েছে দীর্ঘকাল। তাই মধ্যযুগে তথা মানসী-পূর্ব আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে ছয়মাত্রাপর্ব ছন্দের আপেক্ষিক বিরলতা দেখা যায়। খাঁটি বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ক্ষেত্রেই চারমাত্রাপর্বের তুলনায় ছয়মাত্রাপর্বের প্রয়োগ খুবই কম, এটুকু কারও দৃষ্টিই এড়িয়ে যায় না। তার কারণ ছয়মাত্রাপর্বের পূর্বোক্ত দুর্বলতাগুলি। মানসী প্রকাশের পরে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে নূতন রূপ ও নূতন শক্তি পাবার ফলে এই ছয়মাত্রার পর্ব খাঁটি বাংলা প্রকৃতি নিয়েই বাংলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। যে চারমাত্রার পর্ব একসময়ে পদাবলী সাহিত্যে প্রায় একাধিপত্য করত, সেই চারমাত্রার পর্ব আধুনিক কালের গীতিকবিতার ক্ষেত্রে ছয়মাত্রাপর্বের কাছে আসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। বাংলা ছন্দের ইতিহাসে এর চেয়ে গুরুতর ঘটনা আর কিছু ঘটেছে বলে মনে হয় না। জয়দেবের ও তাঁর পূর্ববর্তী কাল থেকেই যে ছন্দপ্রবণতা শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল ধরে পরিণতিলাভের পথ খুঁজছিল, তাই অবশেষে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করল মানসী কাব্যে। ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথের বহু কীর্তির মধ্যে এই নূতন ছয়মাত্রার পর্ব রচনার কীর্তিই সর্বাধিক গৌরবের অধিকারী, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

এই নূতন রীতির ছন্দ রবীন্দ্রনাথের হাতে কি অপূর্ব শক্তি ও বৈচিত্র্য লাভ করেছে তার নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।

—'চিত্রা', চিত্রা

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিগ্‌ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।

—'কল্পনা', দুঃসময়

প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্র সাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে
অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক লয়,
তোমারি হউক জয়।

—গীতালি, ১০১

বীরমঙ্গল ঘোষুক মন্দ্র
মুখে তুলে তোর শঙ্খ নে।
কৌতুক-সুখ চক্ষে ফুটুক,
বিদ্যুৎ-শিখা কম্পি উঠুক,
তব চঞ্চল কঙ্কণে।

—'নটরাজ', আষাঢ়

নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর,
হে গম্ভীর।
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর,
ঝংকৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর।
বর্ষণগীত হল মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে,
নন্দিত তব উৎসব-মন্দির,
হে গম্ভীর।

—'বনবাণী', বর্ষামঙ্গল

দৃষ্টান্ত বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন। এই রচনাংশগুলি থেকেই বোঝা যাবে, রবীন্দ্রনাথের হাতে ছয়মাত্রাপর্বের এই নূতন রূপ বাংলা ছন্দের ইতিহাসে কি বিস্ময়কর বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। ছয়মাত্রাপর্বের এরকম তরঙ্গাভিঘাত-মুখরিত ছন্দোবদ্ধ রচনা গোবিন্দদাস-জগদানন্দ-ভারতচন্দ্র-বিহারীলাল-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ছন্দোবিলাসী কবিদেরও কল্পনার অতীত ছিল। ছয়মাত্রাপর্বের এই নূতন রূপ ও শক্তি শুধু মানসী কাব্যকে নয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেছে এবং ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে তাঁর কবিকৃতিকে অক্ষয় গৌরবে মণ্ডিত করেছে।

# শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের রবীন্দ্রকথা

## অনুলিখন : বিষ্ণু দে

রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে কিছু লিখতে শ্রীযুক্ত যামিনী রায়কে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি বলেন যে তিনি তো লেখক নন, তিনি ছবি আঁকেন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনে স্পষ্টতা পান ছবির রূপে। কিন্তু সে রূপধ্যান তো কথা সাজিয়ে ফোটানো যায় না।

রবীন্দ্রনাথকে যামিনী রায় জোড়াসাঁকোতে বোধহয় দেখেননি, যদিও ছাত্রাবস্থাতেই অবনীন্দ্রনাথের কথায় তিনি ছ'নম্বরের সেই উপরের ঘরে যেতেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পোর্ট্রেট আঁকতে। রবীন্দ্রনাথকে দেখার প্রথম স্মৃতি যামিনী রায়ের মনে বহুকাল আগে এলাহাবাদে এক সন্ধ্যায় দেখার। সে ছবি আজও চিত্রশিল্পীর মনে স্পষ্ট। যামিনীবাবু আর্টস্কুলের শিক্ষার মাঝখানে এলাহাবাদে চ'লে যান ইণ্ডিয়ান প্রেসে কাজ করতে। চিন্তামণি ঘোষ তখন খানিকটা অবনীন্দ্রনাথের ছবি ছাপাবার উৎসাহেই জর্মানি থেকে লিথোগ্রাফর সমার সাহেবকে আনিয়ে তেরঙা ছবি ছাপার ব্যবস্থা করছেন। যামিনীবাবু সেই জর্মান বিশেষজ্ঞের কাছে রংছবি ছাপার কাজ করছেন। থাকতেন যে মেস-বাড়িতে, সেখানে সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ও থাকতেন। যামিনীবাবুর মন তারিখ-সন দিয়ে চলে না, কিন্তু তাঁর মনে আছে যে তখন তাঁর বিবাহ হয়েছে, কিন্তু সন্তানাদি হয়নি। তাই আমার মনে হয় ব্যাপারটা ঘটে বোধহয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্র-সদনিক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায়ের সাহায্যে জেনেছি যে তখন রবীন্দ্রনাথ একবার দিনকয়েকের জন্য এলাহাবাদ গিয়েছিলেন, বলেন্দ্রনাথের

মৃত্যুর পরে, বোধহয় এক হোটেলে ছিলেন। যামিনীবাবুর ধারণা যে অবনীবাবুদের নেওয়া কোনো বাংলো-বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ সেদিন আসেন। চারুবাবুর সঙ্গে যামিনীদা সেখানে যান। উপলক্ষ্য ছিল জনকয়েক পাদ্রি-সাহেবের সঙ্গে কবির আলোচনা। তাঁরা সব একটা বড়ঘরে বসেছেন। এমন সময়ে যামিনী রায় দেখলেন রবীন্দ্রনাথ আসছেন, ঢিলাঢালা পোশাক, হাতে একটা বিশেষধরনের রঙীন লণ্ঠন, লম্বা ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে দরজা পার হ'য়ে হ'য়ে তিনি আসছেন, ঐ শরীর ঐ মুখ, চলছেন আর পাটে পাটে পোশাক নড়ছে আর আলোছায়া নক্সা হচ্ছে পর পর। সে এক আশ্চর্য দেখা। যামিনী রায় বলেন যে তখন তিনি জানতেন না, এমনি মনে হয়েছিল, পরে জেনেছেন যে যীশুরও একটি পরিচিত রূপ হচ্ছে লণ্ঠন-হাতে আলোকদাতার রূপ।

সেইরকম অনেকবছর পরে আরেকবার ঐরকম এক আশ্চর্য দর্শন হয় কলকাতায়, যামিনী রায়ের বাগবাজারের বাসায়। প্রাচীন সরু গলির সেই বাসায় ঢুকেই একটা উঠান ছিল। ভেজানো দরজা খুলে ঢুকেই যামিনী রায় দেখলেন—উঠানে একটা তক্তাপোষ পাতা ছিল, সেখানে রবীন্দ্রনাথ বসে রয়েছেন। এ ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সে।

তার আগেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কয়েকবার দেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে তাঁকে যেতে বলতেন। যামিনী রায় কয়েকবার বরানগরেও কবিসন্দর্শনে গেছেন।

প্রথমবার বরানগর যাওয়া হয় নরেশ মিত্র মহাশয়দের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা তাঁরা নাটকরূপে অভিনয় করবেন; রাস্তায় দেখা, নরেশবাবু বললেন তাঁদের সঙ্গে কবির কাছে যেতে। ওঁদের মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যামিনী রায়ের পরিচয় ছিল। কিন্তু ঠাকুর-পরিবারের অনেকের সঙ্গে যামিনীবাবুর বিশেষ স্নেহভালবাসার সম্বন্ধ থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তখনও সাক্ষাৎ পরিচয় বিশেষ একটা ঘ'টে ওঠেনি। যাই হোক্, ওঁরা যামিনীদাকে নিয়ে গেলেন, তিনি নিচে বসে আছেন আর নরেশবাবুরা ওপরে গিয়ে নাটক নিয়ে কথাবার্তা বলছেন। রবীন্দ্রনাথ ওপর থেকে ডাক দিলেন, যামিনী আর গোপন থেকো না, এসো। যামিনী তুমি প্রকাশ হও। তারপর ওপরে গিয়ে প্রণাম ক'রে বসতেই বললেন, দেখ, তোমার ওখানে মাঝে মাঝে যাবার ইচ্ছে হয়, কিন্তু এরা আমাকে নিয়ে এমন করে যে যেতে পারিনে।

পরে একবার যামিনীদা সস্ত্রীক যান। যামিনীদার মুখে শুনেছি, "আপনার

বৌদিদি তো প্রণাম ক'রে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন, রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'ওগো তুমি কাছে এসে শোনো, যামিনী জীবনের যে কাজ গ্রহণ করেছে, তাতে তো ওর আর তোমার এক-কাপড় আধাআধি ক'রে প'রে থাকবার কথা, যাহোক্ ও এরই মধ্যে সে পর্ব পেরিয়ে উঠেছে।' "

শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের বলা এবং তাঁর অনুমোদনে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত একটি রবীন্দ্রচিত্রালোচনা এবং সেটি প'ড়ে রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠি ১৩৫৮ সালের সাহিত্যপত্র-তে বেরোয়। তার কিছু উদ্ধৃতি এখানে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সেই প্রবন্ধে যামিনীবাবু বলেন :

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তাঁর শিল্প-ইতিহাসের মধ্যবর্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। এক্ষেত্রে পতন প্রায়ই অনিবার্য হয়, কিন্তু সবচেয়ে বড় বিস্ময় তা হ'ল না। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনি এদিকে নব-আগন্তুক মাত্র। তাঁর এই অভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়ার একমাত্র ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে।

তাই যামিনী রায় বলেন : রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শ্রদ্ধা করি তার শক্তির জন্য, ছন্দের জন্য, তার মধ্যে বৃহৎ রূপবোধের যে আভাস পাই তার জন্য। ··· রবীন্দ্রনাথের আঁকা মানুষ যখন দেখি তখন মনে হয় না সেটা এখনই নেতিয়ে পড়বে, মনে হয় না হাওয়ায় দুলছে যেন। স্পষ্ট দেখি মানুষটার ওজন আছে, সতেজ শিরদাঁড়া আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি যে শক্তিশালী তা এই হাড়ের জোরেই, ছন্দগঠনেই। আমার মতে গত দুশ' বছর ধ'রে, রাজপুত আমল থেকে আজ পর্যন্ত, আমাদের দেশের ছবিতে যে অভাব বেড়ে চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অভাবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করতে চান : ছবির জন্য খোঁজেন সতেজ শিরদাঁড়া। তাঁর প্রতিবাদ গোটা সৌখীন ভারতীয় শিল্প প্রাচ্যশিল্পবাদ সবের বিরুদ্ধে।

যামিনী রায় বলেন, রবীন্দ্রনাথ যদি ছবি না আঁকতেন, তাহলে তাঁর অন্তর্নিহিত বিক্ষোভ, এই প্রতিবাদ শুধু একটা ইচ্ছাপ্রকাশ হ'য়ে থাকত, ছবি এঁকে তিনি একে সত্যরূপ দিলেন।

যদি হই দীন, না হইব হীন—এই কথা রবীন্দ্রনাথ কবিতায় গানে

বলেছিলেন, সেই কথাই মূর্ত হল তাঁর ছবিতে। পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে লুকাতে প্রাচীন দৈন্য বৃথা চেষ্টা ভাই—এ প্রতিবাদের সত্য প্রমাণিত করলেন তাঁর চিত্রে। ঐশ্বর্যের সন্ধানে এ দৈন্য তো চাপা পড়ে না, এ দৈন্য যেতে পারে রিক্ততার অবকাশে শুধু নিজের মর্যাদার সতেজ শিরদাঁড়ায়।

যামিনীবাবু তাই রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে এত শ্রদ্ধাপূর্ণ। যে উপলব্ধি এই চিত্রের রিক্ত তেজে, সেই রিক্ত শক্তিই কি আবার আমরা পাই না রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের কবিতায়, 'প্রান্তিক' থেকে 'শেষলেখায়'? সেকালে যে রবীন্দ্রনাথ লেখেন

নিমেষতরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে' যাইতে ছুটে', জীবন-উচ্ছ্বাসে।

—সেই ইচ্ছাই প্রকাশের সৌন্দর্য পেল বৃদ্ধের ছবিতে, কবিতায়। তাই রবীন্দ্রনাথ যামিনী রায়ের আলোচনাটি প'ড়ে খুশি হয়েছিলেন, এবং কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন।

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

[ শ্রীযামিনী রায়কে লিখিত ]

কল্যাণীয়েষু,

ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে আমাদের জীবনের উপলব্ধি, এইজন্য তার একটি অহেতুক আনন্দ আছে। চোখে দেখি; সে কেবল সুন্দর দেখে বলি, খুশী হই —তা নয়। দৃষ্টির উপরে দেখার ধারা আমাদের চেতনাকে উদ্রেক করে রাখে। ছেলেবেলায় নির্জন ঘরে বন্দী হয়ে থাকতুম কেবল খড়খড়ির ভিতর থেকে নানা কিছু চোখে পড়তো, তার ঔৎসুক্য মনকে জাগিয়ে রাখত। এই হোলো ছবির জগৎ। যে দেখায় মনটাকে টানে না, যা একঘেয়ে যার বিশেষ রূপের বৈচিত্র্য নাই তার মধ্যে মন নির্বাসিত হয়ে থাকে। সে আপন পুরো খোরাক পায় না। ছবির তত্ত্ব এর থেকেই বুঝব। দেখবার জিনিসকে সে আমাদের দেয়, না দেখে থাকতে পারি নে, তাতে খুশী হই। মানুষ আদিকাল থেকে এই দেখবার উপহার নিজেকে দিয়ে এসেছে, নানা রকম ছাপ পড়ছে মনে। যে রূপের রেখা এড়াবার জো নেই, যা মনকে অধিকার করে নেয় কোনও একটা বিশেষত্ব

বশত—তা সুন্দর হোক বা না হোক, মানুষ তাকে আদর করে নেয়, তাতে তার চারিদিকের দৃষ্টির ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করতে থাকে। আমরা দেখতে চাই, দেখতে ভালোবাসি। সেই উৎসাহে সৃষ্টিলোকে নানা দেখবার জিনিস জেগে উঠছে। সে কোনো তত্ত্বকথার বাহন নয়, তার মধ্যে জীবনযাত্রার প্রয়োজন বা ভালোমন্দ বিচারের কোনো উদ্যোগ নেই। আমি আছি—আমি নিশ্চিত আছি, এই কথাটা সে আমাদের কাছে বহন করে আনে। তাতে আমি আছি এই অনুভূতিকেও কোনও একটা বিশেষ ভাবে চেতিয়ে তোলে। ছবি কি—এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সে একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। তার ঘোষণা যতই স্পষ্ট হয়, যতই সে হয় একান্ত,—ততই সে হয় ভালো। তার ভালোমন্দের আর কোনও রকম যাচাই হতে পারে না। আর যা কিছু সে অবান্তর, অর্থাৎ যদি কোনও নৈতিক বাণী আনে, তা উপরি দান। যখন ছবি আঁকতুম না, তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগত কানে, ভাবের রস আসত মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় আমার মনকে টানল, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেলো। গাছপালা, জীবজন্তু, সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ হয়ে উঠছে। এ ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই দৃষ্টির জগতে একান্ত দ্রষ্টারূপে আপন চিত্রকরের সত্তা আবিষ্কার করল। এই যে নিছক দেখবার জগৎ ও দেখাবার আনন্দ, এর মর্মকথা বুঝবেন তিনি যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী। অন্যেরা এর থেকে নানা বাজে অর্থ খুঁজতে গিয়ে অনর্থের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে। কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন কবি এবং ভাবুক এসেছিলেন, আমার কাছে ছবির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি বলবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু তাঁরা এর ঠিক উত্তর স্পষ্ট করে কানে তুলেছিলেন বলে আমার বোধ হয়নি। সেইজন্য ছবি সম্বন্ধে আমার বলবার কথা আমি আজ তোমার কাছে বললুম। তুমি গুণী, তুমি এর মর্ম বুঝবে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভালো করে দেখে না—দেখতে পারে না। তারা অন্যমনস্ক হয়ে আপনার কাজে ঘোরাফেরা করে। তাদের প্রত্যক্ষ দেখবার আনন্দ দেবার জন্যই জগতে এই চিত্রকরদের আহ্বান। চিত্রকর গান করে না, ধর্মকথা বলে না, চিত্রকরের চিত্র বলে—'অয়ম্ অহম্ ভো'—এই যে আমি এই।

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর